গল্পসংগ্রহ
প্রথম খণ্ড
আলপনা ঘোষ

আলপনা ঘোষ
গল্পসংগ্রহ

GALPA SANGRAHA
PART ONE
ALPANA GHOSH

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা ২০০১

প্রকাশক
আফিফ ফুয়াদ
দিবারাত্রির কাব্য ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২

প্রচ্ছদ
শ্যামলবরণ সাহা

মুদ্রক
মানসী প্রেস
৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬

পরিবেশক
বুক মার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
অক্ষর প্রকাশনী, আগরতলা, কৃষ্ণনগর সড়কক্রম ১ ত্রিপুরা
আবাহন, প্রেমতলা, শিলচর ৭৮৮০০৪ অসম
পাঠক সমাবেশ, ১৭/এ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

একশো টাকা

শঙ্খ ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

History has many cunning passages, contrived corridors ....
Gerontion, T. S. Eliot

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

অশোকজাতক (১৯৯৩)

আদালতের বাইরে (যন্ত্রস্থ)

গল্পগ্রন্থ

আলপনা ঘোষের গল্প (১৯৯৭)

ভূমিকাছলে

গত বারো বছরে লেখা চোদ্দোটি গল্পের এই সংকলন, আলপনা ঘোষ-এর। কোনও ভূমিকা ছাড়াই এ গল্পগুলি স্বাবলম্বী, আর যদি তেমন কোনও ভূমিকার নেহাত দরকার বোধ করেন লেখক, তাহলে তিনি নিজেই জানাতে পারেন তাঁর সেই কথা বা গল্প লেখার অভিজ্ঞতা। আমরা গল্পগুলোকে এ-ভূমিকায় কোনও এক বিশেষ পাঠে বাঁধতে চাই না। প্রত্যেক পাঠকের কাছেই প্রতিটি গল্প আলাদা গল্প। এমনকি একই গল্প একাধিকবার পড়লে একাধিক রকম। এই বহুতাকে খুব বাঁধছাড়া না করলে হয়তো একটা বিনিময়ের জায়গা আবছা এক স্পষ্টতা পায়। লেখক তাঁর কোন অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে পর্যন্ত নিয়ে আসতে চাইছেন। 'বিষয়' - কথাটির বদলে এই 'অভিজ্ঞতা' কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। শিল্পকর্ম মাত্রেই একটা অভিজ্ঞতার সংবহন। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতাকে আকার দেন। তাঁর কাছে এ-অভিজ্ঞতা আকারের, ফর্মের অভিজ্ঞতা। সেই ফর্মের বা আকারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে বা ফর্মের,

আকারের অভিজ্ঞতার ভিতর বিরতিহীন সংবাহিত হতে থাকে, তাঁর আরও সব দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, চিন্তা। পাঠকের কাছে পৌঁছয় ফর্মটাই। পাঠকেই ঘটে শিল্প-অভিজ্ঞতা। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য তাঁর একটি লেখায় ফর্মের যে-সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তেমনটি আর কোনও দার্শনিকের লেখাতে দেখিনি। তিনি বলেছিলেন, 'আঙ্গিক দখলে আনার প্রক্রিয়া আসলে অভিজ্ঞতা-পরিগ্রহণের নামান্তর। কারণ লৌকিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পিত অভিজ্ঞতার যে প্রভেদ সেটাই অভিজ্ঞতা।' লেখার ভেতর দিয়ে যদি আমরা একটা উজানযাত্রা করি, তা হলে হয়তো একটা আন্দাজে পৌঁছনো যায় — যখন আকার বা ফর্ম পায়নি, তখন লেখকের অভিজ্ঞতা কী রকম ছড়ানো থেকে এমন বিন্যস্ত হয়েছে। খুব হিসেব করে এমন খুঁজলে আমরা আবার সেই ভুলভুলাইয়ায় ঢুকে পড়ব যেখানে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ আর আকারকে দুটো আলাদা পর্যায় বা কাজ মনে করা হয়। এ দুটোই অপৃথগযত্ন। গল্পের আকারের বাইরে কোনও অভিজ্ঞতাও নেই, বাস্তবও নেই। আমরা এই ভূমিকার ছলে লেখা ছোট লেখাটিতে এই গল্পগুলির লেখকের অভিজ্ঞতা-সংগঠন বা আকার-রচনার ধরন-ধারণটুকুর কোনও আন্দাজ করা সম্ভব কী না, দেখব।

আলপনা ঘোষ তাঁর গল্পে এক অসমাধানে তাঁর আকারকে ছেড়ে দেন। বলা যেত, ওই অসমাধান পর্যন্তই তিনি পৌঁছন। তেমন বলা গেল না, কারণ অসমাধানের এমন অনেক বিন্দু সারা গল্পের নানা জায়গায় ছড়ানো থাকে। যেখানে তিনি গল্পের আকার ছেড়ে দেন, সেটা আবার অনেক সময়ই কাহিনিটার একটা শেষ। কাহিনিকে তিনি একটা শেষ বলতে যা বোঝায় সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে ছাড়ছেন না। অথচ তাঁর আকার বা ফর্মে নিয়তই অসমাধান, অস্তিত্বের। এই দুইয়ের ভিতর একটা বিরোধ ঘটে। হয়তো, সেই বিরোধের ফলে তাঁর গল্পের ভিতরের গড়নটি অনেক সময় স্পষ্ট হয় না — বাজে মেসিনে তোলা এক্স-রে প্লেটের মতো। হয়তো সেই বিরোধের ফলে গল্পগুলিতে একটা আয়রনি ছড়িয়ে পড়ে, কখনও কখনও। হয়তো, সেই বিরোধকেই দাগিয়ে দেয়ার জন্যে আকারের যতটা বিমূর্তন, হয়তো কার্টুনের মতোই, দরকার, তা ঘটে উঠছে না।

এমনটা যে আমার মনে হয়েছে, তা নয়। আলপনা ঘোষ-এর নিজেরই মনে হয়েছে — সেই লড়াইয়ের চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে তাঁর আচারনির্মাণে। হিন্দুস্তান কেবলস আর একটা খাসজমির বাজার বা একটা নতুন বাজারের গল্পেও তাঁর দরকার হয় বৃহত্তর ও দীর্ঘতর সামাজিক রূপান্তরের এক সংকেত। ভোটের কার্ডের গল্পেও তাঁর দরকার হয় সামাজিক রূপান্তরের কত অছিলা যে সত্য বলে জাহির করা হচ্ছে তেমন একটা পরিস্থিতি। সাংবাদিক বন্ধুর সুবাদে পুরনো ফটোটাও তাঁকে কখনও উলটে রাখতে হয়। আলপনা যে তাঁর গল্পে কখনও বাবরি মসজিদ বা কখনও ভোটাভুটি বা কখনও যুদ্ধ ইত্যাদি প্রসঙ্গ না এনে পারেন না, তার কারণ হয়তো অস্তিত্বের যে অসমাধানকে তিনি আকার দেন, তিনি গল্পে বুনে দিতে চান, তা ইতিহাসের বা বর্তমানের অসমাধান। আলপনা নানা ভাবেই এই অসমাধানের

গড়ন খোঁজেন —কখনও বা গল্পটিকে ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করে দেন, টুকরো টুকরো শিরোনামে। এই শিরোনামগুলিকে তিনি অপরের ওতপ্রোত করে ফেলতে চান। বা, অন্য কোনও ভাবে গল্পটাকে টুকরো করতে চান।

আলপনার এতগুলো গল্প একসঙ্গে পর পর পড়তে গিয়ে কখনও কখনও যেন মনে হতে যাচ্ছিল যে তার কাহিনি হয় একটা উদ্বেগঘন মধ্যবিত্ত পরিবারের অথবা কোনও সমষ্টির, যে সমষ্টি কোনও পেশায় বা বসবাসে সমষ্টি। তাঁর এই গল্পগুলি যখন কাগজে পড়েছি, তখন এমন মনে আসেনি। বইয়ে গল্পগুলির ভিতর একটা অতিরিক্ত সংযোগ ধরা পড়েছে।

তেমনটা মনে থাকল না শেষ পর্যন্ত। মধ্যবিত্ততা বা আঞ্চলিকতা বা পেশানির্ভরতার গল্পগুলি আলাদা নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের উদ্বেগ বা মানুষজনের ভঙ্গি বা কথা বলা নিশ্চয়ই আলাদা। সেই আলাদাগুলো মিলে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত অসমাধানে, অস্তিত্বের অসমাধানে। এক কালের রাজনৈতিক বিশ্বাস যেমন অস্তিত্বের অংশ, তেমনি রামলালের বহু হয়ে ওঠাও তো আর এক বিশ্বাসকে অস্তিত্ববান করে তোলার চেষ্টা।

শেষে, একটি প্রসঙ্গ এই গল্পগুলোকে নিয়ে তুলতে চাই।

বাংলায় মেয়ে-কথোয়াল (স্টোরিটেলার)-দের গল্প উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পারিবারিকতার বাইরে যাওয়া হয় না। হয়তো কোনও ভাষার মেয়ে-কথোয়ালই বৃহত্তর আয়তনের সমাজ বা নিসর্গ নিয়ে তেমন গল্প উপন্যাস তৈরি করেননি। কথোয়াল যে অভিজ্ঞতার আকার খুঁজছেন, তার ভিতর একটা অচেতন লিঙ্গভাগ আছে। মেয়ে-কথোয়ালরা যেন মেনে নেন, সে-অভিজ্ঞতার সীমা-সরহদ্দ কী হতে পারে আর পাঠকরাও সেটা মেনে নেন। মহৎ যে সব উপন্যাস মেয়েরা লিখেছেন, তাতেও এই লিঙ্গসীমা মেনে নেয়া হয়। তাতে তাঁদের রচনার মহত্ত্ব কিছুমাত্র কমেনি। সেই মহত্ত্ব সত্ত্বেও লিঙ্গসীমা লঙ্ঘিত হয়নি।

আলপনার এই গল্পগুলিতে আসানসোল-দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল ও শিল্পচ্ছায় অঞ্চলের মানুষজন তাঁদের নিজস্ব জীবন যাপন করেন ও তাঁদের জীবনের কথা বলে ওঠেন। আলপনার যে সামর্থ্যে তা সম্ভব হয়েছে, তাতে এই লিঙ্গসীমার নিষেধ তিনি ভাঙতে পেরেছেন। অনেক গল্পেরই কাহিনিতে সহজ সুযোগ ছিল — তিনি মেয়েটির দিক থেকে গল্পটি তৈরি করতে পারতেন। তাঁর যে-একমাত্র উপন্যাসটি বই হয়ে বেরিয়েছে — 'অশোকজাতক'— তাতে এই সামর্থ্য আরও ব্যাপ্তি পেয়েছে। বরং যেন মনে হয়, মধ্যবিত্ত মানুষজন বা সম্পর্ক নিয়ে লেখা তার গল্পে এক অভিমানী লিঙ্গবোধ এক ধরনের চরিত্রে এক টু বেশি সক্রিয়। অথচ নারীত্বের প্রশ্ন তিনি তীক্ষ্ণ করে তোলেন শিল্পাঞ্চলের অভিমানহীন মেহনতি এক একটি মেয়েকে ঘিরে।

দেবেশ রায়

৬.১১.২০০০

আত্মপক্ষ

প্রথম উপন্যাস বই আকারে বেরোবার আট বছর পরে যদি দ্বিতীয় উপন্যাস বেরোয়, প্রথম গল্পের বই বেরোবার চার বছর পরে বেরোয় দ্বিতীয় গল্পের বই; তাহলে সেই কাহিনিকারের তো একটা অনিশ্চয়তা থেকেই যায় — পরবর্তী বই আবার কত বছর পরে বেরোবে। অনন্ত পরমায়ু পেলে এ-কথাগুলো লিখতাম না, কিন্তু শতায়ু হলেও তো অর্ধেকের বেশি পেরিয়ে এসেছি।

তেমন অনিশ্চয়তা থেকেই প্রথম প্রকাশিত গল্প (১৯৮৮) থেকে ২০০০ পর্যন্ত লেখা গল্প — এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে লেখা গল্প এভাবেই সাজিয়েছি (এই সময়ে লেখা অনেক গল্প এর বাইরে রয়ে গেল) — নিজেকে, নিজের ভাবনাকে একটা সময়ের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে।

'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকার সম্পাদক আফিফ ফুয়াদের আগ্রহে এটি সম্ভব হল। যত্ন করে প্রুফ দেখে আমার পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন আর এক সহলেখক মুর্শিদ এ এম। এঁরা আমার স্নেহভাজন, তাঁদের শুভকামনা জানাই।

শ্রী দেবেশ রায় তাঁর লক্ষ ব্যস্ততার মধ্যে ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন। আমার লেখক হয়ে ওঠায় তাঁর পরামর্শ (কখনই উপদেশ নয়) একজন দিশারির মতোই। তাঁর কাছে ঋণী ছিলাম, ঋণী আছি। আর আমার ছেলেমেয়ে আর তাদের পিতৃদেবের কথা তো এই হয়ে ওঠার সঙ্গেই ওতপ্রোত।

আলপনা ঘোষ

কলকাতা ৭০০০৫৯

গল্পক্রম

বাজারে গপ্পো

ঘোষণা

শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জিপটা আসে। জুলাই মাসের বিকেল। তখনও যথেষ্ট আলো। দোকানে দোকানে মানুষ। কেনাবেচা চলছে। টুকটাক গল্প হচ্ছে, আড্ডাও দিচ্ছে কেউ কেউ। সজলই প্রথম ব্যাপারটা বোঝে। পান সাজতে সাজতে ও বারবার দেখছিল পাউরুটি-কেক-প্যাটিস-রোল নিয়ে বাসটা এল কি না— অমল আজই প্রথম গেল আসানসোল, এসব আনতে। মনে ভাবনা হচ্ছিল ওর। অনেক কষ্টে ছোটভাইকে দোকানের কাজে লাগাতে পেরেছে। দ্বিতীয়বার ঘোষণাটা শোনার অপেক্ষা করে। এমনিতে এখানে, এই ডাবরমোড়ে প্রায় প্রতিদিনই হাজারটা ঘোষণা হয়, রিকশায়, ট্যাকসিতে, জিপে। দাদ-হাজার মলম, লটারি, সার্কাস থেকে সিনেমা, যাত্রা, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পর্যন্ত। তাই প্রথমে কেউ গা করেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বারে জিপটা ডাবরমোড়ে দাঁড়ায় আর প্রথম বাক্যটি উচ্চারিত হবার পরই সবাই কেমন হতভম্ব হয়ে যায়। যেন একটি বাক্যেই কেউ তাদের ফ্রিজ করে দিয়েছে।
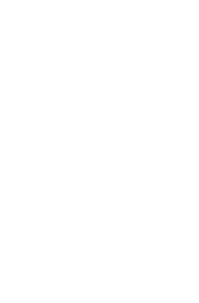
'একটি বিশেষ ঘোষণা, একটি বিশেষ ঘোষণা, সীতারামপুর থেকে রূপনারায়ণপুর রোডের দু-ধারে যাঁরা বেআইনিভাবে জমি দখল করে আছেন তাঁরা যেন আগামীকাল শনিবার চার সাত সাতাশির বিকেল চারটের মধ্যে ওইসব বেআইনি কনস্ট্রাকশন ভেঙে দেন। অন্যথায় সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন।'

এতক্ষণে সবার খেয়াল হয় জিপটা সরকারি।

দু-বার সম্পূর্ণ ঘোষণাটি শোনা যায়। তৃতীয়বার 'সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা' নেবার আগেই জিপ চোখের আড়ালে।

পটভূমি

রূপনারায়ণপুর রোড বাজারের মাঝখান দিয়ে সোজা চিত্তরঞ্জন গেছে। আড়াআড়ি আর একটা রাস্তা সামডি রোড, একদিকে আছড়ে হয়ে কোলিয়ারির দিকে অন্যদিকে রূপনারায়ণপুরের মধ্যে দিয়ে জি টি রোডে পড়েছে। এই দুই রাস্তার ক্রসিং-এ ডাবরমোড়। রূপনারায়ণপুর বাজার।

বিশ বছর আগে অবশ্য এসব কিছুই ছিল না। রাস্তার ধারে সামান্য কিছু সবজি আর অজয় নদীর মাছ নিয়ে স্থানীয় কিছু লোক বসত। দুটো স্টেশনারি, গোটা চারেক মুদিখানা, দুটো কাপড়ের দোকান, একটা 'হোমিও হল' — এই ছিল বাজার। সামডি রোডের দু-ধারে আদিগন্ত ধানখেত, একটা পুকুরের ধারে ছোট একটা শ্মশানও।

সেই ধানখেতের ঠিক মাঝখানে দরজা-জানলাবিহীন একটা পরিত্যক্ত বাড়ি হা হা

করত -- চৈত্রের দুপুরে কিংবা পৌষের রাতে। তখনও হিন্দুস্থান কেবলস কারখানা ছিল। ইউনিয়নও ছিল দক্ষিণে বামে। বছর পাঁচেক বয়সের হাইস্কুল ছিল একটা। তবে সাহেবদের বাংলো মাঝারিবাবুদের দোতলা কোয়ার্টার কিংবা আনস্কিল্ড লেবারের দু-কামরা একচিলতে উঠোনের একতলাগুলো ডাবরমোড়ের পাঁচিলঘেরা গাছপালা সমেত সাবেকি বাড়িগুলোর থেকে অনেক আলাদা।

কলকাতার কিছু লোক সস্তায় প্রচুর জমি কিনে মধুপুর শিমুলতলার মতো বাড়ি, বাগান করে রেখেছিল। ছুটিছাটাতে তারা এলে রূপনারায়ণপুরে রাত আটটার পরেও আলো জ্বলত। রেডিও বাজত।

এখন, এই বিশ বছরে রূপনারায়ণপুর বাড়তে বাড়তে ধানখেত খেয়েছে। হানাবাড়ি খেয়েছে। শ্মশানও। লোক বেড়েছে। বাড়ির পর বাড়ি উঠেছে। উঠছে। হিন্দুস্থান কেবল্‌স-এর কর্মী নয় এমন অনেক লোকও এসেছে জীবিকার তাগিদে। ফলে ডাবরমোড়ের দোকানবাজারও বেড়েছে। বাজার যেহেতু চওড়ায় বাড়া সম্ভব নয়, লম্বায় বাড়তে বাড়তে স্টেশন রোড পর্যন্ত চলে গেছে। এখন, মাইথন, জেমারি থেকে মাছ তো আসেই , সকালে যেসব মাছ চিত্তরঞ্জন বাজারে, একটু বেলাতেই তারা রিকশায় অথবা মিনিবাসে রূপনারায়ণপুরে। ডাবরমোড়ে। রেল কারখানা থেকে অবসর নিয়ে অনেকেই রূপনারায়ণপুরেই বাড়ি করেছে। চিত্তরঞ্জনে তো বাড়ি করার জায়গা পাওয়া যাবে না। তাছাড়া হিন্দুস্থান কেবল্‌স-এর লোকেদের তো হকই আছে রূপনারায়ণপুরে। সেই প্রয়োজনেই সিমেন্ট হার্ডওয়্যার-এর দোকানের সমান্তরালে তৈরি হয় আবাসিক হোটেল, পলিক্লিনিক, নার্সিংহোম, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব, কেজি স্কুল।

মানুষের জন্যই তো এতসব কিছুর এত দরকার। আর সেই দরকারেই মিষ্টির দোকানের পাশে পানগুমটি বসে। পান, বিড়ি, সিগারেট, দেশলাই থেকে সাবান, টফি, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, চানাচুর পর্যন্ত। প্রথমে একটা, তারপরে একটা, গুমটির সংখ্যা বাড়তেই থাকে, চাকরি না-পাওয়া ছেলেরা উপার্জনের স্বাদ পেয়ে যায়।

প্রথম দিকের গুমটিগুলো ছিল কিছু বিহারি ছেলের। মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট ঝেড়ে প্রথমে আসে সজল। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে কী করে যেন স্থানীয় এক নাটকের দলে ভিড়ে যায়। নাটক করতে করতেই পড়ার নেশা। গর্কির 'মা' রিহার্সাল দিতে দিতেই ও মাকে রাজি করায়। মায়ের গয়না ভেঙে দোকান হয়। বাবার কথা মনে করে মা গোপনে কেঁদেছিলেন টের পেয়ে সজল শক্ত হয়। 'সাজানো দোকান হলে হয়তো'..... এই পর্যন্তই ভেবেছিল ও।

প্রথম প্রথম খদ্দেরদের দিকে ও সোজাসুজি তাকাতে পারত না। মুখ নিচু করে কথা বলত। সবাই তো তার চেনা -- তারই বন্ধু, দাদার বন্ধু , বাবার বন্ধু , ভাইয়ের বন্ধু। আত্মীয়-কুটুম -- অনভ্যস্ত হাতে পান সাজতে হাত কেঁপে যেত। তবু সজল পেরেছিল। প্রথম মাসের টাকার সবটাই মার হাতে দিয়ে ও প্রণাম করেছিল। মা দশটা টাকা আলাদা

করে রেখে বলেছিলেন, 'কাল মঙ্গলবার চল কল্যাণেশ্বরীতে পুজো দিয়ে আসি।' চোখে জল এসে গিয়েছিল ওর। দিন দুই আগে দাদা বৌদি আলাদা বাসা করে চলে গেছে, সজলের ওপর মার এই নির্ভরতায় ও মনে জোর পেয়েছিল।

সজলের গুমটি দোকানের উলটো দিকে লালুর মাছের দোকান, সম্প্রতি বাঁধিয়ে নিয়েছে। সজলও ইঁট সিমেন্টে বাঁধিয়ে নিয়েছে সামনেটা। লালুর পাশে কাশেমের পাকাপোক্ত মাংসের দোকান। কাশেমকে নিয়ে ওদের মধ্যে একটা গল্প চালু আছে, খদ্দের চর্বি নিতে না চাইলে ও নাকি একটা চর্বির টুকরো খদ্দেরের নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে বলে — এটা চর্বি? উপস্থিত খদ্দেররা চুপ! ও আবার বলে — এটা যদি চর্বি হয় তাহলে আমি মাংস বেচাই ছেড়ে দেব।

অসিত, ওদের ব্যবসায়ী সমিতির পাণ্ডা, বলে, 'শালা। কোনদিন দেখব তুই ডাবরমোড়ের কুকুর কেটে বলবি, এটা কুত্তা হলে মাংস বেচাই ছেড়ে দেব!' মাংসের আরও কয়েকটা দোকান হয়েছে, তাও ওই গুমটিতেই যা বস্তুত চার পাওআলা কাঠের ছোট ঘরবিশেষ। অসিতের দোকানটা ভালোই চলে — বাহাত্তরে বাংলাদেশ জন্মের সময় ও চলে আসে এখানে দিদি জামাইবাবুর কাছে। এদিক-সেদিক অনেক চেষ্টা করে শেষে দোকান। ওদের বংশে দোকানে কেউ বসেনি। সবাই লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরিই করেছে। সজলের মতো ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। সবজি, ফল, মাংস, পান, পাউরুটি, স্টেশনারি দোকানের মাঝে ইট কাদার গাঁথনিতে দত্ত-র মুদিখানা। মাছের বাজার বসে গুমটিগুলোর সামনেই। তিন-চার হাত তফাতে। মিষ্টির দোকানও বেড়েছে।

রাস্তার একদিকে বাসস্ট্যান্ড, তার একপাশে আবার কংগ্রেস অফিসও। উলটো দিকে মিষ্টির দোকানের শেডের নিচে বসবার বেঞ্চ। হলুদ শাড়ি পরা বউকে বেঞ্চে বসিয়ে কোলিয়ারির ছেলে-ছোকরারা টেরিকটের প্যান্ট আর ডিসকোছাপ গেঞ্জি পরে চা, সিঙাড়া, কচুরি, মিষ্টি খায়। কাঁধে ঝোলানো টেপ আওয়াজ তোলে। সিনথেটিক শাড়ির ঘোমটা খসে বারবার। একহাতে মাথায় আঁচল তোলে, অন্যহাতে সিঙাড়া তুলে লাজুক মুখে কামড় দেয় বউ।

সকাল থেকে রাত ন-টা পর্যন্ত ডাবরমোড়ের বাজার জমজমাট। অনবরত হুস হুস গাড়ি চলে, এটাই তো চিত্তরঞ্জন-আসানসোল যাতায়াতের প্রধান পথ।

চাররাস্তা মিলেছে যেখানে, সেখানে একটা তেকোনা জায়গা। ঘেরা। সেখানে দিব্যি ছাউনি তুলে বাদল — আপেল, আঙুর, নাশপাতি, কলা সাজিয়ে বসেছে। পায়ের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জনা চারেক মুচি। ওরা আসে সকাল সাড়ে আটটার লোকালে। তিনকোণা ঘেরাটার নিচু দেয়ালে সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পের 'একটি গাছ একটি প্রাণ....' রোদে পোড়ে। জলে ভেজে।

খুব সকালে হিন্দুস্থান কেবল্স আর আছরা স্কুলের মেয়েরা নীল সাদা ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যায়। সাদা কেড্স-এ কাদা লাগার ভয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে। তখনও বাজারের

ঘুম ভাঙেনি, শুধু এখানে-ওখানে জায়গা রাখার ইট রাখা। দোকানে শোয় যারা, তাদের কেউ কেউ ঘুমভাঙা ফোলা চোখে মেয়েদের দ্যাখে, কেউ চাদর মুড়ি দিয়ে খাটিয়ায়। লেপ-তোশক বানানোর বিহারি মুসলমানরা বাঙালি সোফা-কাম-বেডের ওপর কেউ, কেউ ফোলডিং খাটে নতুন তোশকে।

সে সময়েও ডাবরমোড়ে দুর্গন্ধ বেরোয়। ঘুমন্ত ডাবরমোড়ের গন্ধ — মাছ মাংসে তরকারির পচা গন্ধের সঙ্গে মেশে তেলেভাজা মিষ্টির দোকানের তেলের কটুগন্ধ , বেঞ্চিতে বসে ভাত-রুটি খাবার সস্তা হোটেলের গন্ধ। বাজারের স্থায়ী বাসিন্দারা, যারা রাতে দোকানে বা রাস্তার ধারে শোয়, রাত-বিরেতে দরকারে রাস্তার ধারেই উবু হয়ে বসে। সেই তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধও জড়িয়ে যায় অন্যান্য গন্ধের সঙ্গে।

খুব শুকনো দিনে ছাড়া পাড়াগাঁয়ের শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা বুড়ির মতো হাজামজা শরীর ভিজেই থাকে ডাবরমোড়ের। বর্ষায় জলকাদায় বাজার যেন হয়ে ওঠে সরকারি হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডের টয়লেট।

ইদানীং পঞ্চায়েত থেকে দুটো বড় ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতিও সকাল-বিকেল ঝাঁট দেবার জন্য একটা আধপাগলা লোক রেখেছে। জগার লিকলিকে শরীরে পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকলেও মাথাটাই একটু গোলমেলে। রোজ সকাল-বিকেল কার বাড়ির একটা ফেলে দেয়া মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে সে এদিকের আবর্জনা ওদিকে আর ওদিকের আবর্জনা এদিকে করে রাখে। ডাস্টবিন রাখার আগের দিনও সে অসিতের কাছে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছে।

এই বাজারের নাটকে জগা যেন এক কমিক রিলিফ।

ঘোষণায় প্রতিক্রিয়ায়

ব্যাপারটা যে একেবারেই কেউ জানত না তা নয়। কেবল্‌স্‌ মাঝে মধ্যেই হুমকি দিচ্ছিল, মাস কয়েক হল। 'পি ডবলিউ ডি অ্যাকশন নেবে' এরকম একটা কানাঘুষাও শোনা গিয়েছিল, তবে তা পঞ্চায়েতের বাইরে যায়নি। পঞ্চায়েতের মাথা রফিকসাহেবও বুঝতে পারেনি কেবল্‌স্‌ আর পি ডবলিউ ডি একসাথে এত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেবে। ফলে সন্ধেবেলায় এরা সবাই তার কাছে গেলে সে ভারি অপ্রস্তুত হয়। সে একবার সবার দিকে একনজরে দ্যাখে, তারপর আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে। তারপর ঠিক লোকটিকে বেছে নেয়। এটাই রফিকসাহেবের বৈশিষ্ট্য। তার চেহারায়, বেশভূষায় বেশ একটা গ্রাম্য ভাব আছে। লোক নির্বাচনে তার আজ পর্যন্ত ভুল হয়নি। অসিতের দিকে তাকিয়ে সে প্রথমে একটা বিড়ি ধরায়, তারপর বলে — 'হাতে তো টাইম নাই , এত তাড়াতাড়ি কি একটা আন্দোলন অর্গানাইজ করা যাবে?'

— আন্দোলন ? কেন?

— বা, এই ইস্যুতে তোমরা আন্দোলন করবে না? কিন্তু তার জন্য সর্বাগ্রে চাই সংগঠন।

অমল বলে — মাস্টারসাব, (রফিক একটা প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার) পুলিস এসে আমাদের দোকানগুলো ভাঙুক, আর তারপর আমরা মিছিল করি মিটিং করি এই কি আপনি চান?

— তা বলে মাথা গরম করলে তো কোনও সঠিক পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

এবারে অসিতই চটে ওঠে :

— সঠিক পদক্ষেপটা কী, সেটা বলুন? গণচেতনা জাগানো? সে তো আপনারা মশা মারতেও গণচেতনা জাগান?

— মানে?

— মানে আবার কী? সেবার সুনীলদার ছেলে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশা মারার জন্য চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। বলেছিল -- আমরা নিজেরাই তো আমাদের পাড়ার ঝোপঝাড় সাফ করে স্প্রে করতে পারি, কেরোসিন তেল ঢালতে পারি। তা আপনার কমরেডরা কী বলল জানেন? বলল, এভাবে হয় না। আগে গণচেতনা জাগাতে হবে। গণচেতনা।

— বেশ, তাহলেও আমি একা কোনও ডিসিশন নিতে পারি না। পঞ্চায়েতের মিটিং ডাকি আজ রাতেই , তাতে যা সিদ্ধান্ত হয় হবে। তোমরা বরং সবাইকে খবর দাও।

মিটিং চলছে। ডাবরমোড়ে ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। সেসময় হঠাৎই পি ডবলিউ ডি-র জিপ ফের আসে। দু-জন নামে। একজন অপেক্ষাকৃত কম-বয়সি। নেমে এদিক-ওদিক তাকায়। বয়স্ক লোকটি পা ফাঁক করে 'অ্যাট-ইজ' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গোল্ড ফ্লেক খায়। অসিত মেম্বার। তাই মিটিং-এ।

বাকি সবাই এগিয়ে আসে, ঘিরে ধরে দু-জনকে। বয়সে বড় বলে দত্তই এগিয়ে আসে—

— আমরা কোথায় যাব স্যার? বউ-বাচ্চা নিয়ে খাব কী? লালু-কাশেমও এগিয়ে আসে...

— চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে দোকান ভেঙে দেবেন, বাজারটা বসবে কোথায়?

বাকিরাও তাই বলে। নরমে। গরমে।

ছাই ঝেড়ে গোল্ড ফ্লেক চেঁচিয়ে ওঠে — সরকারি জমিতে দোকান তুলেচ বেআইনি ভাবে আবার চোক গরম করচ? চব্বিশ ঘন্টা তো দেদার টাইম হে।

মাছওয়ালি কমলামাসি ঝংকার দেয়:

— তা ঠিক বাছা, ভাঙতে গেলে ত চব্বিশ মিনিটও লাগে না— আমাদের ত দুকান টুকান লাই , রাস্তার ধারে বসি — ত এবারে বইস্ব কি বাবুদিগের দালানে?

এবার প্রথমজন কথা বলে।

— দেখুন, আপনাদের এগেইনস্ট-এ বহুদিন ধরেই নালিশ হচ্ছে। তবে আমাদের তো কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। আপনাদের ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিকে ডাকুন। ওদের সাথেই কথা বলব।

কথাটা সবার মনে ধরে। ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট সুনীল চৌধুরী ওপরের দিকের নেতা, তবে রিটায়ার করার পর দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে একটু বেকায়দায় আছেন। আর সেক্রেটারি রফিকসাহেব তো নিবেদিত-প্রাণ নেতা। তখনই চারজন সাইকেলে রওনা হয়ে যায়। এরা ফিরে এলে সবাই আর একবার চমকে যায়। সুনীল চৌধুরী এবং রফিকসাহেব দু-জনেই এলেন কিন্তু দু-জনেই পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন যে তাঁরা ব্যবসায়ী সমিতির সাথে জ্ঞানত জড়িত নন। অতঃপর কারও সাথে কোনও কথা না-বলেই পি ডবলিউ ডি-র লোক দুটি জিপে ওঠে। ছোটজন খালি বলে,

— সরি, আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলাম না।

এরপর অসিত ফিরে না আসা পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। আলোচনা শুরু হয় কখন ভাঙতে আসবে। কীভাবে ভাঙবে। কেউ বলল ক্রেন আনবে। আর একজন বলল — বুলডোজার দিয়ে সাফ করে দেবে। চিত্তরঞ্জনের ব্যাপারটা জানিস তো? দুগ্‌গাডিহির কথা মনে নেই?

— শালা, প্রেসিডেন্টের নিকুচি করেছে! হারামির বাচ্চা ঢপ দিতে ওস্তাদ!

— লম্বা-চওড়া বাকতাল্লার বেলা আছে তোদের ওই রফিকসাব। এখন কুত্তার মতো ল্যাজ গুটিয়ে নিল। শালা! মহিম সশব্দে থুতু ফেলে।

— তা ভাই শালাই বল আর জামাইবাবুই বল, এখন সব ঘুঘুই হাওয়া। যা করবার আমাদেরই করতে হবে।

— কী করবি?

— আগুন লাগিয়ে দেব। শালাদের ঢুকতে দেব না। বাঞ্চোৎ, দুটো করে-খাচ্ছি ভদ্দরলোকের ছেলে প্রাণে সইছে না।

— আরে সাট্টা নেই, চুল্লু নেই, চুরি ছিনতাই করি না, ডিম-পাউরুটি-পান বেচে কি ব্যাটাদের বাঁ হাতের চুলকুনি সারাতে পারব? দেব সব ক-টাকে শুইয়ে।

এমনি সময় অসিত আসে। মুখ শুকনো। গম্ভীর। সবার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

— কীরে, কী হল ডিসিশন?

— কিছুই না।

— কিছুই না?

— বলতে পারিস আপাতত কিছুই না। নো প্রতিবাদ, নো রেজিস্ট্যান্স। ওদের ভাঙতে দাও। পিসফুলি।

— এই বললে পঞ্চায়েত?

— হ্যাঁ। বলল বাজারের জন্য নাকি জমি কেনা আছে ওই লাইনের ধারে। পুকুরের সামনে। এখন অবশ্য ওতে বসা যাবে না। জমি ভরাট করতে হবে। মাপজোক.... সে নাকি সময় লাগবে। বাংলাদেশি টানে কথাগুলো বলে অসিত। ওর উচ্চারণের ভঙ্গিটাই রয়ে

গেছে, নইলে ওকে বর্ধমানের লোক বলেই মনে হত।

— একে তো ভেতরের দিকে জমি, মহিম বলে, তার সময় লাগবে, তা কতদিন?

— ধর দশ থেকে বারো মাস।

কে যেন মন্তব্য করে:

— শালা পঞ্চায়েত বাজার বিয়োবে নাকি হে? সবাই হেসে ওঠে। অসিতকে চিন্তিত দেখায়।

— ব্যাটারা ইচ্ছে করেই আজ অ্যানাউন্স করল যাতে শনিবার কোর্ট কাছারি না করতে পারি।

— তাহলে?

একটু চুপ করে থাকে অসিত। তারপর বলে:

— শোনো, কাল একবার আসানসোলে এ ডি এম-কে ফোনে ধরতে হবে। দোকানের জিনিসপত্তর সরাতে হবে। নইলে যেতাম। যদি ফোনে পাই তাহলে ব্যবস্থা যা হোক একটা হবেই। ইনজাংশান জারি করারই চেষ্টা করব।

এরপরেও সবাই দাঁড়িয়ে থাকে আরও কিছু সময়। যেন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেই কোনও একটা সমাধান হয়তো অলৌকিকভাবেই হয়ে যাবে। এইভাবে শুক্রবারের রাত শেষ হয়।

প্রতিরোধ, তবু ভাঙে

শনিবার সকালেও বাজার বসে। প্রাণহীন। খদ্দের দোকানদার কেনাবেচার ফাঁকে একই কথা বলে। তরিতরকারি গতকালের বাসি, শুকনো, মাছও বিশেষ ওঠেনি, তবুও বেশি দামে বিক্রি হয়ে যায়। বাজার ভেঙেও যায় তাড়াতাড়ি। অস্থায়ী গুমটিগুলো সরাতে শুরু করে কেউ কেউ। মালপত্র সরিয়ে ফেলে যতটা পারে। অসিত নিজেই শাবল চালিয়ে গাঁথনি ভাঙে। যেটুকু ইট, তক্তা, টালি পাওয়া যায়।

এ ডি এম-কে ফোনে পাওয়া যায় না। শুক্রবারই নাকি আউট অব স্টেশন। এ নিয়েও ওদের কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগে। লালু বলে, 'পঞ্চেৎ জমি লিয়েচে? ফুঃ। তা শালা বাজারট বনাই দিলেই পারত। ভাইঙতে হত না— আপনি হাইসতে হাইসতে উঠ্যা যেতম।'

কাশেম গাল দেয়, 'মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নারে লেলো, তোর কিরে? শ-খানেক ইট সিমিট বালি দিয়ে গেঁথেছিস। এক লাথি ঝেড়ে বাঁট দু-খানা তুলে নিলেই হল?'

সজল সাইকেলের রডে দুটো বড় বড় ক্যাম্বিশের ব্যাগ ঝুলিয়ে অমলকে বলল, আমি এ দুটো রেখে আসি। তুই বাদবাকি জিনিসগুলো ততক্ষণে ভরে ফেল।

ওর বুক ভেঙে যাচ্ছে। এই দোকান ওর লক্ষ্মী। ভাগ্যিস মাস ছয়েক হল, ও কেবল্‌স-এ চাকরি পেয়েছে, নইলে মা ভাই বোন নিয়ে ওকে পথে বসতে হত। ওদিকে তাকাতেই

দেখল, কাশেমের দোকানের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে যে-লোকটা ডিম বেচত — ওখানেই রাঁধত, খেত, কোনও কোনও দিন শুতও, সেই বুড়ো আবদুল ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে। সজল একা নয়, এ বাজারের সবাই জানে, বুড়োর তিনকুলে কেউ নেই। সজল চোখ সরিয়ে প্যাডেলে পা রাখল।

দত্ত ঠিক কী করবে বুঝতে পারে না। আজ প্রায় বিশ বছর ধরে একটা একটা করে ইট গেঁথে দোকান সাজিয়েছে। চাল ডাল মসলাপাতি তেলের টিন আলু পেঁয়াজ , একা এতসব কী করে সরাবে ভেবে পায় না। বয়সও হয়েছে। মনে মনে ভাবে তার দোকান আর একটু যদি পেছনে হত... যদি পেছনের চৌধুরীদের বাড়িটা.....যদি বিশ ফুট জায়গা ছাড়ার বদলে দশ ফুট জায়গা ছাড়তে হত।

ওকে এভাবে বসে থাকতে দেখে হরি এগিয়ে আসে। ওদের পাঁচ ভাইয়ের তিনটে ফলের দোকান। ওদের বাড়ি জামতাড়া।

— ওহো দাদা, জলদি করুন। অ্যায়সা বৈঠনেসে কেয়া ফায়দা? লিন্ ঠাণ্ডা হয়ে বসুন তো, আমরা ঠিক করে দিচ্ছি।

ছোকরার হিন্দি বাংলা সংলাপের জবাবে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ির ফাঁকে দত্ত ম্লান হাসে। কৃতজ্ঞতায় বড় বড় রক্তাভ চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

রাত দশটা নাগাদ সবাই মোটামুটি প্রস্তুত। দুটো ড্রামই উপুড় করা। চৌমাথার দু-হাত দূরে রূপনারায়ণপুর রোডের শুরুটা কিছুদূর পর্যন্ত কেবল্স রোড। একটা কংক্রিটের পাল্লা ছাড়া গেটের আদলও আছে। তার এপারে একটা, উলটো দিকে আর একটা ড্রাম দিয়ে ব্যারিকেড করা। বাঁশ কাঠ তক্তা কাগজ পোস্টার চট বস্তা যে যা পেরেছে জড়ো করেছে। কেরোসিনে সেগুলো খানিকটা ভিজিয়েও দেয়া হয়েছে।

মজা দেখতে অত রাতেও খাওয়া-দাওয়া সারা জনাকয়েক উৎসাহী দর্শক জুটে যায়।

ঠিক এগারোটা পঁয়তিরিশে দু-জন সাইকেলে খবর আনে।

— আসছে, আসছে।

সবাই নড়ে চড়ে ওঠে। টানটান হয়ে তাকিয়ে দ্যাখে। একটা লরি আর একটা জিপ। পুলিশের না কেবল্স-এর সিকিউরিটির রাস্তার অল্প আলোয় ঠাহর হয় না। পরে বোঝা যায়, লরিটা পি ডবলিউ ডি-র। জিপটা সরকারি। লরি ভর্তি লোক। হাতে শাবল। গাঁইতি। বোঝা গেল এরা তৈরি হয়েই এসেছে।

কেউ একজন দেশলাই জ্বালায়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুনের সামনে জিপ দাঁড়ায়। আট-দশজন পুলিশ লাফিয়ে নামে। দারোগাও। সিকিউরিটির লোকও নামে কেবল্স-এর তকমা এঁটে। ওরা ঠাণ্ডাভাবে অপেক্ষা করে।

এদিকে আগুন ওদিকে আগুন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ক্রুদ্ধ অসহায় কিছু মানুষ। সারাদিন প্রায় খাওয়াই হয়নি কারও। ঘামে ভেজা হাত মুঠো করে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। আগুনের

আভায় ওদের মুখগুলো অপার্থিব দেখায়। এভাবেই কাটে কিছুক্ষণ, তারপর ....

আগুন তার নিজের নিয়মেই আস্তে আস্তে নিবে যায়। এ তো তেমন আগুন নয়, যার শিখা থেকে জ্বলে উঠবে অসংখ্য মশাল। এ নিতান্ত কতগুলো অসহায় মানুষের নিষ্ফল ক্রোধের আগুনমাত্র।

আগুনের বদলে পড়ে থাকে কিছু ছাই। সেই ছাই মাড়িয়ে বুট জুতোর আওয়াজ তুলে সরকারি লোক এগিয়ে আসে। লাঠি চালায়। গাঁইতি শাবল হাতে পি ডবলিউ ডি-র মজুররা এগিয়ে আসে। খেটে খাওয়া মানুষই ভেঙে দেয় খেটে খাওয়া মানুষের ভাত-কাপড়ের সংস্থান।

উপসংহার

রূপনারায়ণপুর বাজারের গপ্‌পো শনিবার রাতে বেশ নাটকীয় ভাবে শেষ হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে কোনও গল্পেরই 'নটে গাছটি' মুড়োয় না, সে তার শিকড়েবাকড়ে, ডালপালায় ক্রমাগত বেড়েই চলে। মানুষের জন্ম থেকেই এই গল্পের শুরু — তাই প্রকৃতপক্ষে এই দুনিয়ায় কোনও গপ্‌পোরই শেষ নেই। তবু তো কোথাও থামতেই হয়। অলিখিত গপ্‌পো চলতেই থাকে এ ব্যাপারটা জেনেও থামতে হয়।

রবিবার অনেকেই শুধু ভাঙা বাজার দেখার জন্যই বেরোয়। কার দোকানের কতটা ভেঙেছে, কে সাড়ে আট হাজার টাকায় ভেস্টেড্-ল্যান্ড কিনে পথে বসল, শাবল গাঁইতি ছোট দোকানের ওপর যত পড়েছে, বড় দোকানের গায়ে তত পড়েনি — এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা। তা রূপনারায়ণপুরে এটা বলবার মতো, আলোচনা করবার মতো একটা ঘটনাই বটে।

দত্ত দাঁড়িয়েছিল ওর ভাঙা দোকানের সামনে। অসিত সজল হরি মহিম আরও সবাই ওকে ঘিরে। কালকের ভেঙে পড়া দত্তর সঙ্গে আজকের স্থির কঠিন মুখের দত্তর কোনও মিল নেই। সে অসিতের দিকে সোজা তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কী বললি? বাজারের জমি নিয়ে মামলা চলছে? তাহলে আমরা বসব কোথায় তোর পঞ্চায়েতকে জিগ্যেস করে আয়।

অসিত বিব্রত মুখে তাকায়:

— এত রাগ করছেন কেন দত্তদা? দোকান তো আমাদের সবারই গেছে। একটা ব্যবস্থা হবেই। আমরা কি অমনি ছেড়ে দেব ভেবেছেন?

দিন পাঁচেক ভাঙা ইট পাথরের ওপরেই বাজার বসে। গেটের এপারেই ভিড় উপচে পড়ে। ওধারে গেলেই কেবল্‌স-এর সিকিউরিটি বাহিনী রুলের গুঁতো মেরে বের করে দেয়। শেষে পঞ্চায়েত একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করে। একজনের পড়ে-থাকা জমিতে মাথাপিছু দৈনিক একটাকা ভাড়ায় কয়েকদিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় অস্থায়ী বাজার।

অসিত ওর নতুন দোকানটা অনেক বড় করে সাজিয়েছে। সবুজ হলুদে রং দিয়েছে। একটা আলাদা শো-কেসে কেক পেস্ট্রি রেখেছে।

সজলের ছোট্ট গুমটিতে সকালে অমল বসে। বিকেলে ডাবরমোড়ের একটু পেছন দিকে একটা নড়বড়ে টেবিল পেতে পাউরুটি বেচে কখনও সজল, কখনও অমল।

নতুন বাজার বসার মাস দুয়েক বাদে দত্তকে দেখা গেল কাশেমের দোকানে মাংস কিনতে।

কাশেম বলল, 'অনেকদিন আপনাকে দেখিনি দত্তদা।'

দত্ত বলল, 'তোদের কাছে আসতে আমার ঘেন্না করে কাশেম। কত টাকা সেলামি দিয়েছিস?'

কাশেম মাথা নিচু করে মাংস বাছে, 'এখানে সেলামি লাগেনি। লটারি হয়েছে, তা মন্দ কী হল দাদা, ভাড়া তো দিন একটাকা। আপনার জায়গা মিলল না?' দত্ত বলল, 'আমাদের মতো মানুষের কি জায়গা মেলে? আমি তো পালটা ব্যবসায়ী সমিতি করেছি। রেজিস্ট্রেশন হলেই ইনজাংশান। তখন দেখব তোদের পঞ্চেত আর কেবুল কী করে? শালা, বাজার থেকে ভাড়া উঠছে তিন হাজার, জমির মালিককে দিচ্ছে আটশো, তোলা ওঠানোর ছোঁড়াটাকে চারশো। বাকি টাকা নাকি তোদের সেই বাজারের বিল্ডিং বানানোর খাতে জমা পড়ছে। মামদোবাজি?'

কাশেম বলে, 'আমি গরিব লোক দত্তদা, এতসব জানি না, তা বাজারে অনেক নতুন লোক দেখি বটে। পুরনো অনেককে আবার দেখিও না। রফিকসাহেবের বড় ছেলেটাও তো একটা ঘর পেল।'

দত্ত বলল, 'হারামজাদার গুষ্টিসুদ্ধু বসিয়েছে। তবে আমিও ছাড়ব না।' হঠাৎ পুরনো খদ্দের বিপিনবাবু দত্তকে দেখে বললেন, 'নমস্কার। ভালো আছেন দত্তমশাই?'

--- হ্যাঁ, নমস্কার, ভালোই আছি।

— দোকান দিলেন না এখানে?

দত্তর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। অসিতের দোকানের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলে, 'না, এখানে দোকান দেব না। আর ক'টা দিন সবুর করুন, পুরনো জায়গাতেই দোকান দেব।'

কিন্তু দত্তর মতো মানুষদের জানবার কথা নয় সেই মুহূর্তে পঞ্চায়েত আর স্থানীয় এক জমির মালিক ও ঠিকাদারের এক গোপন বৈঠকে ব্যক্তিগত মালিকানায় সুপারমার্কেটের একটা খসড়া তৈরি হচ্ছিল। তাতে পঞ্চায়েতকে দেয়া হবে খানকতক ঘর। সেই ঘর পেতে গেলে কোথায় কোথায় কতখানি কাঠখড় পোড়াতে হবে সঙ্গে সঙ্গে সেই গপ্পোও তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

প্রতিক্ষণ ১৯৮৮

প্রতিবন্ধী

আনোয়ারার সংসার

আনোয়ারা নামে এক ভরভরন্ত যুবতী নিজের গোটা চারেক বাচ্চা, মৃত সতীনের একটি কিশোরী মেয়ে, মধ্যবয়সী এক রিকশাওলা স্বামী ও পাঁচ-ছটি ছানা সমেত গোটা দু-তিন মোরগা-মুরগি নিয়ে সংসার করে।

তার ঘর বলতে একচিলতে বারান্দাসমেত টালি-ছাওয়া এক কামরা, আর খানিকটা বেআব্রু উঠোন। সেই উঠোনে কাপড় শুকোতে দেবার তার আছে, একপাশে মুরগির ঘর আছে — প্যাকিং বাক্সের কাঠ দিয়ে বানানো। এটা বানিয়েছে ওর আট বছরের ছেলে কামাল। মুরগিদের সম্পর্কে তার জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ যে কোনও সাবালক মানুষের মতোই।

আনোয়ারার সতীনের মেয়ে সাকিনা, এবার নতুন ভোটার হয়েছে। সাকিনা হাঁটতে পারে না —পায়ে দোষ আছে। বসে বসে রান্নাবান্না করতে পারে, ভাইবোন সামলাতে পারে। আর যেটা পারে সেটা দেখলে তাজ্জব বনতে হয়। তেমন ঘরে জন্মালে কাগজে ওর ছবি বেরোত — টিভি-তে দেখা যেত ওকে। পুরনো কাপড়ের ওপরে পুরনো শাড়ির পাড় থেকে সুতো তুলে ছোট ছোট ফোঁড়ে ও এমন নকশা বুনে দেয় যে, দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। আর দু-দণ্ড যদি ওর শিল্পকর্ম দেখবার জন্য দাঁড়াতে হয় তা হলে তো আরও দু-দণ্ড দাঁড়াতে হবে সাকিনাকে দেখতে। জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতো নিকষ ওর রং, দিঘির মতো স্বচ্ছ ও ছলছল দুটো চোখ, সানকিভরা পান্তা পায় কি পায় না, ওর শরীর যেন একটা আস্ত জীবন; ওর শরীর যেন এক অনন্ত মরণ। এই জীবন-মরণের সীমানায় সাকিনার মুঠোয় ধরা সরু কোমর। সীমানার ওপরে ওর নতুন জেগে ওঠা শরীরটি যেন আঁচল পেতে রেখেছে কার প্রতীক্ষায়। সীমানার নিচে ওর বিস্তৃত শরীর যেন উর্বর মৃত্তিকার মতো ফলবতী হবার অপেক্ষায়। এমন শরীরের ভার বইবার মতো দু-খানা পা সাকিনার নেই। এমন শরীরকে আকাশের নিচে চিত্রিত করার জন্য ওর কোনও পদচিহ্নিত ভূমি নেই।

ওর পাঁচ বছর বয়সে রোগের লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে। ও হাঁটতে শেখে দেরিতে — সে হাঁটা দৃঢ়তা পাবার আগেই ডান পা মোটা হতে আরম্ভ করে। তখন ওর নিজের মা ফতিমা বেঁচে। সেই কেঁদে পড়ে বাড়ির কাছের ডাক্তার বাবুটির কাছে। তিনি নিজ ব্যয়ে ওকে মেয়ে সমেত আসানসোলে পাঠান। প্রথমে নাকি ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেননি কে রুগি। ঢাকাচুকি দেওয়া সাকিনার একমাথা কালো চুল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চোখ আর হাসি সমেত মোটা মোটা দুই শিশু হাতের ব্যগ্রতায় তো কোনও রোগের লক্ষণ ছিল না বরং ওকে কোলে করা ফতিমারই সমগ্র ভঙ্গিমায়, শুধুমাত্র শারীরিক ভঙ্গিমায় ছিল এক দীর্ঘ অসুস্থতার

চিহ্ন। কিন্তু নিজের জন্য ফতিমা তো নিজের সাধ্যের বাইরে যেতে পারে না। সাধ্যের বাইরে যাবার সাহস তো সে সাকিনা, তার একমাত্র সন্তানের পায়ের দিকে তাকিয়েই পায়।

তা সেই সাধ্যের বাইরের আধুনিক চিকিৎসায় ধরা পড়ে, সাকিনার ডান পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কোনও হাড় নেই। বাঁ পায়ে হাড় আছে তবে তা খুবই সরু। বার দুয়েক অপারেশন করলে ডান পা স্বাভাবিক হবে। বাঁ পা আপাতত ভিটামিন অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ ও ভিটামিন খাওয়ার ফলাফলের ওপর থাকবে।

একবার অপারেশন করে মাংসের দলাটা, যেটা ডান পায়ের হাড়ের জায়গায় ছিল, বাদ দেওয়া হয়। তাতে রশিদের বাড়িটা বাঁধা পড়ল মহাজনের কাছে। ফতিমার কানের মাকড়ি, নাকের ফুল আর কোমরের রুপোর গোট গেল ডাঃ সেনের নার্সিংহোমে। সেই টাকা-পয়সার তলানিটুকু নিঃশেষ করে ফতিমা নিজেই কবরে গেল বছর ঘুরতে না ঘুরতে।

রশিদের ছোটবিবি আনোয়ারা সাকিনার চাইতে এমন বড় নয় যে সাকিনা ওকে মরা মায়ের মতো ভাববে। আনোয়ারা ওকে যত্ন-আত্তি করে, যেটুকু ভালো-মন্দ জোটে তা নিজে তো খায়ই না, ছেলেমেয়েকে দেবার আগে সতীনের মেয়েকে খাওয়ায়। সাকিনা মুখে 'আম্মা' বললেও মনে মনে ওকে মাতৃস্বরূপা ভাবতে পারে না।

কালো বলে সাকিনার বড় দুঃখ। আনোয়ারার পাশে তাকে যেন আরও কালো দেখায়। তাছাড়া আনোয়ারা মাঠে কাজ করে —ধান রোয় — ধান কাটে। সারা বছর কাজ না থাকলেও মাসকতক সে নিজের শ্রমের পয়সায় মটমটিয়ে হাঁটতে পারে হাওয়াই চটি পরে।

এমন দিনে সাকিনা শুধু তাকিয়ে দ্যাখে আর নিজের ক্রমশ ফুলে ওঠা ডান পা আর শীর্ণ হতে থাকা বাঁ পা ছেঁড়া ওড়না দিয়ে ভালো মতন ঢেকে রাখে।

আনোয়ারার বাচ্চাগুলো মুরগি-ছানা কি হাঁসের ছানার মতো নিজেরাই বেড়ে ওঠে। দুটো-একটা মরেও যায়। সাকিনা, আনোয়ারা কাজে গেলে, ভারি আনমনা, ওদের ডেকে ডেকে জড়ো করে। খাওয়ায়। ঘুম পাড়ায়।

রশিদ রিকশা চালায়, কিন্তু ও এত কমজোরি মরদ যে, এই কাজটা নিয়ম করে করা ওর পক্ষে অসম্ভব। আনোয়ারার চাইতে সে পনেরো বছরের বড়। সারা শীতকাল তার এক অদ্ভুত কাশি লেগে থাকে। সেই কাশি নিয়ে রোজ দু-বেলা রিকশা চালানো না গেলেও সেই কাশি নিয়ে একটু বেলা করে উঠে উঠোনের রোদ্দুরটুকু দখল করা যায়, শ্লেষ্মা আর থুতু-মেশানো গালাগাল দিতে পারা যায়, বউবিটি আর কুঁকড়োর পালের মতো ছানাপোনাদের, চাইকি রাত্তিরে জোয়ান বউয়ের শরীর থেকে খানিকটা ওম পুইয়ে শরীরের তৃপ্তিতেই একখানা তোফা রাতকাবারি ঘুমও দেওয়া যায়।

কিন্তু এই কাশি আর শুকনো শরীর নিয়ে যে আর কিছু করা যায় তা রশিদ জানে না। ভাবে না।

সাকিনা, বড় হওয়ার পর বারান্দায় শোয় ভাইবোন নিয়ে। ছোটটা অবিশ্যি ঘরেই থাকে মায়ের কাছে। এক একদিন সাকিনা ওর অস্থির শরীর নিয়ে শোনে আনোয়ারার চাপা

তীব্র কণ্ঠস্বর, 'একটু রও, ছেলোডা মাই ছাড়ে নাই অখনও।'

উত্তরে রশিদের উন্মত্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ আর বুকভাঙা কাশি।

এক একদিন আনোয়ারা দড়াম করে কপাট খুলে বাইরে। সাকিনা কাঁথাকানি জড়ানো, ভাইবোনদের জড়াজড়ি হাত-পায়ের বাঁধনে গুটিসুটি পাকিয়ে আনোয়ারার কান্না শোনে।

— মরণও নাই বুড়ার।

ভরা যুবতী, আনোয়ারা হিম কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁদে। শরীরের জ্বলনে কাঁদে। সাকিনা, কিশোরী, যেন মৎস্যকন্যা কাঁপে। নতুন শরীরের অস্থিরতায় তার কাঁপন আসে। সে বোঝে না কেন তার হিমে যেতে সাধ, কেন কুয়াশা মেখে নিতে সাধ।

তার অক্ষম পা-দুটি তার পূর্ণ শরীরের জন্য শুধুই বেদনা সঞ্চার করে।

শীতের বেলা

সকালে রোদের আগে বাতাসে মিহি কুয়াশা। কার্তিক শেষ — গেরস্তর উঠোনে এখন খড়ের গাদা। মাঠে হাঁটতে পায়ে ফোটে কাটা ধানের গোড়া।

ভোর পাঁচটায় শেষ রাতের আঁধার কুয়াশায় ঘন। বিকেল পাঁচটায় আঁধার যেন ভোরের ওপিঠ — এমন ঘন। সেই আঁধারে লম্ফ জ্বেলে কাঠকুটোর জ্বালে আনোয়ারা ভাত ফোটায়। সে এমন গরিব নয় যে রোজ ভাত ফোটাতে পারে না, আবার সে এমনই গরিব যে রোজ পেটভরা ভাত ফোটাতে পারে না।

আজকাল ওর মনে বড় ভয়। ভয় শরীরেও। শরীরে আবার ভয়ের সাথে জ্বালা— শরীরের সেই জ্বালা ওর জুড়োয় না আজকাল।

সাকিনা বলে, 'আম্মা, আজ আর মাড় ফেলোনি।'

আনোয়ারা কোলেরটাকে কাপড়ের আড়ালে ঢেকেঢুকে বলে, 'খিদা জানায় নাকি তকে?'

উত্তরে সাকিনা বলে, 'কয়রোজ হল আজ? আব্বা আজও এলনি?'

রেহানা বলে, 'পনেরো-বোলো দিন হল আজ।'

— যাহ্।

রশিদ আজ বারো-তেরো দিন বাড়িছাড়া। ডাক্তারবাবুর পড়শি রফিকসাহেবের দেশ ভাগলপুর। সেখানে গোলমাল লেগেছে শুনে রফিক বিবি বাচ্চা আনতে যায় — সঙ্গে রশিদ। গোলমাল যদি লেগেই থাকে তা হলে ফিরতে দেরি হওয়ার নানা কারণ ঘটতে পারে। সেইসব কারণ সব সময় সত্যি নাও হতে পারে। খবর না-এলে অথচ কোনও কিছু খবর হয়ে উঠলে, কাগজের খবর হিসেবে ছাপা হলে মনের মধ্যে ভয় তৈরি হয়। আশঙ্কাও। লোকের মুখে শোনা সব কথা। ভয় আর আশঙ্কা উৎকণ্ঠিত মনে নানান খবর তৈরি করে।

আনোয়ারার মনেও ক্রমাগত খবর তৈরি হচ্ছিল। শীতে ওর শরীরে ফাট ধরেছে— তেল জল পড়ে না এমন ফর্সা চামড়া শীতের হাওয়ায় খসখসে হয়ে যায়। আনোয়ারার চামড়া যা-একটুতেই খসখসে হয়ে যায়।

সাকিনাকে ও বলে না যে, আজই ও গিয়েছিল ডাক্তারবাবুর বাড়ি। রফিকের চিঠি এসেছে কাল — ওর বাড়ির কেউ বেঁচে নেই, রশিদ কোথায় ও জানে না, টাকার অভাবে ও আসতে পারছে না, টাকা পাঠাতে লিখেছে অন্য এক ঠিকানায়।

আনোয়ারা আরও শুনেছে, এখানেও নাকি খুনজখম হতে পারে। ডাক্তারবাবুর বাড়ি মিটিং বসেছিল শান্তি মিছিল বের করার।

আজ সকালেই তো ট্রাক ট্যাক্সি বোঝাই হিঁদু গেল 'জয়রাম সিয়ারাম' ধ্বনি দিতে দিতে।

সাকিনার কোলে জামালকে দেয় আনোয়ারা। ভাত নামায়। রেহানা, কামাল মায়ের কাছে বস্তা পেতে বসেছিল। ভাতের গন্ধে ওদের মনে এমন খুশি জাগে যে কোনও স্বর্গীয় দৃশ্য, বর্ণে আর গন্ধে ওদের সামনে।

আজ তরকারি রান্না করেনি আনোয়ারা। আলু সিম আর বাঁধাকপির পাতা দিয়েছিল ভাতে। বাকি বাঁধাকপি কাল রান্না করবে। ক'টা ডিমও জমেছে। ওগুলো বেচে আসবে দোকানে।

ভাত বেড়ে নুন আর একটু সর্ষের তেল — বোতল তুলে কালকের জন্য কতটা থাকল দেখে নিয়ে সাবধানে দেয়। মাখে। গরম ভাতের গন্ধে আর ছেলেমেয়েদের খুশিতে আনোয়ারা একটু হালকা হয়।

জয়রাম, সিয়ারাম

ঠিক কোন দিক দিয়ে যে গেরুয়া পতাকা ওড়ানো ট্রাকটা এল বোঝা গেল না। আনোয়ারা তো কাগজ পড়ে না। নইলে যারা কাগজ পড়ে তারা তো জেনেই গেছে আগামীকাল নয়ই নভেম্বর উনিশশো উননব্বই অযোধ্যায় একটা কিছু হতে চলেছে। মন্দির মসজিদ নিয়ে লড়াই যদি মাটিতে নেমে আসে তাহলে কী হবে তা নিয়ে খবরের কাগজ টিভি আর পাবলিক মুখর।

এদিকে সারা দেশ থেকে বিদেশ থেকে এমনকি খোদ কমিউনিস্ট চীন থেকেও 'রামশিলা' এসেছে। তেমনি শিলাবহনকারী এই ট্রাকটিও চলেছে অযোধ্যায়।

দূর থেকে প্রথমে বাতাসে ভেসে এল ভজনের সুর। সেই সুর আনোয়ারাকে ঘর থেকে টেনে রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে দিল কোলে বাচ্চাসমেত। সাকিনাও পা টেনে টেনে উঠোনে।

প্রথমে এল দু-খানা পুলিশের জিপ। তার হাত দশেক তফাতে খোলা ট্রাকে গেরুয়া পাগড়ি পোশাকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মীরা।

ট্রাকের চারদিকে চারটি মাইক। মাঝখানে ফুলে মালায় ঢাকা ইট -- রামশিলা। পেছনে আরও দু-খানা জিপ-ভর্তি বন্দুকধারী পুলিশ। পরিষদের কয়েকখানা প্রাইভেট কার, স্কুটার। মোটর সাইকেল।

আনোয়ারা কাগজ পড়ে না। পড়তে জানে না। কাজেই সশস্ত্র পুলিশবাহিনী দিয়ে ঘেরা

এই গতিময় উদ্দাম ভজন ও জয়রাম ধ্বনি ওকে বিভ্রান্ত করে। ও তো পুজোর মিছিল, ঠাকুর আনা ও বিসর্জন দেওয়ার অনেক মিছিল দেখেছে -- সেখানে তো মাইকের হিন্দি ফিল্মি গানের সুরে ছেলেরা কোমর দুলিয়ে নাচে। তাতে উদ্দামতা থাকে। উল্লাস থাকে। এই ধ্বনি আর সশস্ত্র পুলিশবাহিনী যেন ওর সর্বাঙ্গে এক অজানা ভয় জাগিয়ে গেল।

এই ট্রাক গেল আসানসোল -- উষাগ্রাম। সেখানকার ঘটনা অঙ্কাংশে ভ্রাঘিমাংশে আর সময়ের মাত্রায় এতই নির্দিষ্ট হয়ে যায় পরের দিনের ঘটনায়, যা কিনা ঘটে উত্তরপ্রদেশে, এক ধর্মের বিপরীতে অন্য ধর্মের উন্মত্ততায়, যে, সেই ঘটমানতার সামনে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষেরই এক জননী দিশাহারা, তার দু-চোখে সেই ঘটমানতার একটাই মাত্রা। দেখার সেই একটিমাত্র মাত্রা ওকে পিছু হটায়।

ঘোমটার নিচে ভয়ার্ত মুখখানা নিয়ে ও সাকিনাকে ধমকায় -- 'ঘরে যা, দেখার কী আছে তর?'

সাকিনা ওর ভরা শরীর ঢাকে। পা দুটি রোদে মেলে দেয়। আনোয়ারা একটা ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে তেল এনে ওর শীর্ণ হতে থাকা বাঁ পা আর ক্রমস্ফীত ডান পা-টি মালিশ করে আস্তে আস্তে।

সারা দুপুর কাপড়ের নিচে ওর বুক টিবটিবায়। রশিদ থাকলে রোজ না হোক, এক-দু-দিন অন্তর পয়সা আসত।ডোম বাগদি হলেও লোকের বাড়ি কাজ পেত। ভরসা তো খেতের কাজ। তাও ধানকাটা প্রায় শেষ-- প্রথম চোটের ধান গেরস্তর উঠোনে শুকোবে এখন।

বুড়া হোক, তবু তো ওর মরদ। ওর নিজের পুরুষ। ওর রমণী-শরীরে তো ওরই অধিকার তাতে জ্বালা জুড়োক আর নাই জুড়োক।

সাকিনাকে ফেলে বেরোতেও ওর মন ওঠে না। পা দু-খানা বাদে ও তো এখন পুরুষের লোভের জিনিস। সেই লোভে তো কোনও দায়িত্ব নেই -- তেমন কোনও মরদ আছে কি যে হাঁটতে পারে না এমন বিবি শাদি করবে?

শান্তিমিছিলের প্রস্তুতি

কথা ছিল ন-তারিখ সকালেই শান্তি মিছিল বেরবে। এরকম মিছিল ওইদিন আর কোথাও বেরবে কি না এই মিছিল যারা বানায় তারা জানে না। কয়েকশো বছরের মসজিদের গায়ে কয়েকশো বছর ধরে যে মন্দির স্থাপত্য উৎকীর্ণ, তা যদি আরও কয়েকশো বছর কিংবা তারও বেশি থাকে তা হলে সেটা তো হয়ে উঠতে পারে গবেষকদের বিষয়, তাতে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে এমন একটা মিছিল বানানোর দরকার অনিবার্য হয়ে ওঠে কেন তা যারা মিছিল বানায় তারা জানে না।

নীনা তপতীকে বলে, 'কত লোক হবে মনে হচ্ছে?'

তপতী, ডাক্তারবাবুর একমাত্র কন্যা, বিয়ে করবে না ঠিক করেছে, বাবার এইসব কাজে ওর উৎসাহ ও সক্রিয়তা, ওর মায়ের বিরক্তি আর অশান্তি দুই-ই বাড়ায়। চুলের ছাঁট

কিরণ বেদীর মতো, সেই চুলে আঙুল চালিয়ে ওর তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়।

— তোরাই তো আমাদের ছাপিয়ে যাবি মনে হচ্ছে।

— শান্তি মিছিল বানাচ্ছিস হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আর নিজেই 'তোরা' 'তোরা' করছিস?

— স্যরি। এক্স্ট্রিমলি স্যরি নীনা।

নীনার বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্সে এম. এ. সেকেন্ড ইয়ার। ও বলে :

— যা তোদের রক্তে মিশে গেছে, সংস্কারে গেঁথে গেছে তাকে কি তুই মিছিল করে নিশ্চিহ্ন করতে পারবি? আরও যে কত বছর লাগবে।

তপতী একটু অপ্রস্তুত গলায় বলে, 'সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটা কি শুধু হিন্দু-মুসলমানে? সভ্যদেশ আমেরিকায় শাদা-কালোর মধ্যে নেই?'

নীনা হেসে বলে, 'এর পরে আদিবাসী বলবি — দলিত সাহিত্য বলবি! ভাগ্যিস এসব ছিল, নইলে তোরা কী করতিস? এসব মিছিল-টিছিল অর্গানাইজ না করতে পারলে তোদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বড় কঠিন হয়ে পড়বে না?'

অন্য সময় হলে তপতী তর্ক জুড়ে দিত। আজ বন্ধুর চোখে সরু চোখে তাকায় মাত্র। একবয়সি হলেও তপতী এক বছর আগে পাশ করে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ায়। ইন্টারভিউ পাওয়া ও প্যানেলে নাম ওঠা পর্যন্ত এখানে থাকা। নইলে ইতিহাসে এম.এ. করে জিওগ্রাফি পড়াতে ওর বয়ে গেছে। কিন্তু এসব স্কুলে পড়াতে গেলে জিওগ্রাফি পড়াতে হয় ক্লাস টেনে। ইতিহাস সিক্স-এ। ফাইভে ইংরেজি যদি তো থ্রি-তে ওরিগ্যামি। এসব কাজে তপতীর উৎসাহ আছে — সার্কের প্যাকেট দিয়ে লেটার বক্স, আর থার্মোকল কেটে সেতার বানিয়ে সে নিজের অপরিহার্যতা পাকা করে নিয়েছে, তার চাকরির আট মাসের মধ্যে।

নীনা সিদ্দিকার বাবা ফুড ইন্‌স্পেক্টর। ওরা সাত বোন তিন ভাই। নীনা মেজ। বড় বোন আমিনার শাদি হয়েছে লন্ডনে। ওর বরের রেস্টুরেন্ট আছে। সায়েবদের দেশে ভারতীয় খানার ব্যবসা ভালোই চলে।

নীনা পড়াশুনায় ভালো। খেলাধূলাতেও। ওর এক বছর নষ্ট হয় বি.এ. ফাইনাল দেবার বছরে টাইফয়েড হয়ে। ও বর্ধমানেই থাকে। হস্টেলে। উইক এন্ডে বন্ধুর বাড়ি এলে তপতী ওকে আটকে দেয়।

এই মিছিলে নীনার থাকাটা জরুরি।

রতন, ডাক্তারবাবুর বাড়ি রান্না করে, ঘরে ঢোকে। বেশ চালাকচতুর ছোকরা, একটা লাল-শাদা ডোরাকাটা গেঞ্জি আর কালো ফুলপ্যান্ট পরা, হাতে বাজারের থলে।

তপতী ভুরু তুলে বলে, 'কফি খাওয়াও রতন, কোথায় ছিলে? এই বিকেলবেলা বাজারে পাঠাল বুঝি মা?'

— কেন, কফি না হলে তোমাদের মিছিলের প্ল্যান হচ্ছে না?

— এই রে! তপতী পা ছড়িয়ে কাঁধ নাচায়। মা দরজায় দাঁড়িয়ে। রতন ঠিক কাকে

সন্তুষ্ট করবে বুঝতে পারে না—বাজার নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বলে,'দিদি, বাইরে রশিদের বিবি ডাকচে আপনাকে। কফি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আনছি। মা, খুব ভালো রুইমাছ এনেচি।'

নীনা, তপতীকে উঠতে দেখে ডিভানে প্রায় শুয়ে পড়ে। তপতী যেতে যেতে বলে, 'আসছি।'

বাইরের ঘরে এসে তপতী কাউকে দ্যাখে না। ওদের বাইরের ঘরের দেয়াল জুড়ে জানলাগুলো এত বড় যে কাচের দেয়াল বলে মনে হয়। মেঝেতে কার্পেট, দু-দিকে মুখোমুখি দুটো লম্বা সোফা। সোফা ভেতরের ঘরে যাবার দরজার পাশে একটা, অন্যটা বাইরের দরজার বাঁ পাশের দেয়ালে একটা বাঁকুড়ার ঘোড়ার পাশে। তপতীদের দরজা সারাদিন তো খোলা থাকেই —রাত্রেও দশটা পর্যন্ত যে-কেউ জানান না-দিয়েই ঢুকে পড়তে পারে সোনালি রঙের পর্দা সরিয়ে।

তপতী গলা বাড়িয়ে দেখল গেটের কাছে আনোয়ারা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। ও ভারি আশ্চর্য হয়। পরে নীনাকে বলেছিল রশিদের বউ বাগানের গেট খুলে চটি হাতে নিয়ে বাগানের রাস্তা দিয়ে দরজা পর্যন্ত আসে। অনেক বলার পরে চটি সিঁড়ির নিচে রেখে ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর বিনীত নিবেদনটি পেশ করে।

—বুঝলি কী পরিমাণ আতঙ্ক ছড়িয়েছে? বাবা ওর স্বামীকে পাঠিয়েছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে , বন্ধুর কাজে—তা ও স্বামীর খবর জিগ্যেস করছে এমনভাবে যেন খুব অন্যায় করে ফেলেছে। নইলে ও তো বিয়ের পর থেকেই এখানে আসে—মাকে 'চাচি' বলে, আমাকে 'বড়বু'।

নীনা বলে, 'তা তোরা তো এইজন্যই শান্তিমিছিল বের করবি। না কি?'

তপতী বুঝতে পারে না এইজন্যেই শান্তিমিছিল না শান্তিমিছিলের জন্যেই এই সব। ও বলে,'চল, ও ঘরে যাই, মিটিং শুরু হয়ে গেছে। আর দেরি করলে বাবার কাছে বকুনি খাব।'

— কফি দিল না তো রতন? নীনা পাশে রাখা চিরুনি থেকে চুলগুলো নিয়ে আঙুলে জড়ায়।

— কফি ওঘরে পৌঁছে গেছে কিংবা যাবে — ওঠ।

তপতী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখটায় একটু পাফ বুলিয়ে নেয়। শাড়িটা টেনে-টুনে ঠিক করে। ও পরে আছে চিকনের কাজ করা শাদা হাতা-ছাড়া বড় গোল গলা ব্লাউজ— কটকি নকশার বেগুনি পাড় অফ-হোয়াইট শাড়ি। কালো লাল বুটি দেওয়া অফ-হোয়াইট খাদি চাদর আলগা করে জড়ানো। ও উঠে দাঁড়ালে নীনা চোখ ছোট করে বলে, 'হাউ সুইট! আমারই তো ইচ্ছে করছে তোর গলা জড়িয়ে চুমু খাই।'

— ফাজলামি করিস না, চল।

— এক মিনিট -- চুলটা ফেলে আসি।

— ওই বাস্কেটে ফেল না, কাগজে জড়িয়ে।

— নো ম্যাম, এটাকে পুঁতে ফেলতে হবে। চুল নখ এসব কবরস্থ করা আমাদের নিয়ম।

— তুই এখনও এসব মানিস?

— অতি অবশ্যই। এটা অতি স্বাস্থ্যকর সংস্কার— কু নয়, সুসংস্কার।

নীনা উঠে বাইরে যায়। ওর লম্বা বেণীর গোড়ায় একটা শাদা গোলাপ।

ডাঃ মুখার্জি বলেন, 'সবরকম প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লোকাল থানাকে ইনফর্ম করেছিলে প্রকাশ?'

প্রকাশ রেলের স্কুলে ভূগোল পড়াচ্ছে অল্পদিন। এই পাড়াতেই পৈতৃক বাড়ি। ও বলে, 'হ্যাঁ কাকাবাবু। কিন্তু ওখানে অনেকগুলো ইটপুজো হয়েছে— একটাকা পঁচিশ পয়সা করে কুপন কেটে চাঁদা। কী হল বলুন তো?'

'ওখান' মানে প্রকাশের কর্মস্থল।

তপন একটু রাগী ছোকরা— বলে, 'আপনি নিশ্চয় চাঁদা দিয়েছেন?'

প্রকাশ বলে, 'তা দিতেই হল, এত ভদ্রভাবে রিকোয়েস্ট করল যে ......'

— না দিয়ে পারলেন না! তা হলে ঘরে বসে দুদুভাতু খান গে, এখানে এসেছেন কেন?

ডাঃ মুখার্জি হাত তুলে থামান, 'কেন ও তো ঠিকই করেছে— এখনই ওদের সঙ্গে কোনও কনফ্রন্টেশনে যাওয়া ঠিক হবে না। ওরা তো প্রোভোকেশন দেবেই কিন্তু আমরা শান্তি চাই। তা নীনা, তোমাদের ওখানে কোনও টেনশন নেই?'

— বর্ধমানে?

— না, রূপনারায়ণপুরে?

নীনা বলে, 'আম্মা একটু ভয় পাচ্ছিলেন কিন্তু আব্বা বললেন ওখানে ভয়ের কিছু নেই। আমিও সেরকম কিছু দেখিনি। আসলে ...... ' এই অব্দি বলে ও একটু থামে।

তপন বলে, 'আসলে কী?'

— আসলে ওখানে টেনশন তৈরি করার দরকার নেই।

চুপ করে শুনছিলেন খোদাবক্স্ সাহেব, নীনার বাবা সিদ্দিক সাহেবের দোস্ত, বিস্মিত হন নীনার কথা শুনে। বিরক্ত মুখে নীনার দিকে তাকান, বলেন, 'এইজন্য মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শিখতে নেই। কী বলতে চাও তুমি? টেনশন তৈরি করার দরকার নেই বলছ কেন? বল টেনশন তৈরি করার লোক নেই ওখানে, কেননা ওখানে আমরা স্ট্রং পজিশনে আছি এখন। ওরা ভয় পায় আমাদের।'

নীনা বলল, 'চাচা, টেনশন কি শুধু একদল লোকই বানায়? এটা কি কারও একার হাতিয়ার? যার যখন দরকার হয় সেই তৈরি করে টেনশন। আপনি আমাকে মিস-আন্ডারস্ট্যান্ড করছেন — আমি বিশেষ কোনও পার্টিকে লক্ষ্য করে এ কথা বলিনি।'

— কিন্তু এখানে তো টেনশন আছে। আমি আজ সকালে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছি— শান্তি মিছিলের ব্যাপারে সবারই প্রবল উৎসাহ। নরেন বলে।

ডাঃ মুখার্জি বলেন, 'টেনশন কীরকম আছে তা নীনা, ছেলেমানুষ, বুঝবে কী করে? ও তো এখানে থাকে না। আসানসোল তো থমথম করছে সেই গোলমালের পর— আজ অবশ্য বাইরের পরিস্থিতি শান্ত। কিন্তু আমরা যদি এখনও চুপ করে থাকি আর তারপর যদি কিছু ঘটে — দু-সপ্তাহ পরে ইলেকশন, এটা মনে রেখো।'

— কিন্তু কাকু, তা হলে কোনটা মনে রাখব — হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি না হিন্দু-

মুসলমান ভোট? নীনা বলে।

তপন বলে, 'দুটোই।'

নীনা বলে, 'ভোটের জন্য সম্প্রীতি না সম্প্রীতির জন্য ভোট?'

ডা: মুখার্জি বলেন, 'তুমি দুটোকে গুলিয়ে ফেলছ কেন? ভোট হল সাময়িক ব্যাপার, সম্প্রীতির সমস্যা তো বরাবরের।'

— কিন্তু কাকু, ভোট দিয়েই তো তার একটা সমাধান, বরাবরের মতো সমাধান করতে পারা যায়। ভোটও তো বরাবরের, তাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

— রাইট ইউ আর। ডাক্তার উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েন। কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁর নির্বাচনী ভাষণের একটা মহড়া দেবেন কি না ভাবতে ভাবতে, নীনা বলে উঠল, তার শান্ত ঠাণ্ডা গলায়, 'তাহলে কেন দেশজুড়ে শান্তি মিছিল বেরোচ্ছে না? রূপনারায়ণপুরে টেনশন নেই, তাই শান্তিমিছিল নেই — এটা কেন হচ্ছে? কেন সারা দেশে একজন মানুষও নেই যিনি খালি পায়ে, খালি পায়ে আগুন আর মৃত্যুর মাঝখান দিয়ে নির্ভয়ে হেঁটে যেতে পারেন? শান্তির জন্য একটা মৃত্যুও কেন ঘটে না?'

— য়্যু হ্যাভ বিন এক্সাইটেড়। এগুলো অন্য প্রশ্ন। এনিওয়ে, যা বলছিলাম, মিছিল করতেই হবে। টাইমটা যেন ঠিক থাকে।

নীনা একটু লজ্জা পেয়ে যায় যেন। বলে, 'আয়্যাম স্যরি কাকু।' ওড়নাটা সরে গিয়েছিল, ঘোমটা তুলে দেয়।

তপতীর মনে পড়ল সন্ধেবেলা ওদের কুমারী মেয়েদেরও মাথায় কাপড় দিতে হয়।

খোদাবক্স উঠে যান নামাজ পড়তে।

ভেতরে ঠাকুরঘর থেকে শাঁখের আওয়াজ আসে।

মিটিং-এর দ্বিতীয় পর্ব

ডা: মুখার্জি তপনকে বলেন, 'ট্রাকের ব্যবস্থা কম্‌প্লিট তো?'

এখন এঘরে ওরা দু-জন ছাড়াও খোদাবক্স সাহেব আছে। তিনি বলেন, 'ট্রাক লাগবে কেন কমরেড? স্থানীয় লোকেদের মিছিল, তায় পায়ে হেঁটে, এতে এত খরচ করার দরকারে কী?'

তপন বিরক্ত গলায় বলে, ' আপনি এখনও গরুরগাড়ির যুগের কমরেডই রইলেন। স্ট্রেংথ্ শো করতে হবে ওদের, বুঝেছেন? যত লম্বা মিছিল হবে ব্যাটাদের পিলে তত চমকাবে। দাদুর গদিতে আর বসতে হবে না বাছাধনকে।'

মুখার্জি আবারও হাত তুলে থামান ওকে, 'এত মাথা গরম কর কেন তপন? ওটাই তোমার মাইনাস পয়েন্ট। এ বি টি এ-র মেম্বার তুমি, কথা বলবে মেপে, ওজন করে, বাজে কথা একদম না। এনিওয়ে কেবল্‌স-এর ইউনিয়নের লোকেরা জয়েন করছে তো?'

তপন নীরস গলায় বলে, 'জানি না। ওদের তো লেবার ইউনিয়নের দাপট বেশি, তার লিডারকে তো জানেন, ধম্মপুত্তুর একটি। আর ওয়ার্কাররা পায়ে হেঁটে মিছিল করতে এখানে

আসবে?'

— আমার সন্দেহ আছে। ওখানে ওরা যে দিবস করে সাইকেলে চেপে, তাও ঠাগুায় ঠাগুায় সেরে ফেলে।

— কেন এটাও তো ঠাগুায় ঠাগুায় – শীতের রোদে কষ্ট নেই। মুখার্জি হাসেন।

— জামতাড়া থেকে তিন ট্রাক মুসলমান আসবে। কলিয়ারি থেকে দু-ট্রাক মিক্‌স্‌ড্ ওয়ার্কার, আর দরকার হবে? তপন জানতে চায়।

— না, না, ওয়েল ডান। এতেই হবে। রিপোর্টার আসবে তো?

— হ্যাঁ, আমাদের প্রণবই আছে, তা ছাড়া চিত্তরঞ্জনের সেনও আসবে বলেছে।

— ঠিক আছে। এখন যাও, কাল খুব ভোরে একবার আসবে।

তপন বেরিয়ে যায়। খোদাবক্স বলেন, 'ক্ষমতায় থেকেই যদি পার্টির এই হাল হয় যে একটা মিছিল অর্গানাইজ করতে ট্রাকে করে লোক আনতে হয়, তাহলে বুর্জোয়া পার্টিগুলো কী দোষ করল?'

মুখার্জি বলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি করে চুল পাকিয়ে ফেললেন তবু এমন কথা বলছেন। জানেন লেনিন বলেছেন', এইখানে মুখার্জি একটু থামেন, কারণ খোদাবক্স এখনও পড়াশুনো করেন, গ্লাসনস্ত পেরেস্ত্রৈকার কথা উনিই প্রথম বলেন এখানে, তবু একটুখানি দ্বিধার পরই মুখার্জি বলেন, 'লেনিন বলেছেন বিপ্লবের সময় ছাড়া কমিউনিস্টরা সব সময়ই মাইনরিটি। এখন এই কাঠামোয় ক্ষমতায় থাকলে কাঠামো তো ভাঙা যায় না – সেইমতো করেই চলতে হয়। বিপ্লবের সময় এখনও হয়নি। তাই লোক আনতে হয়।'

খোদাবক্স একটা নিশ্বাস ফেলেন। বলেন, 'আজ উঠি কমরেড।'

দরজার বাইরে ওর দীর্ঘ ছায়া অদৃশ্য হয়ে যায়। জানলা দিয়ে নীনা চেঁচিয়ে বলে, 'চাচা, আব্বাজানকে বলবেন এখানে রইলাম। কাল দুপুরে বাড়ি যাব।'

নীনা-তপতী সংলাপ

শুতে যাবার আগে তপতী বলল, 'কাল আমার শাদা চুড়িদারটা পরবি।'

বড় বড় ফুল আঁকা একটা গোল-গলা ম্যাক্সি পরে নীনা কনুইতে ক্রিম লাগাচ্ছিল। মুখ না-তুলেই বলল, 'কেন, আমারটা তো ভালোই আছে। তোরটা পরলে আবার আমারটা প্যাকেট করতে হবে।'

— না, তোরটার কালারটা ঠিক—,বাক্যটা শেষ করে না তপতী। 'বি এইচ্ পি-র কমলা কালার তো?' হেসে ওঠে নীনা। হাসতে হাসতেই গেয়ে ওঠে, 'আমরা যে শান্তিকামী/ আমরা যে শান্তিকামী আজকে/আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়— ঠিক আছে বাবা অশান্তি করতে চাই না। ও কে।'

শান্তিমিছিল

এই শহরটা পুরনো। একসময় এখান থেকেই স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড় শুরু হত। রেল ইঞ্জিন বানানোর

কারখানা তৈরি হবার পর, এই শহরের লাগোয়া গ্রামের আদিবাসী সাঁওতালদের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ করে শিল্পশহর তৈরি হবার পর বিহারের এই প্রান্তিক শহরের চেহারাও তো অপরিকল্পিত ভাবে পালটে গেল।

শিল্পনগরীর নামে স্টেশন তো আসলে গ্রাম গ্রাম গন্ধওয়ালা এই শহরের নামেই ছিল। স্টেশন বিহারে অথচ শহর পশ্চিমবাংলায়, এমন জায়গায় লোকের আনাগোনার নানা কারণ থাকতে পারে। থাকেও।

তাই দুই রাজ্যের সীমানা ঠিক রাখতে চেকপোস্ট রাখতে হয়। কিছু সরকারি লোককে থাকতে হয় ইউনিফর্ম পরে, অস্ত্র নিয়ে। রাষ্ট্রের আইন নিয়ে। কিন্তু যত ইউনিফর্ম, যত অস্ত্র, আর যত আইন, বিপরীতে তো তত লোভ, নীতিহীনতা ও আইন ফাঁকি দেওয়াও থাকে চেকপোস্ট থাকলে।

এমন একটা শহরের আঁকাবাঁকা পুরনো রাস্তা দিয়ে এমন একটা মিছিল কি সত্যি সত্যিই বেরনো সম্ভব? কিন্তু শান্তির ধ্বনি দিয়ে তৈরি তেমন একটা মিছিল সত্যিই বেরোল, দেখে নীনা একটু অবাক হয়।

মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে তপতী খুশি খুশি স্বরে বলে, 'তুই তো চলে যাবি বলেছিলি — তাকিয়ে দেখ কতবড় মিছিল হয়েছে। ইন ফ্যাক্ট্ সব মানুষই শান্তি চায়।'

তপতীর দুধের মতো শাদা সিন্থেটিক শাড়ির আঁচলে শীতের হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউ ওঠে। ওর খুশির মতোই।

নীনা পরেছে শাদা চুড়িদার কুর্তা। শাদা ওড়না গলা বেষ্টন করে বুকের দু-পাশে ঝুলে আছে। চুলগুলো খোলা — গোটা পিঠ ঢেকে কোমর ছুঁয়ে থাকে।

নীনা মিছিল শেষে সোজা রূপনারায়ণপুরে যাবে বলে সাইকেলটা এনেছে। ওর হাসিটা ফিরিয়ে দেয়। বেলটা বাজায়, হেসেই বলে, 'একবার তলিয়ে দেখ তোরা যে কারণে মিছিল বানিয়েছিস আর মিছিলে যারা যাচ্ছে তাদেরও কি ওই একই কারণ?'

— আমি অত বুঝি না রে।

— বুঝতে চাস না বল?

— হয়তো তাই। আমার এই ভেবে মজা লাগছে যে এইসময় অযোধ্যায় কী কাণ্ডই না হচ্ছে।

মিছিল এগোয়। জোড়া জোড়া পা আর ইচ্ছুক, অনিচ্ছুক, সন্ত্রস্ত ভীত শরীর দিয়ে বানানো এই মিছিল,'শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন' ধ্বনি দিয়ে বানানো মিছিল যখন শান্তি ও সম্প্রীতি ধ্বংসের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে শান্তি ও সম্প্রীতি ধ্বংসের সম্ভাব্য ঘটনা থেকে দূরে সরিয়ে দিতেপথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছে তখন সশস্ত্র পুলিশ আর মিলিটারি পাহারায়, ত্রিশূল আর গৈরিক বস্ত্র, বন্দুক আর সরকারি উর্দি-বেষ্টিত এক ধর্মানুষ্ঠান ইতিহাসে গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে।

আনোয়ারার পেটটা উঁচু হয়ে আছে। পেট-কাপড়ে ওর হাওয়াই চটিজোড়া। চটি পায়ে দিয়ে ও বাড়ি থেকে বেরোয়। সাকিনা আসবে বলেছিল, বলেছিল, 'আমাকে কারও সাইকেলে তুলে দিস।'

আনোয়ারা বলে, 'শখ কত বিটির। পা নাই ওর — লেংচেও তো যেতে পারবি না?' সাকিনাও

বৌকে জবাব দিয়েছিল, 'কেন আমার পা নাই বলে কি হাতও নাই?'

— হাতে হাঁটবি নাকি তুই? সার্কাস দেখাবি? চুলে গার্টার লাগাতে লাগাতে আনোয়ারা বলে।

— কেন? এবারে আমি ভোট দিবনি বুঝি? হাতে ফুল তুলি না ক্যাঁথাতে? রাঁধি না? সাকিনা বলে।

এখন খালি পায়ে একপেটে খিদে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর সাকিনার কথা মনে হয়। রশিদের কথা মনে হয়। রাগ ধরে ওর। সেই হাওড়ায় ওর বাপের ঘর। বাবা চটকলে কাজ করত। চটকল তো কদ্দিন বন্ধ— কী করে এখন ওর বাপ? কী খায় ওর ভাইবোন আর আম্মা? কতদিন যায় না বাপের ঘর। কতদিন দেখেনি ওর প্রিয় পরিজনের মুখ। রশিদের মুখটাই বা কেমন তাও বোধহয় ও ভুলে যেতে বসেছে। রেহানা কামাল দীনা আর জামালের মুখগুলোও আবছা। শুধু সাকিনার ব্যাকুল মুখখানা আর জ্যান্ত হাতের নড়াচড়া মনে পড়ে। আনোয়ারার অবাক লাগে ভাবতে, পা নেই এমন মানুষের নাম ভোটের কাগজে ওঠে কেন? তার তো পা আছে, হাঁটা আছে, তাই ভোট আছে। সেই পা আর হাঁটা নিয়ে সে মিছিলে চলেছে। সাকিনা কি তা পারে? কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছে সাকিনার মতো অমন বেঢপ অক্ষম পা থাকলে তাকে এই মিছিলে এমন নিরুপায় চলতে হত না। পা দু-খানা কমজোরি বলে সাকিনাকে ওর শরীর বইতে হয় না। তবু 'বিটি' বলে তার হাতে নাকি জোর আছে — কাজ করার জোর। ভোট দেবার জোর। আর পা দু-খানা ঠিকঠাক আছে বলেই কি আনোয়ারাকে তার উৎকণ্ঠা উদ্বেগ দুশ্চিন্তা আর খিদে-তেষ্টা সমেত শরীরটাকে বইতে হচ্ছে? এতগুলো শরীর? পেটটা ওর ফুলে আছে— যেন খিদেতেই — এতগুলো শরীরের খিদেতেই।

মিছিলের চলায় চলায় আনোয়ারার খিদে বাড়ে। ওর মনে হয় রাস্তা যেন ফুরোয় না।

মিছিলের চলায় চলায় তপতীর উত্তেজনা বাড়ে। ও একবার পেছনে তাকিয়ে দ্যাখে কত লোক হল।

মিছিলের চলায় চলায় নীনার ক্লান্ত লাগে। ও ভাবে মিছিল কি এগোয়? ওর মনে হয়, ওর পা দু-খানা যেন ওর ভার বইতে অক্ষম। ও যেন এক সর্বগ্রাসী শূন্যতা থেকে দূরে যাবার জন্য চলে, কিন্তু সেই সীমারেখা— অন্ধকার আর আলোর সীমারেখা, ঘটমানতা আর ঘটনাহীনতার দিগন্তরেখা যেন কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না।

নিজেদের প্রয়োজনে যারা মিছিল বানায় পরিকল্পনা দিয়ে আর নিজেদের নিরুপায়ে যারা মিছিল বানায় শরীর দিয়ে, মিছিলের চলায় চলায় তাদের মধ্যে সমস্ত সংযোগের সেতু ভেঙে পড়ে।

তাই এ মিছিল কোনও ঘটনা হয়ে ওঠে না, শেষ পর্যন্ত কোনও সামগ্রিক সমবেততেও পৌঁছয় না। বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে এ মিছিল যেন বিচ্ছিন্নতার দিকেই চলে — অন্য এক বিচ্ছিন্নতায়।

বারোমাস ১৯৯০

দারার ছেলে

ছেলেটাকে নিয়ে মুশকিলে পড়ে গেল দারা। তার নিজের বয়স তেইশ চব্বিশ। ছেলেটার তিন। ও বলে, 'তিনসাল'। ছেলের মায়ের বয়স বিশ। চারমাস পরে আবার বাচ্চা হবে। কিন্তু বাচ্চা পয়দা হবার আগেই লছমি ভেগে গেল বনোয়ারির সঙ্গে। বনোয়ারি যাদব, ওদের চেয়ে উঁচু জাত। বনোয়ারির বাপের জমিতে চাষের কাজে লেগেছিল দারা। লছমি ওদের গরুমোষ দেখভাল করত। গোয়াল সাফ করত। সাঁজাল দিত। বনোয়ারি শহরে থাকত। পূজা পরব ছাড়া ঘরে আসত না। তার সাথে লছমির ভাব-ভালোবাসা কবে হল, দারা এমনই বেওকুফ আদমি যে টেরই পায়নি। টের পেল ভোরবেলা।

তখন ধানকাটার সময়। ভোরবেলা একটু একটু করে ফোটে। লছমি, যেমন ঘুম ভেঙে গেলেও চট করে চোখ খুলতে চায় না, ধানকাটার ভোরও তেমনি লাজুক। অনেক ঠেলা, অনেক সোহাগ, অনেক আদর খাওয়ার পরে লছমি যেমন একটু একটু করে তার চোখের পাতা খুলত, এমনি নাজুক।

দারার মোষের ঘুম। বিশেষ করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে যে দুশো পঁচিশ দিন সে তার যৌবনের শক্তি দিয়ে মাটির সঙ্গে লড়ে ফসল ফলায়, ফসল তোলে, সেইক'টা দিন সে পেট ভরে খায় আর ঘুমোয়।

লছমির বানানো রুটি, ডাল আর আচার খেয়ে ঘুমিয়ে তার রাত পলকে পেরোয়। ভোরবেলা জাড় লাগে বেশি, ছেলে মাঝখানে, সে ঘুমন্ত ছেলের ওপর দিয়ে লছমির গায়ে হাত রাখতে গেল। প্রথমটায় হাতটা পড়ে গেল বিছানার শূন্য অংশে। শেষ রাতে লছমি তো আরও গুটিয়ে আসে এমন নির্ভর। লছমির তো দারা ছাড়া অন্য নির্ভর নেই। দারারও তাই। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে দারা হাত বাড়িয়েছিল চোখ বন্ধ করেই। শূন্য অনুভবে সে কাত হয়। তাতে হাতটা যেন একটু লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু লম্বা হাতেও লছমীর নাগাল না পেয়ে ও চোখ খোলে।

বিছানায় লছমি নেই!

সারা ঘর, উঠোন, গাছগাছালি, জমিন, খেত, কুয়োর ধার কোথাও লছমিকে না-পেয়ে ছেলে কোলে দারা দুপুর রোদে ফেরে। রোদ মিঠা, শরীর তাতে না কিন্তু ওর শরীর জ্বলে যায়। ঘরে এসে দেখে লছমি তিনখানা ফাটা আর একখানা আস্ত শাড়ি, কাঁচুলি, দুটো ছিটের জামা, দুটো রঙিন শায়া রেখে গেছে। কাঠের বাক্সের ভেতরে চিরুনি, ফিতে, কাচের আর প্লাস্টিকের চুড়ি, কয়েকটা ক্লিপ, একখানা পারা ওঠা আয়না। খালি নেলপালিশের দুটো

শিশি। একটা অর্ধেক খালি হওয়া গন্ধতেল আর শূন্য সেন্টের শিশি দেখে দারা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। এসব তো ও কিনে দেয়নি।

ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ঘরময় ঘোরে। দারা ঢাকা খুলে দেখে চারখানা চাপাটি আর খানিকটা ডাল আছে। ছেলে নিয়ে ও কুয়োপাড়ে চান করে আসে। এসময় সবার জল নেওয়া হয়ে যায়।

সেই শেষ লছমির হাতের রান্না খাওয়া।

লছমি যাওয়ার পর ঠিক সাতদিন দারা গাঁয়ে ছিল। ততদিনে ওর জানা হয়ে যায় লছমি-বনোয়ারির গল্প। ছেলেকে নাওয়াতে খাওয়াতে ঘুম পাড়াতে সে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে বউয়ের ওপর যথেষ্ট রাগও করতে পারে না। কেন তার বউ চলে গেল বা অন্য মরদকে পেয়ার করল— এসব সে তলিয়ে ভাবার অবকাশই পেল না। বা ভাবল না কিংবা ভেবে থাকলেও মনে মনেই ভাবল।

সাতদিন পরে সে তার ঝোপড়ি , কয়েকটা হাঁড়ি পাতিল, ঝাড়ু , কয়েক বর্গফুট উঠোন আর মহাজনের ধারদেনা পেছনে ফেলে ট্রেনে ওঠে একটা পোঁটলা আর ছেলে সমেত। রাত এগারোটায় রূপনারায়ণপুর।

রূপনারায়ণপুরে দারা পূর্বকল্পিত কোনও উদ্দেশ্যে নামেনি। তার কাছে টিকিট কেনার মতো যথেষ্ট পয়সা ছিল না। যা দু-চার টাকা ছিল তাও সে রেলকোম্পানিকে দিয়ে বাজে খরচ করতে পারে না। ছেলেটাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে একটা কাজ না পাওয়া পর্যন্ত একথাটা যেখানে বাস্তব, সেখানে টিকিট কাটাটা বিলাসিতা হয়ে দাঁড়ায়। তাতে একটা সমস্যা বাঁচে– ওকে ঠিক করতে হয় না ও কোথায় যাবে।

বাঙ্কে উঠে ছেলেকে বুকের কাছে শুইয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে। সেই ঘুম ভাঙে চিত্তরঞ্জন স্টেশনে। একবার ভাবল নেবে যাবে কিন্তু অত রাতেও অত আলো আর লোকজন দেখে ও বোঝে 'বহুত বড়হা টিশন বা'। এখানে ও বিনা টিকিটে পেরতে পারবে না। ট্রেন ছেড়ে দিলে ও দরজার কাছে দাঁড়ায়। গাড়ি পরের স্টেশনে থামতেই ছোট্ট স্টেশনটা ওর ভারি পছন্দ হয়ে যায়। ছেলেকে কাঁধে নিয়ে ও নেমে পড়ে।

স্টেশনের যেদিকে আলো, টিকিট ঘর, ওয়েটিং রুম — সেই দিকের প্ল্যাটফর্মে এক মিনিট দাঁড়িয়ে গাড়িটা কলকাতার দিকে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে ও একবার ভাবল কলকাতা চলে গেলেই হত। ওদের মুলুকের কত লোক তো কলকাতায় কাম করে, ট্যাক্সি চালায়, টিশনে মোট বয়, কলকারখানায় কাজ করে। যখন দল বেঁধে ফেরে তখন কত রুপিয়া আনে। সামান ভি আনে।

ছেলেটা ঘুমিয়ে একটুকুনি হয়ে রয়েছে, তবু যেন ভারি। বাঁ কাঁধে ঘুমন্ত ছেলেটাকে বেশ করে চাদর চাপা দিয়ে ফেলে রাখে। বাঁ হাতে পোঁটলা, ওপর দিকে একটা ফাঁস মতো করে নিয়েছে, সেটার ভেতর দিয়েই গলিয়ে বাহুর গোড়ায় ঝুলিয়ে নিয়েছে। সেই হাতেই ছেলের ভার। ডান হাত ছেলের পিঠ ঘুরে মাথায় আস্তে চাপড়ায়।

প্ল্যাটফর্ম খুব লম্বা। শেডের নিচে সিমেন্টের বেঞ্চি। শেডের দু-ধারে বাইরে, ঘাস জমির ওপরে দূরে দূরে আরও দুটো করে কাঠের বেঞ্চি। লাইনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিকে একটু দূরে ওভারব্রিজ আবছা দেখায়।

স্টেশন একটু নিচুতে। দু-ধারে উঁচু জমি যেন দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দারা এক ধাপ উঠে টিকিট ঘরের সামনে বসার জায়গায় এল। এখান দিয়েই বেরবার পথ— সিঁড়ি উঠে গেছে। বাঁ দিকে তারের জাল দিয়ে ঘেরা জমিতে পরপর রেলের ইট রঙের কোয়ার্টার্স। ডান দিকে ঘুমন্ত চায়ের দোকান।

স্টেশনে বসার জায়গা ঘরের মতোই। দেয়াল। ছাদ। সিমেন্টের চওড়া বেঞ্চি। দু-জন মানুষ চাদর কম্বল চাপা দিয়ে আলোর নিচে নিঃসাড়, ঘুমোয়।

দারা ছেলেকে বেঞ্চিতে শোওয়ায়। পুঁটলি খুলে লছমির ফেলে যাওয়া শাড়ি আর কাঁথা দিয়ে বিছানা করে দেয়। আলো যেখানে পৌঁছয়নি, প্ল্যাটফর্মের সেদিকটায় লাইনের ওপরে পেচ্ছাব করে আসে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও জল পেল না। কান থেকে একটা বিড়ি নামিয়ে ধরায়। ছেলেকে দেখা যায় এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে বিড়িটা শেষ করে। পুঁটলি থেকে বোতল বের করে দু-ঢোক জল খেয়ে নেয়। তারপর ছেলেকে বুকে জড়িয়ে রূপনারায়ণপুরে প্রথম রাতটি কাটায়।

জায়গাটা দারার ভালো লেগে যায়। এখানে তার গাঁয়ের মতো খেতি নেই, কুয়ার টলটলে পানি নেই, রঙিন শাড়ি কি ঘাগরা চোলি পরা চুড়ি মল বাজানো উল্কি পরা বহু বিটি নেই, এসবই ঠিক কিন্তু এখানে কাম কাজ ঢুঁড়লেই পাওয়া যায়। রূপনারায়ণপুরে কেউ ভূখা মরে না।

দিনকতক সে দিনমজুরি করে। আঠারো টাকা হাজরিতে। নতুন লোক বলে সে পায় চোদ্দ টাকা করে কেননা কাম মিলিয়ে দেয়া লোকটাকে বাকি টাকাটা দিতে হয়।

হপ্তার টাকা পেয়ে হিসেব করে, ছেলেকে একটা জামা প্যান্ট কিনে দিতে পারবে কি না। কিন্তু চুরাশি টাকা থেকে পঁচিশ-তিরিশ টাকা মুন্নার একপ্রস্থ জামাপ্যান্টের জন্য আলাদা করা গেল না দেখে সে ভারি মুষড়ে পড়ে।

স্টেশন থেকে উঠে সে গুরুদ্বারার কাছে একটা ঝোপড়ি ঘর ভাড়া নেয়।

ঘরটা বীরবল আর যমুনার। বীরবলের দেশ মুঙ্গের, বহুবছর মুলুক যায় না। তার বউ যমুনা হল গে বাউরি বিটিছিল্যা। এমনতর বিয়ে বা একত্র বসবাস রূপনারায়ণপুরে স্বাভাবিক ঘটনা। যে-জমির ওপর বীরবল-যমুনার বেড়া ঘেরা তুলসী গাছ, লাউয়ের মাচা আর ঝোপড়ি ঘরের সংসার সে জমির মালিক বাঙালিও বটে, বামুনও বটে। তার বিষয় সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকারী এক সাঁওতাল রমণী ও তার সন্তান সন্ততি। শিল্পাঞ্চলের নষ্ট হয়ে যাওয়া আদিবাসী নারী নয়। একেবারে মাটির গন্ধমাখা এই রমণীই তার সংসারের কর্ত্রী।

এই ঘটনাটাই অস্বাভাবিক। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, দেশে থাকে ঘোমটা টানা, কাঁকন

পরা ছেলেমেয়ের মা, বউ, এখানে থাকে রাখনি, মেয়েমানুষ। মন্ত্রপড়া, অগ্নিসাক্ষী করা কি আইন মোতাবেক বউ নয় বলেই তাকে চিত হতে বললে চিত হয়, উপুড় হতে বললে উপুড়।

যমুনা, বয়স কম ছিল যখন পাঁচ বাড়ি বাসন মেজে, জল তুলে, কাপড় কেচে, ঘরবাড়ি ঝাড়ামোছা করে রোজগার করত। এমন নয় যে তার সংসারে খাবার পেট অনেকগুলো। এমনও নয় যে তার স্বামী উপার্জন করে না। বীরবল বরং উলটো। সে কাজ কাম ছাড়া থাকতেই পারে না। খুব ভোরে উঠে সে মাথায় জল ছিটিয়ে একটা আধময়লা কাপড় ছেড়ে আর একখানা আধময়লা খাটো ধুতি প্রায় ল্যাঙটের মতো এঁটে পরে। তারপর একটা ঝুড়ি আর আঁকশি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এর বাগান, তার বাগানের পাঁচিলের লাগোয়া গাছ থেকে ফুল আর বেলপাতা বোঝাই করে ঝুড়িতে। মাসকাবারি বন্দোবস্তে দোকান, বাড়িতে পৌঁছে দেয় সেই ফুল আর বেলপাতা। মূলধন বলতে ওর খানিকটা সময় আর শ্রম। বিশ/পঁচিশ বছর আগে রূপনারায়ণপুরে এই ফুল জোগানোর কাজ ও-ই শুরু করে। বিশ/পঁচিশ বছর ধরে রূপনারায়ণপুরে এই ফুল জোগানোর কাজ ওই চালিয়ে যাচ্ছে। এতদিনেও রূপনারায়ণপুরে একটা ফুলের দোকান হল না। তৈরি মালা কি রজনীগন্ধার গুচ্ছ কিনতে হলে নার্সারিতে আগে থাকতে অর্ডার দিতে হবে নয় আসানসোল যেতে হবে। আজকাল অবশ্য প্রায় প্রত্যেকটা নতুন বাড়িতে কিছু ফুলগাছ আছে।

বীরবল-যমুনার কোনও ছেলেপিলে হয়নি। বয়স হয়েছে তো যমুনা করেটা কী? মেয়েমানুষ মরদ সমানে সমানে খাটবে, বাচ্চাটাচ্চা পালবে, খাবে ঘুমোবে এটাই ও জানে। বীরবল দুপুরে ফেরে বাজার নিয়ে। খেতে খেতে গল্প করে। গল্প করতে করতে ঘুমোয়। বিকেল বেলা সে জল তোলে কয়েকটি বাড়িতে। ফিরতে ফিরতে যমুনার চুলবাঁধা, খেয়ে ঘুমিয়ে তেল নেওয়া, রাঁধা-বাড়া শেষ। বাবুঘরের বউ হলে ঘর গুছিয়ে, খেয়ে, ঘুমিয়ে, বেড়িয়ে, সিনেমা টিভি দেখে, পত্রিকা পড়ে, ঘুরিয়ে শাড়ি পরে, সেজেগুজে দিন কাটানো যেত স্বামীর পয়সায়। কিন্তু ওদের নিয়ম বা বেনিয়ম আলাদা। সে নিয়ম বা বেনিয়মে যমুনা স্বাবলম্বন অর্জন না-করে ঘরে থাকে কী করে? সুতরাং তার শনিবার-শনিবার ভর হয়। চুল এলো করে, চোখ বন্ধ করে সে ওষুধ দেয়, মাদুলি তাবিজ দেয় আশপাশের ঝোপড়ি আর খোলার ঘরের মানুষজনকে। তা মানুষজনের ভিড় তেমন না হলেও কিছু হয়। তার মাদুলি তাবিজের খরচ কম, হয়তো কতকটা সে কারণেই।

মুন্নার বাপ ছোট জাত। ছেলে নিয়ে মুন্নার বাবা ঝোপড়ির উলটোপিঠে খড় ছাওয়া আর এক ঝোপড়িতে থাকে। রাস্তার ধারে ধাবা জাতীয় সস্তা হোটেলে খায় তিন বছরের মুন্নাকে নিয়ে। দারার কাজের জায়গার আশেপাশেই ছেলেটা খেলে বেড়ায়। একা একা। মাঝে মাঝে একছুটে এসে বাবাকে দেখে যায়। ছেলেটা কথা বলে কম। দৌড়য় বেশি। দৌড়তে পারেও খুব। সারা রাস্তা জুড়ে, দারার চারপাশে একটা খরগোশের মতো লাফিয়ে বেড়ায়। দারার এত ভয় করে ছেলেটা যখন বাবার দিকে তাকিয়ে তিরতির করে ঝর্ণার

মতো ওর দিকে ধেয়ে আসে রাস্তার ওপার থেকে। এত বাস লরি যায় এ রাস্তায়। ছেলেকে বুকের ওপর বসিয়ে বলে, 'অ্যায়সা মৎ ভাগো বেটা রাস্তামে গাড়ি উড়ি হ্যায়। রাস্তামে মৎ যাও।' বাবার বুকের উপর বসে মুন্না বাবার মোটা নাক ধরে টানে। নেমে পড়ে। বাবার হাঁটু জড়িয়ে দোল খায়। দারা আস্তে ছেলেকে দুই পায়ের পাতায় উপুড় করে শুইয়ে শূন্যে দু-পা তুলে দেয়। বাবার পায়ের পাতায় বুকের ভর দিয়ে মুন্না প্রথমে ভয় পেয়ে জড়ো হয়ে যায়। খানিক পরে ভয় ভেঙে দোলে হাত পা শূন্যে খেলিয়ে খিলখিলিয়ে হাসে। বাবা নামাতে চাইলেও নামতে চায় না। ছেলেকে নামিয়ে দারা বলে, 'চল মুন্না বহোত দের ভইল্‌বা।'

দারা কিছুদিন লরি ট্রাক টেম্পোর বস্তা ওঠা-নামা করল। ট্রাকের খালাসি রাজা বলল, 'গ্যারেজ মে যাও, কাম মিলেগা জরুর। ইয়ে কাম অচ্ছা নহি হ্যায়।'

তা দারা মাথায় নতুন লাল গামছা বেঁধে, ছেলেকে কাঁধে চাপিয়ে রাজার লরি থেকে নামে একদিন।

রাস্তার ধারে এখানটায় অনেকগুলো মোটর মেরামতির দোকান। অথচ পেট্রোল পাম্পটা এদিকে দেন্দুরায়। ওদিকে চিত্তরঞ্জন।

দারার মাথায় কেট্রির মতো লাল গামছা বাঁধা। বাঁ কাঁধে ঘন নীল স্যান্ডো গেঞ্জি পরা মুন্না, বাপের মাথা জাপটে ধরে। দারার উর্ধ্বাঙ্গে একটি নেভি ব্লু টি শার্ট, হাতার কাছে ছেঁড়া থাকায় ওর বাহুর পেশি দেখা যায়। গলায় কালো কারে বাঁধা একটি মাদুলি, নতুন, বউ ফিরে আসবে বলে যমুনা দু-টাকায় ভরের ঘোরে দেয়। কালো ঢলঢলে ট্রাউজার্স। পায়ে ময়লা নীল স্ট্র্যাপের হাওয়াই।

ওকে দেখে গ্যারেজের ছেলেরা সমবেত তাকায়, যেহেতু ভর দুপুর সুনসান। একটা চাকা খোলা এল এম এল ভেস্পা কাত হয়ে শুয়ে। একটা চুপচাপ রাজদূতের ওপরে তিন চারজন এ-ওর গায়ে ঢলে গল্প করছে। বাকিরা কেউ বেঞ্চিতে, কেউ বা দোকানঘরগুলোর সামনে বারান্দায়।

ছেলে কাঁধে দারা দাঁড়ায়, মূর্তির মতো স্থির, বড় বড় চুল ওর প্রায় নির্বোধের মতো সরল মুখখানা ছেয়ে।

'তুম কৌন হ্যায় দোস্ত?' একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

'আরে এ উল্লু বোল কুছ?' পেছন থেকে রাজা ঠেলা দেয় ওকে।

'তেরা দোস্ত রাজাভাই? আও ইধার বৈঠো।'

সমবেত হাসি ও আহ্বানে দারা ছেলেকে নামিয়ে অল্প হেসে এগোয়।

বেশ কয়েকমাস কাজে লেগেছে দারা তবু ছেলেটা উদোম, গায়ে জামা নেই। ছেঁড়া প্যান্টটা নেমে নেমে যায় বলে এক হাতে ধরে থাকে, নাকে পোঁটা, রাস্তা জুড়ে দৌড়ে বেড়ায়।

টায়ার খুলতে কি লাগাতে, লরির গায়ে স্প্রে করতে কি জল দিয়ে ধুতে ধুতে পেছন

ফিরে থাকলেও দারা ঠিক টের পায় মুন্না আসছে। দারা যদি দাঁড়িয়ে থাকে মুন্না পেছন থেকে হাঁটু জড়িয়ে ধরবে। দারার হাঁটুর পেছনে সুড়সুড়ি লাগে। ও কালিমাখা হাতে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেয়। বলে, 'আভি নহি মুন্না, তু যা, উধার বৈঠ্।' মুন্না বাপের কথা শোনে। পেট ভরা থাকলে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। একটু পরে খোলা আকাশের নিচে হাত-পা এলিয়ে মুন্না ঘুমোয়। দারা গামছাটা পাকিয়ে ওর মাথার নিচে দিয়ে দেয়। রোদ লাগলে ছায়ায় সরিয়ে দেয় ছেলের ঘুমন্ত শরীর।

খিদে থাকলে মুন্না ঘুমোয় না, বাপের কথায় মুখে আঙুল পুরে অবোধ চোখে তাকিয়ে থাকে। বাপ-ছেলের মধ্যে একটা নীরব আদান-প্রদান হয়। দারা বলে, 'শো যা বেটা।' মুন্না ঘাড় নাড়ে। খালি পেটে ডিগবাজি খায়। দারা বোঝে ছেলেটা এভাবে খিদে আর ঘুম ভুলে থাকতে চাইছে। ভুলে থাকতে চায়।

দুপুরে এক থালা ভাত, ডাল আর সবজি নেয় দারা। কলে জল থাকলে ছেলে নিয়ে চান করে, নইলে দোকান ঘরগুলোর পেছনে দুটো গ্যারেজের এজমালি ইঁদারায় শ্যাওলা পড়া জল ছেলের মাথায় ঢালে। গায়ে ঢালে। নিজের মাথায় ঢালে। গায়ে ঢালে।

খেয়েদেয়ে ছেলে নিয়ে গ্যারেজের বারান্দায় একটু শোয় দারা। ছেলে ঘুমোলে ও উঠে পড়ে। কাজ থাকলে করে, নইলে বিড়ি খায় আর গল্প শোনে।

মুন্না কারও কাছে যায় না— খাবার দিলে, চকোলেট, বিস্কুট, লজেন্স দিলেও আগে বাপের কোলে মুখ লুকোবে। দারা, বলে, 'বচোয়াকে লিয়ে বহোত মুসিবত হোতা হ্যায়।' আবার 'বড়ি মমতা ভি লাগে' কেননা ছোট একটা জন্তুর মতোই অবোধ ছেলেটা এঁটুলির মতো সেঁটে থাকে ওর পায়ে পায়ে।

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল। আষাঢ় মাস শেষ। এখন শাওন। দারা হোটেলে খায়নি আজ। পাউরুটি চিবিয়েছে বাপ-ব্যাটায় চিনি দিয়ে। পয়সা খতম। বৃষ্টিতে এ হপ্তায় কাজ কম হয়েছে, তাছাড়া কাজের লোকও আসছে বিস্তর। বরাকর কুলটির মুসলমানরা মিস্ত্রিরা গাড়ি মেরামতের বিশেষ গাড়ির আওয়াজ শুনে বলে দেবে কী বিগড়েছে। দশ বারো বছরের গোটা তিনেক বাচ্চা আছে, তাদের পর্যন্ত বলে দিতে হয় না কত নম্বর টুলস আনবে।

দারা তো এখনও গাড়ির পার্টসই চেনে না সবগুলো।

বিকেলে ও বসেছিল বড় বাড়িটার সামনে। এ বাড়িতে বিস্তর লোক। বিস্তর টাকা। চার থেকে বারো বছরের ছেলেপুলেই দশ বারোজন। তাদের বাবা কাকা জেঠারা কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে অর্ডার সাপ্লাই-এর, কেউ দোকান চালায়। তাদের ঠাকুর্দা সকাল বিকেল ভ্রমণ, ছেলেদের পরামর্শ ও গালাগাল দিয়ে দিন কাটায়। বাড়িতে ভেতরে মা কাকিমারা জেঠিমারা ঠাকুমা সাবেকি চালে ছড়াঝাঁট দিয়ে দিন শুরু করে সন্ধ্যে শাঁখ আর রাতে ঠাকুর নমস্কার করে জীবন যাপন করে।

সেই বাচ্চাদের মধ্যে তিনজন পালা করে একটা লাল সাইকেল চালায়। দুটি বালিকা ও

একটি বালক। রাস্তায় ওঠে না ওরা, ঘুরে ঘুরে বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় গোল হয়ে ঘোরে।

বাপকে এত গোমড়ামুখে কোনওদিন বসে থাকতে দেখেনি মুন্না। বারকতক সে বাবার পিঠে উঠে গলা জড়িয়ে কাঁধে মুখ রাখে। দারা দু-হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে থাকে। ব্যস্ত একটা রাস্তার ধারে দারার মতো একটা জোয়ান ছেলে ওরকমভাবে প্রকাশ্যেই বসে থাকতে পারে, কেউ লক্ষ করে না তাকে। পাছে মুন্না তার বাবার চোখের জল দেখে ফেলে এই ভয়ে সে মুখ তোলে না। বারকতক ঠেলাঠেলি করল মুন্না 'বাবুজি, বাবুজি' করে। বাবা সাড়া দিল না দেখে সে বাবার চুল টেনে, চুমো খেয়ে দেখল বাবা মুখ তোলে কি না। তাতেও কাজ হল না দেখে শেষে বাবার পিঠে গোটা কতক কিল মেরে লাল সাইকেলের পেছনে ছুটতে শুরু করে। কারও সাথে কথা বলে না মুন্না, কারও দিকে তাকায় না মুন্না, শুধু চলন্ত লাল রংটার দিকে তাকিয়ে সে এক বিস্ময়ের সঙ্গে ছোটে।

বাকি বাচ্চাগুলো একটা লাল রঙের ফ্লাইং ডিস্ক নিয়ে খেলে। একবার সেটা মুন্নার ওপর এসে পড়ে। ও সেটা ধরতে যায়। একটা বছর সাতেকের ছেলে ওকে ধাক্কা দেয়। মুন্না পড়ে যায় মাটিতে। বাচ্চাগুলো একটু দূরে সরে যায়। ফ্লাইং ডিস্কটা কেউ একজন দোলায়। মুন্না উঠে ওদের দিকেই যায় আবার। হাত বাড়ায়। ডিস্কটা আরও একটু উঁচু করে ধরে বাচ্চাটা। মুন্না ওর ছোট শরীরটাকে ওপরে ঠেলে দেয় কিন্তু লাফ দিয়েও ছুঁতে পারে না ডিস্কটা। আবার পেছন থেকে একজন ধাক্কা দেয় ওকে। এবার উপুড় হয়ে পড়ে যায় মুন্না। বাচ্চাগুলো গোল হয়ে ঘিরে ধরে ওকে। চারবছর একটা লাথি মারে। মুন্না শব্দ করে কেঁদে উঠতেই ওরা দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়। লাল সাইকেল বারোবছর ওর সামনে থামে। 'অ্যাই, ভাগ্ এখান থেকে।'

'হে এ এ এ মুন্না ইধার আ।' ছেলের কান্নার শব্দে দারা উঠে দাঁড়ায়। একবার ভাবল লাল সাইকেলকে তুলে আছাড় মারে। তার মুন্নাকে, ভুখা মুন্নাকে শয়তানের বাচ্চাগুলো মারছে কেন ও বুঝতে পারে না। কিন্তু ও তো জ্ঞান হওয়া ইস্তক দেখে আসছে শয়তানের বাচ্চাদের গায়ে ভালো ভালো জামাকাপড় থাকে। ওরা উঁচা উঁচা মকানে থাকে। ওরা হল ঠাকুর, আর ঠাকুরদের গায়ে গরিব আদমি হাত দিতে পারে না। ও মুন্নাকে তুলে নিল। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে বলল, 'শালা লোগ!'

বাপের কোলে উঠে মুন্না কান্না ভুলে যায়। এক হাতে বাবার গাল ধরে মুখটা ওর দিকে ফেরায়। তারপর একটু লাজুক স্বরে বলে, 'বাবুজি ভূখ লাগা।'

এই প্রথম, তার সাড়ে তিন বছরের জীবনে এই প্রথম মুন্না তার বাবাকে খিদের কথা বলে। দারা দোকানের সামনে বারকতক ঘোরাফেরা করল। 'পরদেশি' বলে ও ঠিক ধার চাইতে পারে না, তাই ভাবল পয়সা পরে দেবে বলে ছেলেকে চপ, মুড়ি কিনে দেয় যদি, কিন্তু বলতে পারল না। কাল বিকেলে ও মালিকের কাছে গিয়েছিল পয়সা চাইতে। মালিক বলেছে দু-রোজ পরে দেবে।

ছেলে কাঁদে। গুণগুণ করে। বাপও কাঁদে। নিঃশব্দে। পাশের গ্যারেজে সুনীল চা খাচ্ছিল। ওখান থেকেই চেঁচায়, 'অ্যাই উল্লু। মেয়েছেলের মতো কাঁদিস কেন? রোতা কিঁউ রে বুড়বক?'

সব শুনে তেল কালি মাখা প্যান্টের হিপ পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে বলে, 'নে, ওই শালার গ্যারেজ ছেড়ে দে, আমাদের গ্যারেজে জয়েন কর, পয়সাকড়ি ঠিকঠাক পাবি।'

রাকেশ, সুনীলদের গ্যারেজেই কাজ করে। বয়স পনেরো। বাড়ি জামতাড়া। সে বলে, 'দারা ভাই , চলো মেরা সাথ।' ওর হাতে একটা আঁকশি।

দারা একটু ফাঁক পেয়ে ছেলেকে সুনীলের সাইকেলে চাপিয়ে আস্তে আস্তে চালাচ্ছিল ফাঁকা জমিটায়। মুন্না হাসিতে ফেটে পড়ছিল যত, তত জোরে দু-হাতে হ্যান্ডেল চেপে ধরে ঝুঁকে পড়া শরীরের ভার সামলাচ্ছিল। রাকেশের কথায় সাইকেল থামিয়ে, ডান পা মাটির ওপর ফেলে দারা। বাঁ পা প্যাডেলেই থাকে, সাইকেল ডানদিকে ঈষৎ হেলে থাকে।

'লকড়ি লানা হোগা।' রাকেশ ইশারা করে।

এই গ্যারেজের ছেলেরা উনুন ধরিয়ে মাঝে মাঝে রান্না করে। দারাও খায় সেদিন ছেলে সমেত। দোকানে রুটি আলুর ঝোল খেয়ে ঝোপড়িতে ফিরে বাপ-ছেলেতে শুয়ে পড়ে। কোনও কোনও দি ন দারা ছেলেকে কাঁধে বসিয়ে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে তার আস্তানায় ফেরে। নইলে বিনি পয়সাতেই ট্রাক, টেম্পো বাস কি মিনিবাসে চলে যায়।

রাকেশের কথায় দারা সুনীলের সাইকেল রেখে আসে ওদের ঘরের বারান্দায়। মুন্নাকে কাঁধে নিয়ে সে রাকেশের পিছু পিছু চলে। রাকেশ হাঁটে সামনে কিন্তু চোখ ডাইনে বাঁয়ে ঘোরে। একটু এগিয়ে সে রাস্তার ধারের কৃষ্ণচূড়ার সারির ডানদিকের প্রথম গাছটির নিচে দাঁড়ায়। আরও একটি গাছ ছিল তো সে জমিতে এখন দোতলা বাড়ি। দারাকে রাস্তার ধারে বসতে বলে রাকেশ। দারা গা ছেড়ে হাত দুটো পেছনে দিয়ে একটু পেছনে হেলে বোকার মতো বসে পড়ে। মুন্না বাবার পাশে, গা ঘেঁষে বসে।

আঁকশিটা উঁচিয়ে রাকেশ ওপরে তাকিয়ে তাকিয়ে এগোয় পেছোয়। একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে অভিজ্ঞ ও সন্ধানী চোখে সবুজ ঝিরিঝিরি পাতার মধ্যে থেকে ও মরে যাওয়া ডালগুলো শনাক্ত করে। তারপর আঁকশি দিয়ে টেনে টেনে ডালগুলো নামায়। মোটা ডালগুলো একেবারে ভাঙে না, যখন ভাঙে তখন ভাঙার শব্দটা একটা অন্তিম আর্তনাদের মতো শোনায়। কয়েকটা ডাল ভাঙার পর দারা ওঠে রাকেশকে সাহায্য করবার জন্য। রাকেশ বলে, 'অউর একঠো। ব্যস।'

মুন্না থেবড়ে বসে বাবার লাফিয়ে লাফিয়ে ডাল ভাঙা দেখে। দেখে আর হাততালি দিয়ে হাসে। হাসে আর হাততালি দেয়। রাকেশ ডালগুলো জড়ো করে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধে। ডালপালার বোঝা ও মাথায় চাপিয়ে নেয়। দারার দিকে চোখ মটকে ইশারা করে, ' 'চলো ইয়ার।'

দারা ছেলেকে, অভ্যাসমতো কাঁধে তুলে নেয়। ওরা এগোয়। খানিকটা এগোবার পর একটা ধ্বনি শুনতে পায়। উলটো দিক থেকে শাদা জমিতে সবুজ রঙে শ্লোগান আঁকা ফেস্টুন হাতে বাচ্চাদের একটা মিছিল আসে। সামনে রিকশায় মাইক নিয়ে দু-জন।

আজ অরণ্য সপ্তাহের শেষ দিন। রাকেশ হেসে বলে, 'পেঢ় বচানেকা জুলুস।'

ওদের পাশ দিয়ে মিছিলটা ধ্বনিতে ধ্বনিতে চলে যায়। প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা 'শিশুর কল্যাণ কিশলয়' লেখা ব্যানারটা ধ্বনিতে ধ্বনিতে বয়ে নিয়ে যায়।

মিছিল পেরিয়ে গেলে দারার মন খারাপ হয়ে যায়। ধ্বনির অর্থ ও বোঝে না কিন্তু সমবেত এই ধ্বনির আঘাতে ওর শরীর ধরে কী যেন নাড়া দেয়। ধ্বনির আঘাতে ওর অন্য জীবনের স্মৃতির দরজা একটা হাহাকারের মতো খুলে যায়। লছমি যেন তার খেতি, গাঁও, পেঢ় আর ঘরবসত শুদ্ধু নিয়ে চলে গেছে।

কী হল লছমির? বেটা না বিটি?

তার মুন্নার শরীরে লছমির শরীরের বাস আছে। দারা ছেলেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বুকের ভেতর গোল পাকিয়ে নেয়। মাথা নিচু করে চুমো খায় পাগলের মতো। মুন্না খিলখিল হাসে। ছোট মুঠিতে ঘুঁষি মারে বাবার বুকে। হাতে।

রাস্তার ধার দিয়ে গাড়ির ব্যাটারি আনা নেওয়া করার হাতে ঠেলা ছোট ট্রলির ওপর ছেলেকে বসিয়ে রাস্তার ধার দিয়ে দারা ঠেলছিল। ছেলেটা যেন তার শরীরের অংশ হয়ে গেছে। অথচ গেল বর্ষাতেও সে মায়ের বুকে মুখ না গুঁজে, একটা হাত মায়ের বুকে না রেখে ঘুমোতে পারত না। আর এ-কটা মাসে মুন্না যেন মাকে ভুলেই গেছে। সে শুধু জানে 'বাবুজি'। যেন সে শুধু দারার ছেলে। একটুও লছমির ছেলে নয়। কিন্তু মুন্নার মুখখানা ধীরে ধীরে তার মায়ের মুখখানার মতো ক্রমে ফুটতে থাকে। তার বড় বড় চোখ, খয়েরি চোখের তারা, একটু কোঁকড়ানো কালো চুল আর ছোট গোল নাকের পাটায় যেন লছমির আদল আসে।

দারা দুসরা আওরতের কথা ভাববে কী করে? রোজই যেমন সে লছমির হাসি কান্না, চুড়ি বাজিয়ে চলা শরীরের স্মৃতি থেকে এক দু-কদম আগে বাড়ছে, তেমনি রোজই সে যেন একটু একটু করে মুন্নার বাবা হয়ে উঠছে। তার যেন আর কোনও পরিচয় নেই। সে শুধুই দারা — মুন্নার বাবুজি। কিন্তু মুন্নার বাবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন লছমির স্মৃতির টানটা ফিরে আসে। ফিরে ফিরে আসে। তখনি মুন্নার বাপ টের পায় সুতোটা ছেঁড়েনি। সুতোটা যেন ইলাসটিকের মতো লম্বা হচ্ছে। লম্বা হচ্ছে আর ধারালো হচ্ছে। তীক্ষ্ণতার সেই দাঁত ওর সর্বাঙ্গে কাঁটার মতো বেঁধে।

ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে দারা একটু আনমনা হয়ে যায়।

'কী গ, তুমার ছিল্যাট যে ঘুমাইচ্যে। পড়্যা যাবেক।'

দারা তাকিয়ে দ্যাখে কাঁকালে ঝুড়িতে গোবর এক বাউরি রমণী। রমণীর মুখের দিকে তাকিয়ে

দারা সসঙ্কোচে হাসে। নিচু হয়ে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখে গা গরম। ও ডাকে, 'মুন্না, মুনুয়ারে? কা ভইল্‌বা?' মুন্না তাকায়। ওর লাল চোখ দেখে দারা ভয় পেয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। এক হাতে ছেলেকে জড়িয়ে অন্য হাতে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে গ্যারেজের দিকে যায়।

পেছন থেকে মেয়েটি বলে, 'আহারে মা নাই ছিল্যাটার ধূলায় গড়ায়। বাপে কি পারে?'

কিন্তু মা না-থাকলে বাপকে তো পারতেই হয়। দারাকেও সেভাবে পারতে হয়। মুন্নার মা হয়ে উঠতে হবে তাকে এটা সে জন্তুর মতো সহজাত প্রবৃত্তিতে বুঝে ফেলে। সে একথাটাও বুঝে ফেলে সে যদি শুধুমাত্র মুন্নার বাবা হয়ে থাকে তাহলে মুন্নার সবটুকু তার ছেলে হবে না। তাকে তো হতে হবে মুন্নার মা-ও, তবেই তো মুন্না হয়ে উঠবে তার ছেলে। তারই ছেলে। দারার ছেলে।

সুনীল বলে, 'রাকেশকে ডাক, তোদের ডাক্তারখানা নিয়ে যাবে। একেবারে দাওয়াই নিয়ে ঘর যাবি। রুপেয়া-টুপেয়া আছে না, সব খতম?'

দারা অস্ফুটে 'হাঁ' বলে ঘাড় কাত করে।

সুনীল ডাকে, 'রাকেশ!'

রাকেশ একটা ব্যাটারি খুব মন দিয়ে খুলছিল। সুনীলের ডাকে উঠে আসে, 'জি?'

'শোন — দত্তবাবুর স্কুটারটা নিয়ে এদের ডাঃ চক্রবর্তীর চেম্বারে নিয়ে যা। বাচ্চাটাকে দেখিয়ে একেবারে দাওয়াই নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিবি। এই টাকাটা রাখ।' পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে রাকেশকে দেয়।

'গুনে নিস। ছেলে ভালো হলে কেটে নেব।'

ডাক্তারের মুখের দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল দারা। ভয়ে তার কালো মুখখানা আরও একপোঁচ কালি মেরে গেছে।

রাকেশ বলে, 'ডাগদরবাবু ভালো হোবে তো?'

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে ডাক্তার বলেন, 'নিশ্চয়। এর বাবা কে?'

দারা হাত জোড় করে ঝুঁকে হ্যাঁ বলে।

'এই ট্যাবলেটটা আধখানা করে তিনবার। আধা করকে তিন টাইম। অউর ইয়ে শিশিকা সিরাপ এক চামচ করকে দু-বার। বুখার জাদা হোগা তো ঠাণ্ডা পানিমে মাথা ধো দেনা। সমঝা?'

দুটো দশ টাকার নোট টেবিলে রেখে ওরা বেরিয়ে আসে।

রাকেশ বলে, 'তু ফিকর মৎ কর, য়ঁহা বৈঠ।' ছেলে কোলে দারা বারান্দায় পায়চারি করে। রাকেশ পাশের ওষুধের দোকানে ঢুকে যায়।

মেঝেতে খড়ের ওপর কাঁথা বিছিয়ে বিছানা। দারা ছেলেকে শুইয়ে মাথার কাছে বসে। আধখানা ক্যালপল আর একচামচ কোরেক্স্ খাইয়ে দিয়ে গেছে রাকেশ। একটা পাউরুটি, একশো থিন অ্যারারুট বিস্কুটের প্যাকেট আর আড়াইশো গ্রাম চিনির একটা ঠোঙা রেখে গেছে একটা কাঠের জলচৌকির ওপর। বীরবলের বউয়ের আজ ভরের দিন। ফলে দারাকে

ওরা আজ কিছু জিগ্যেস করেনি। পেছন দিক দিয়ে ছেলে কোলে দারা ওর ঝোপড়িতে সেঁদিয়ে যায়। নিঃশব্দে।

কয়েক চামচ পানি ছাড়া মুন্না বিকেল থেকে কিছু খায়নি। রাকেশ বারবার বলে গেছে শরীর আর দিমাগ ঠিক রাখতে। দারা যেন পাউরুটি চিনি খায়। কিন্তু দারা তো তার পুত্রের পিতাই শুধু নয়, জননীও, তাই সে ছেলের শিয়রে বসে থাকে। ছেলের শিয়রে নিশি জাগে। লছমির ওপরে, পালিয়ে যাওয়ার পর, এই প্রথম তার অভিমান হয়। কী করে পারল লছমি তার বেটাকে ফেলে যেতে? কী করে পারল লছমি তার বেটার বাবুজিকে ফেলে যেতে?

সে কি দারা ওকে রঙিন রেশমি শাড়ি কিনে দিতে পারেনি বলে? সে কি দারা ওকে ঝুটা গয়না আর সাজবার জিনিস কিনে দিতে পারেনি বলে? পেট ভরে সারা বছর খাওয়াতে পারে না বলে? হায়, দারাও তো ভুখা থাকে। আধা নাঙ্গা থাকে।

কিন্তু লছমিকে না-দেখলে দারার দুনিয়া আঁধার হয়, দারার বেঁচে থাকাই নিষ্ফল হয়ে যায়, এটা বুঝল না বহু? বনোয়ারি কি ওকে শাদি করবে, না ঝুঠা পাতার মতো ফেলে দেবে লুঠে পুটে খাওয়ার পর? তখন কী হবে লছমির? কোথায় যাবে? কী খাবে? শহরে গিয়ে খাতায় নাম উঠাবে তাহলে লছমি? হায় রামজি!

আকাশে মেঘ করে আছে। ঝিরঝির বৃষ্টি হল খানিক। ঝোপড়ির পেছনে ব্যাঙ ডাকে। ঝিঁ ঝিঁ দীর্ঘ ডাকে। অনেক দূর থেকে কুকুরের ডাক শুনে দারা বোঝে বেপাড়ার কুকুর ঢুকেছে বলে এতগুলো কুকুর এমন সমবেত ডাকে।

মুন্নার কপাল আর মাথাটা ঘেমে যায়। দারা গামছা দিয়ে মুছে দেয়। মুন্না একটু শব্দ করে কেঁদে ওঠে। দারা ঝুঁকে বলে, 'এ মুন্না? মুন্না বেটা, তানি পানি পি লে।' চামচে করে দু-তিন চামচ জল খাওয়ায় ছেলেকে। মুন্না কাশে। দারা ছেলেকে তুলে নেয়। কাঁধে ফেলে বসা অবস্থাতেই কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গ ডাইনে বাঁয়ে মোচড় দিয়ে দোলায়। তাতে কাশিটা কমে। আরাম পায় যেন।

ঝোপড়িতে দারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, এত নিচু চালা।

মুন্না দু-হাতে বাপের গলা জড়িয়ে গলার নিচে মুখ ডুবিয়ে দেয়। জোরে জোরে শ্বাস ফেলে। দারা দুই বাহুর ঘেরে ছেলেসমেত আস্তে আস্তে কাত হয়। পা দুটো গুটিয়ে এমন এক আশ্রয় তৈরি করে দেয় ছেলেকে যেন মাতৃগর্ভের বাইরে আর এক গর্ভের নিরাপদে তার ছেলে এক নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে চলে যেতে পারে।

শরীরের ভিতরে তো আর কোনও গর্ভ নেই দারার। শরীরের বাইরে আর এক গর্ভ রচনা করে। দারা ছেলে নিয়ে শেষ রাতের বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক নিঃশব্দ ঘুম ঘুমায়।

সাতদিন পরে ছেলে কাঁধে দারা গ্যারেজে এল। তার কোথায় যেন একটু সংকোচ। দ্বিধা। ছেলে কাঁধে নিয়ে সে দাঁড়িয়েই থাকে।

একটা ট্রাকের বনেটের ওপর দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের কেবিনে সবুজ রং লাগাচ্ছিল রাকেশ।

হলুদ বর্ডারের নিচে। দারাকে দেখে সে উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। 'আ গয়া ইয়ার! এ মুন্না, তবিয়ত ঠিক হো গয়া না?'

দারা মুন্নাকে নামিয়ে দেয় মাটিতে ঠিক একটা পুতুলের মতো। জ্বরে ভুগে তার হাত পা-গুলো সরু হয়ে গেছে। মাটিতে দাঁড়িয়ে সে বাবার মুখের দিকে তাকায়। তার হাতে একটা আধ-খাওয়া বিস্কুট। মুখের ভেতরে বাকি আধখানা লালায় চটচটে হয়ে আছে।

'বাবুজি পানি।' জড়ানো গলায় বলে মুন্না।

'আভি লে আতা মুন্নু।' দারা এক দৌড়ে সুনীলদের ঘরে ঢোকে। একটা ছোট বাটিতে জল নেয় জালা থেকে; ছেলের কাছে এসে পাশে দাঁড়ায়। ঝুঁকে বাঁ হাতে ছেলের মাথার পেছনটা ধরে মাথাটা আস্তে নিচু করে সেই সঙ্গেই ডান হাতে বাটিটা ছেলের মুখের কাছে ধরে।

'পি লে বেটা।'

জল খেয়ে মুন্না হাসি ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে তাকায়।

দারা বাটিটা ধুয়ে রেখে আসে।

সাত-আটজন কাজ করছে। একটা লরির ফ্রেমের ওপর আড়াআড়িভাবে কাঠের পাটা ফাঁক ফাঁক করে পাতা। দু-জন হ্যামার দিয়ে পেরেক ঠুকছে। সুনীল গলার মাদুলির কারটা দু-পাটি দাঁতের মধ্যে চেপে চোখ সরু করে নিচু হয়ে টায়ারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

লোকগুলোর অল্প কথার আওয়াজে, হাতুড়ির প্রবল আঘাতে ওদের পেশির তরঙ্গে যেন এক সংগীত ধ্বনিত হয়। সেই সংগীতের সুর দারার মেরুদণ্ডে এক আনন্দ তরঙ্গ হয়ে যায়। এই যে লোকগুলো কাজে মেতে আছে তাতে ও এক আত্মীয়তা অনুভব করে। এই আত্মীয়বন্ধন কোনও রক্তের মিশ্রণে কি টানে তৈরি নয়। কোনও আনুষ্ঠানিকতায় তৈরি নয়। এ আত্মীয়বন্ধন শুধু কর্মের মধ্যে দিয়ে শ্রমের ঐক্যে এ আত্মীয়তা মাটি পায়। দৃঢ়তা পায়। দারা এমনিতে মুখচোরা, ভালো করে গুছিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। দেশে গাঁয়ে খেতিতে যখন কাজ করত তখন লছমি ছাড়া আর কারও সঙ্গেই ওর এই টান তৈরি হয়নি। অথচ ও এখন বোঝে সেই খেতিও ওর ছিল না, ফসলও ওর ছিল না, এমনকি ওর মনে হয় ও নিজেও ওর ছিল না। কাজে কাজেই লছমি কী করে ওর একার হয়? মুন্নাও হয়তো ওখানে থাকলে ওর বেটা হত না। লছমির বেটা হত না। বড় হয়ে মুন্না তো ওদের ঘরেই জন খাটতে যেত। আর এখন মুন্না তার। তার নিজের বেটা। তার দুই হাত দশ আঙুল আর প্রতিটি পদক্ষেপ তার নিজের। মুন্নার দুই হাত, দশ আঙুল আর প্রতিটি পদক্ষেপ মুন্নার নিজের। আর সেই নিজেকে নিয়ে যে মুন্না সে তো সবটাই তার ছেলে। দারার ছেলে।

সুনীল ওকে দেখে চেঁচায়, 'অ্যাই উল্লু ইধার আ। এক হপ্তা কামাই করে দাঁড়িয়ে আছিস? নে নে কাজে লেগে যা, হ্যামারটা নে। বিশুটা আসেনি আজ।'

দারা কালো ঢলঢলে প্যান্টটা গুটিয়ে তোলে হাঁটু অব্দি। ওর সবল, রোমশ পা দু-খানা নিজেরই নির্ভরে আর প্রত্যয়ে মাটির ওপরে খাড়া, নগ্ন দাঁড়িয়ে থাকে।

দারা জামা খুলে ফেলে। তাড়াতাড়িতে ছেঁড়া জায়গাটা আরও একটু ছিঁড়ে যায়। ও জামাটা দলা করে ছুঁড়ে দেয়। প্রায় হলুদ হয়ে যাওয়া শাদা বেনিয়ানের নিচে ওর শক্ত সমর্থ শরীর দেখা যায়। বোঝা যায়।

মাটিতে পড়ে থাকা একটা বিশাল হাতুড়ি নিয়ে দারা লরির কাছে যায়। হ্যামারটা রাখে কাঠের ওপর। দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে ফ্রেমের ধারে। উবু হয়ে বসে। সুনীল ঘুরে ওপাশে গিয়ে কাঠটা ঠিক জায়গায় সরিয়ে দেয়। ও-পাশটা আটকানো। দারা হ্যামারটা নিয়ে দু-বার ঠুকে দেয়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয়, কাজ আরম্ভ করার আগে ছেলেকে একবার দেখে নেয়। কান পেতে অন্যদের হাতুড়ির আওয়াজটা শোনে। শরীরে গেঁথে দেয় সেই ধ্বনির আঘাত। সুরটা চিনে নেয়। তারপর হাতুড়িটা তোলে।

মুন্না, তার শরীর এখনও দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠেনি, ছোট ছোট টলমল পায়ে এগিয়ে বাপের পিরানটা নিচু হয়ে তুলে নেয়। বুকের ভেতর বাপের ঘামের গন্ধমাখা জামাটা দু-হাত দিয়ে জড়ো করে রাখে।

সুনীল ডাকে, 'এ মুন্না শোন। শুনরে বেটা।' ঘাড় গোঁজ করে নিজের দিকে তাকিয়ে দাঁড়ায় মুন্না। সাড়া দেয় না। সুনীল হাত বাড়িয়ে একটা কাঠের ববিন টেনে নেয়। হাত থাবড়ে বলে, 'বোস, বৈঠ যা।'

মুন্না মুখ তোলে। চোখ তোলে। বাবার দিকে তাকায়। ওকে ববিনে বসিয়ে সুনীল টায়ারে হাত রাখে। উবু হয়ে বসা অবস্থায় ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করে, 'বড়া হোকে কেয়া বনোগে তুম। ড্রাইবর? মেকানিক ইয়া মিস্ত্রি?'

বাবার গন্ধমাখা জামা দু-হাতে উঁচু করে তোলে মুন্না। লজ্জায় নাকি ভালোবাসায় ওটার ভেতরে নাক মুখ ডুবিয়ে দেয়।

সময় ও আলোর সীমানা দিয়ে চিহ্নিত এক ঘটমানতায় লরির একধারে বসে দারা তার দুই হাতে হাতুড়িটা একটি রেখায় ও ছন্দে মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে তোলে শরীরের শক্তি দিয়ে। পেশির প্রবলতা দিয়ে। যৌবনের মহিমা দিয়ে। শরীর ও মনের একাগ্রতায় সেই ছন্দ যেন প্রাণ পায়।

সেই একই আলোর বৃত্তে বাপের ঘামের গন্ধমাখা জামা দু-হাতে বুকের কাছে জড়ো করে দারার ছেলে মুন্না এক জীবন থেকে অন্য এক জীবনের প্রবেশ পথে পৌঁছে যায়।

একাত্তর ১৯৯০

এইসব রণরক্ত সফলতা

রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে রণজয় দেখল জিনিয়া খুব মন দিয়ে কড়াইতে কী যেন নাড়ছে। বাঁ হাতে সাঁড়াশি, ডান হাতে হাতা। ও ফিরে যাচ্ছিল, জিনিয়া কড়াই থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'উঁহু, এখন নয়, আর আধঘন্টা পরে বেরিয়ো।'

'তোমার কি মাথার পেছন দিকেও চোখ আছে?' রণজয় ঘুরে দাঁড়ায়; জিনিয়ার মেজাজ কী রকম আছে সেটা বুঝে নেয়া দরকার। আর একবার হাতা দিয়ে কড়াই-এর সমস্তটা ঘুঁটে দেয় জিনিয়া। নব ঘুরিয়ে স্টোভটা নেবায়। একটা স্টিলের থালা দিয়ে কড়াইটা ঢাকে তারপর বালতির ঢাকা সরিয়ে মগে করে জল তোলে। রান্নাঘরের নর্দমার কাছে নিচু হয়ে হাত ধোবার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হাসে। নিঃশব্দে।

'চা করব?' হাত ধুতে ধুতেই জিনিয়া বলে।

'আচ্ছা একটু করো। জিনা, একটা সিস্ক করা দরকার, তোমার কত কষ্ট হয়।'

'মেয়েমানুষের একটু কষ্ট করা ভালো। এখুনি ওসব করতে হবে না। তুমি বসো; দশ মিনিট লাগবে। কি অপেক্ষা করতে রাজি তো?'

রণজয় বোঝে জিনিয়া মুডে আছে। এমনিতে ওর মেজাজ বোঝা মুশকিল। এতদিনের অভ্যাসেও বোঝা যায় না কখন ও অনর্গল কথা বলবে আর কখন ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে থাকবে।

'সারা দুপুর ধরে এত কী করছ আজ?' রণজয় বলে। একটা বড় থালার ওপরে অনেকগুলো ছোট-বড় বাটিতে হাতায় করে পায়েস রাখতে রাখতে জিনিয়া ওর ভঙ্গি একটুও না বদলিয়ে বলে, 'পিঠে করছি, টের পাওনি? আচ্ছা মানুষ তো তুমি! গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছে— কোথায় থাকো? আজ, মকর-সংক্রান্তি পিঠে-পায়েস খেতে হবে না?'

শীতকালে জিনিয়া মাঝে মাঝে পিঠে-পায়েস করে। রণজয় খায়। কিন্তু আজই বিয়ের এত বছর পরে জিনিয়ার মুখে মকর-সংক্রান্তি শুনে রণজয় ভারি অবাক হয়ে যায়। বলে, 'তুমি এতসব জানলে কী করে? তোমাদের বাড়িতে তো ...... ।'

চায়ের কেটলি বসায় জিনিয়া। ট্রেতে রণজয়ের কাচের গ্লাস, ওর নিজের কাপডিস টি-পট রাখে। ও প্রায় পুজো করার নিষ্ঠায় চা করে। কিন্তু সেই নিষ্ঠা এখন এত বেড়ে যায় যে রণজয় বুঝে ফেলে জিনিয়ার মুড অফ। ও ঘরে চলে আসে। আলমারি খুলতে গিয়ে দেখল ড্রয়ারে চাবি নেই। আলমারিতেই লাগানো। ও বুঝল আজ জিনিয়ার সমস্ত মন রান্নাঘরেই আছে। রণজয় জামা প্যান্ট বের করে রাখল।

'এই নাও চা।' জিনিয়া ট্রে-টা টেবিলে রেখে বেশ গুছিয়ে বসে। 'আবার পিঠে দিলে কেন? দুপুরের খাওয়াই হজম হয়নি এখনও।'

'এটা টেস্ট করতে দিলাম — কাল তোমার বন্ধুদের খাওয়াব তো তাই। খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে।'

জিনিয়া চায়ে চুমুক দেয়। রণজয় দু-কামড়ে একটা ভাজা পুলি খেয়ে বলতে গেল 'ফ্যান্টাসটিক' কিন্তু সেইসঙ্গে এক চুমুক চা গলায় চলে যাওয়াতে কথা আর চা একসঙ্গে গলায় আটকায়। ও কাশতে থাকে।

'ষাট্ ষাট্। কী যে কর তুমি! এত তাড়া কীসের?'

জিনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রণজয় বোঝে ও ঠাট্টা করছে না। মাথা থেকে জিনিয়ার হাতটা আস্তে নামিয়ে দেয়-- 'মাঝে মাঝে এমন পিসিমা পিসিমা বিহেভ কর না।' বলেই রণজয় অপেক্ষা করে কিন্তু জিনিয়া রাগে না। এদিকে তাকায়ও না। শুধু বলে, 'যা কাণ্ড কর তুমি। তোমার একটা পিসিমাই দরকার ছিল। বউ নয়।'

কিসের থেকে কী কথা। রণজয় লম্বা চুমুকে চায়ের গ্লাস অর্ধেকের বেশি খালি করে দেয়। পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে শার্ট পরতে শুরু করে।

'ওমা, এখুনি যাবে নাকি? দেখি তোমার পা?'

'না না এখন আর পা দেখতে হবে না-- আমি ঠিক আছি। কোয়ায়েট ফিট।' রণজয় বলে।

'না, তুমি ঠিক নেই। এই সেদিনও লাঠি নিয়ে চলেছ — কেন ঘরে বসে থাকতে তোমার আর ভালো লাগছে না তা বুঝি না আমি?'

রণজয় ডান পায়ের পাতাটা জিনিয়ার দিকে বাড়িয়ে দেয় — 'নাও দেখ, দেখে সার্টিফিকেট দাও আজ বেরোব কি না।' পায়ের পাতাটা গোড়ালি থেকে অল্প ফুলে আছে। কথাটা ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে ওর। রোজই তো ও ওই গলানো লোহার তপ্ত তরল প্রবাহের এপাশ থেকে ওপাশে ডিঙিয়েই যেতে অভ্যস্ত, সেদিন যে কী করে ওর পা-টা পড়ে গিয়েছিল স্ল্যাগের মধ্যে আর কী করে যে ও সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশে ওর প্রায় গলে যাওয়া পায়ের পাতাটা তুলে নিয়ে খানিক দূর গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল আর অজ্ঞান হয়েই ছিল কারখানার হাসপাতালের বেডে জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত, এসব এখন মনে করাও কঠিন। সে পা সারল। প্লাস্টিক সার্জারি করে অনেকখানি ঠিক হয়েছে, প্রায় স্বাভাবিক ওই ফোলাটা বাদে। ওটা নাকি হাঁটাহাঁটি করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। এখন ক'দিন ও লাঠি ছাড়াই হাঁটছে।

হাঁটু গেড়ে বসে জিনিয়া। এখন এভাবেই বসতে হয় ওকে। রণজয় বলে ওঠে,'ওভাবে বোসো না জিনা, যা তা কেস হয়ে যাবে!'

'কটা কেস দেখেছ তুমি?' জিনিয়া সামান্য ঝুঁকে রণজয়ের পায়ের পাতায় হাত বোলায়। ওর নিজের শরীরের, এখনকার শরীরের পরিবর্তন, বসার এই ভঙ্গিমায় ততটা বোঝা যায়

না, শাড়ির ছড়ানো কুঁচি আর স্খলিত আঁচলের নিচে ঢাকা পড়ে যায় ওর ক্রমস্ফীত তলপেট — ওর অষ্টম মাসের গর্ভ।

'প্রণাম করার মতো পা তোমার রণো। একেবারে দেহিপদপল্লবমুদারম্।' হাতটা তুলে নিজের মাথায় বুলিয়ে নেয় জিনিয়া।

'বাব্বা, এত সংস্কৃত জানলে কী করে?' রণজয় হাসতে হাসতে বলে।

'কেন আমি বুঝি তোমাদের গীতগোবিন্দম পড়তে পারি না?' 'তোমাদের' শব্দটায় অনাবশ্যক জোর দেয় জিনিয়া।

'আমি ওভাবে বলিনি জিনা, প্লিজ।' রণজয়ের হাসি মিলিয়ে যায়। জিনিয়া উঠে পড়ে। আঁচল তুলে নেয়।

কোনও মানুষের চেহারা দেখে তো তার জাত, ধর্ম বোঝা যায় না। পোশাক-আশাক দেখে খানিকটা হয়তো তার শ্রেণী-অবস্থান বোঝা যায়। কাজেই জিনিয়াকে দেখেও বোঝা যায় না জিনিয়ার বিয়ের আগের নাম জিনিয়া খাতুন। এখন ও জিনিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। তবু 'আব্বা' 'আম্মা' 'চাচা' 'খালা' বিসর্জন দিয়ে, সচেতনভাবে এইসব শব্দ বর্জন করেও 'জি' আর 'পানি' ছাড়তে পারেনি। কেন যে পারেনি এটা যেমন ও জানে না তেমনি হঠাৎ হঠাৎ কোন কথায় কোথায় যে ওর লেগে যায় তা ও নিজেই বুঝতে পারে না।

জিনিয়া একটু শুকনো হাসে। চায়ের খালি কাপ প্লেট গ্লাস গুছিয়ে নেয় ট্রে-তে। বলে,'রণো, তোমার কোনও দোষ নেই, আমারই আর একটু সহনশীল হওয়া উচিত। কিন্তু আজ কি তোমার না বেরোলেই নয়?'

'লাইব্রেরি আর ক্লাবের অবস্থাটা নিজের চোখেই দেখে আসি। হিসেব-টিসেব গোলমাল করছে শুনলাম।'

'যাকগে, তোমার ক্লাব আর লাইব্রেরি। এত খেটেখুটে দাঁড় করাবার পরেও যদি এমন বেহাল অবস্থা হয় তো ওদের মুখ থুবড়ে পড়তে দাও।'

'রেগো না জিনা। দেখ কোনও কিছু তৈরি করা নিশ্চয় কঠিন। কিন্তু কঠিনতর ব্যাপার হচ্ছে তাকে টিকিয়ে রাখা। রক্ষা করা। এত লেখালেখি করে রুরাল লাইব্রেরির টাকার ব্যবস্থা করেছি সেটা কি এত সহজে নষ্ট হতে দেওয়া যায়?'

'লাইব্রেরি আর ক্লাবের খবর তো ঘরে বসেই পাও। আসল কথা হল রোজ এই একই মুখ দেখে দেখে পচে গেছে। বিলকুল পন্ধা! আরে ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে যে।' রণজয় জিনিয়ার লম্বা বেণী ধরে টান দেয়। সেই টানে জিনিয়ার মুখটা উঁচু হয়ে যায়। রণজয় সেই এগিয়ে আসা মুখের ওপর নিজের মুখ নামিয়ে আনে। একটু পরে জিনিয়া ছটফট করে। দু-হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় ওকে।

'মেরে ফেলবে নাকি? উফ্ ডাকাত কোথাকার, দম আটকে যায় না বুঝি আমার?' ও অল্প হাঁফায়। লম্বা করে শ্বাস নেয়।

রণজয় বলে, 'জিনা, এরকম ম্যারাথন চুমু খেতে ক'টা স্বামী পারে বল? তোমার মুখ

আমার কাছে কোনও দিন পুরনো হবে না। তুমি আমার চিরনতুন।'

'থাক, থাক, শুরু হল তোমার বধূকীর্তন, এখন বেরোবে তো বেরোও।' ঠোঁট দুটো লাল হয়ে গেছে জিনিয়ার -- আয়নায় না দেখেও ও বোঝে। চুলের গোড়াতেও লেগেছে। বাঁ হাতের উলটো পিঠে ঠোঁট মুছে নেয় ও। বলে, 'রাত করবে না। আমার শরীর ভালো নেই।'

রণজয় তো এমনিই। বিশ বছর আগেও এমনি ছিল। কিংবা আরও একটু বেশি। আঠারো বছরের রণজয়ের গল্প শুনেছে জিনিয়া, চোখে তো দেখেনি। জিনিয়ার কাছে রণজয় ছিল গল্পকথার নায়ক। এমন একজন মানুষ যে থাকতে পারে ও ভাবতেই পারেনি। ওর মনে হয়েছিল রণজয় যেন গল্প-উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা এমন এক মানুষ বাস্তবে যার অস্তিত্ব প্রায় অবিশ্বাস্য। প্রথম যেদিন ও রণজয়ের উন্মুক্ত পিঠ দ্যাখে, মাথার ঘন চুলের ফাঁকে গোটা তিন-চার চুলহীন কাটা দাগ দ্যাখে, গলার নিচে সিগারেটের ছ্যাঁকার পোড়া দাগ দ্যাখে, সেদিন ও যেন শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের সমস্ত ব্যথা ও বিষ শুষে নিয়েছিল। রণজয় যেন ওর শুধুমাত্র প্রেমিক ও স্বামী নয়, রণজয়ের জন্য জিনিয়া নিজেই হয়ে ওঠে এক বৃক্ষ -- শিকড়ে-বাকড়ে, ছড়ানো ডালপালা আর পাতায়। ওকে তো তেমন হতেই হয় কারণ রণজয় কখন যে কী দুর্ঘটনা ঘটাবে এই ভাবনাতেই ও টানটান হয়ে থাকে। বছরে কয়েকবার, প্রায় নিয়ম করে রণজয় স্কুটার উলটে রাস্তায় কি নালায় পড়ে থাকে। বছরে দু-তিন মাস হাতে, পায়ে, গায়ে, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়ে থাকে রণজয়। এখন, এই দশ বছরে এ ব্যাপার-স্যাপারগুলোকে আর দুর্ঘটনা বলা যায় না। যেন এগুলো ঘটনাই। এত স্বাভাবিক আর নিয়মিত হয়ে ওঠা দুর্ঘটনা তো ঘটনাই হয়ে ওঠে জিনিয়ার কাছে। আর তাই ও,প্রথমবারের, বিয়ের ঠিক পরেই সন্তান গর্ভে আসা ও নষ্ট হবার পর, দ্বিতীয়বার মা হতে চায়নি। একে তো এইরকম একটা বিয়ে-- তার না-আছে বাপের বাড়ি, না-আছে শ্বশুরবাড়ি। ওদের প্রথম সন্তান যখন জিনিয়ার শরীরচ্যুত হয়ে অকালে নষ্ট হচ্ছে, রণজয় তখন উপুড় হয়ে জি টি রোডে পড়েছিল, অচেতন। রণজয়ের বন্ধুভাগ্য ভালো-- তারাই জিনিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন জিনিয়া জানতেও পারেনি যে রণজয়ও হাসপাতালের মেল ওয়ার্ডের বিছানায় রক্তে মাখামাখি হয়ে শুয়ে।

কিন্তু রণজয় বেঁচে যায়। দু-দিন পরে ওর জ্ঞান ফেরে। পরে ও জিনিয়াকে হাসতে হাসতে বলে, 'পুলিশ যাকে গুলি করে, ঠেঙিয়ে মারতে পারেনি, তাকে ভগবানও মারতে পারবে না।'

স্কুটারের শব্দ পেল জিনিয়া। ও দ্রুতপায়ে দরজার কাছে এসে দেখল রণজয়ের স্কুটার বেশ খানিকটা চলে গেছে। বাঁক ফেরার আগে রণজয় ঘাড় ঘোরাল এক পলক, বাঁহাত তুলে নাড়ল, তারপর বড় বাড়িগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রণজয় ফিরল দশটায়। জিনিয়া কাজ সেরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে পড়ছিল। ও রোজই পড়ে-- একবার 'গীতাঞ্জলি', একবার 'নৈবেদ্য'। পড়তে পড়তে ওর অনেক কবিতা

মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু ও পড়ে। বহুবার এক-একটা কবিতা কিংবা গানের এক-একটা চরণ যেন ওর সামনে এক অদৃশ্য অলৌকিক জগতের দরজা খুলে দেয়। পরিচিত শব্দগুলো ছিলেকাটা হিরের মতো নানা রঙে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ছোট বই দুটোর প্যাকেট ওকে দিয়েছিল হানিফ-- ওর চাচাতো ভাই। ওর সম্পর্কে হানিফের দুর্বলতা ছিল ও জানত। ও নিজেও 'হানিফভাই' বলতে অজ্ঞান ছিল। বাড়ির লোকও চাইত এই শাদিটা হোক। কিন্তু জিনিয়াই বেঁকে বসল। ওরা যদি হিন্দু হত তাহলে হানিফ ওর রক্ত-সম্পর্কে দাদা হত, সেখানে শাদি হত না। আর এরকম শাদি নাকি অবৈজ্ঞানিক। মেয়ের এইসব যুক্তিতে সিরাজুল সাহেব মুশকিলে পড়েন। বাড়ির সবার মত অগ্রাহ্য করে ছোট মেয়েটিকে তিনি অন্যরকম করে বড় করেছেন। এম.এ. পাশ করিয়েছেন, নাচ-গান শিখিয়েছেন, কিন্তু সেই শিক্ষার ফল যে এরকম হবে তা তিনি ভাবেননি। আবার মেয়ের কথায় বিচলিত ও বিহ্বল বোধ করলেও যুক্তিগুলো খণ্ডন করতে পারেন না।

সেসময় হানিফ এগিয়ে না-এলে জিনিয়ার বিয়েটা হত না।

পড়তে পড়তে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল জিনিয়া। এইরকম ভরা শরীরে তো এমনিই হয়। ও ভাবে রণজয়কে বলবে একটা সবসময়ের লোক রাখতে। একা ঘরে কখন যে কী হয়।

রণজয় বেল বাজায় ঠিক দু-বার। জিনিয়া দরজা খুলে নেমে যায় নিচে। স্কুটারটা পেছন থেকে ঠেলে দেয়। 'আমি একাই পারব জিনা, এ শরীরে তোমার এসব করা ঠিক নয়।' রণজয় বলে। 'বেশ তো পা ঠিক হোক, দুশো মিটার দৌড়োও আগের মতো, তখন বললেও ঠেলব না।' জিনিয়ার নিঃশ্বাস আটকে আসে তবু ও গাড়িটা ঠেলে। ঘুম ঘুম চোখে ঠেলে। রণজয় ওকে আলগা জড়িয়ে ঘরে যায়। একটানে জামাপ্যান্ট খুলে তোয়ালে টেনে বাথরুমে ঢোকে, আর ওখান থেকেই চেঁচায়, 'জিনা, চটপট খেতে দেবে কি না? পেট জ্বলে যায়, শুধুই খিদায়।'

খেতে বসে রণজয় বলে, 'রাগ করেছ তো আবার?'

রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে জিনিয়া বলে, 'কই না তো?'

'তাহলে এত চুপচাপ?'

'এমনি।'

'শরীর খারাপ হয়নি তো? ওহো আজ তো তোমার ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ছিল। দেখ কাণ্ড! একদম ভুলে মেরে দিয়েছি। মনে করিয়ে দেবে তো?'

'মন খারাপ কোরো না রণো— আমিও একটা ব্যাপার ভুলে গেছি।'

'ককী ব্যাপার?'

'তুমি বাড়ি না থাকলে যে-ডিউটিটা করি সেটা।'

'কোনও খবরই শোননি? আমারও শোনা হয়নি। আমি আবার ওদের সব বলে এলাম কাল সন্ধেয় আসতে। কিন্তু খবরটা শোনা জরুরি ছিল।'

'কেন, এখনও তো দু-দিন আছে।' জিনিয়া বলে।

রণজয়, জিনিয়া লক্ষ করেছে, যেন নিজের জায়গায় থাকে না। এখন ও আর রাজনীতি নিয়ে শারীরিকভাবে সক্রিয় নয় যদিও আত্মরক্ষার তাগিদে ওকে পার্টির আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু ধ্যানে আর মনস্কতায় ওর চাইতে সক্রিয় রাজনৈতিক জিনিয়ার অভিজ্ঞতায় জানা নেই। গত আগস্টে ইরাক হঠাৎ কুয়েতে ঢুকে পড়ে অধিকার জাহির করলে রণজয় যেন সেই ঘটনার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে যায়। আর আজ ক'দিন থেকেই ও যেন উপসাগরীয় এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। ক্লাবে লাইব্রেরিতে আর বন্ধুর বাড়ি গিয়ে ও কী করে ভুলে থাকল যুদ্ধের সম্ভাব্যতার কথা, জিনিয়া ভাবে। মুখে বলে,'অত ভেবো না, যুদ্ধ হবে না।' 'কেন, তোমার কি মনে হয় সাদ্দাম ঈস্ড করবে?' রণজয় এমনভাবে কথাটা বলে যেন জিনিয়া যা বলবে তাই ঘটবে। কিন্তু উত্তর দিতে একটু সময় নেয় ও। আর উত্তর দেবার আগেই বেল বেজে উঠল। রণজয় উঠতে যাচ্ছিল, জিনিয়া বলল, 'তুমি খাও, আমি দেখছি।'

দরজার ওপরের গ্রিলের ওপারে এলোমেলো চুল আর চশমার আভাস — জিনিয়ার মনে হল ও পড়ে যাবে। বাইরের আলোটা জ্বালাবার পরে জিনিয়া বলল,'একটু সরে দাঁড়াও হানিফভাই —দরজাতে ধাক্কা খাবে নইলে।'

দরজা খুলে জিনিয়া প্রায় রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে, 'এতদিনে মনে পড়ল তোমার?'

'দাঁড়া, দাঁড়া, আগে একটু আমার সামনে দাঁড়া, তোকে একটু দেখি, তারপর বকাবকি করিস।'

'দেখবে আবার কী? মোটা হয়েছি আর কালো হয়েছি এই তো?'

'বেশ গিন্নিও হয়েছিস দেখছি।' ব্যাগটা নামিয়ে রাখে হানিফ।

'উফ্ফ, কতদিন পরে এলে। দাঁড়াও ওকে ডাকি, রণো? র... গো... ? দেখ কে এসেছে?'

রণজয় উঠে এসেছিল, 'কে এসেছে জিনা?' বলতে বলতে, সেই স্বরের ওপর দিয়ে জিনিয়ার ডাক চলে যায়। 'আরে হানিফ। চলো চলো ভেতরে চলো।' ও বাঁ হাতে হানিফের ব্যাগটা তুলে নেয় — 'ভেতরে চলো, তারপর কথা হবে।'

খাওয়ার টেবিলে বসে হানিফ বলে, 'তোর খাবার খেয়ে ফেলছি নাকি?'

'ধ্যেৎ, আমার খাবার দিলে তোমার পেট ভরবে? গরম গরম লুচি ভেজে দিলাম আর ভাবছ তোমাকে ঠাণ্ডা খাওয়াচ্ছি?' জিনিয়া বলে। 'তুই এখনও মনে রেখেছিস আমি গরম খেতে ভালোবাসি?' হানিফ আশ্চর্য হয়ে যায়।

'বাড়ি চিনতে কষ্ট হয়েছে তো? আমি তো তেমন বিখ্যাত ব্যক্তি নই।' রণজয় বলে।

'প্রথমে একটু হয়েছিল, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের কল্যাণে তুমি দেশবিখ্যাত না হলেও বেশ বিখ্যাত হয়েছ তাতেই সুবিধা হল আর কি।'

'বাড়ির সবাই ভালো আছে তো হানিফভাই? আব্বার প্রেসার? আম্মা, বড়চাচা, চাচি, সাঈদা, দাদি, করিম, সালমা, দুলাভাই সবাই ভালো তো?'

'সব্বাই ভালো আছে। নে তুইও বসে পড়, তোর তো অর্ধেক খাওয়া হয়েছে। রণোদা,

হয়ে গেল?'

রণজয় বলে, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে। জিনা বসে পড়।'

সকালে খবরটা শোনে রণজয়ই। জিনিয়া তখন বাথরুমে। এই শীতেও ওর ভোরে চান করা চাই। রণজয় উঠে বসে। ও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। গতকাল ডেডলাইন পেরিয়ে যাবার পর ও যেন ধরেই নিয়েছিল ব্যাপারটা এভাবেই চলবে। একবার ভাবল এখনই জিনিয়াকে বলবে না কে জানে হয়তো ও ঘুম চোখে ঠিক শোনেনি। কিন্তু তাহলে তো সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বি বি সি-র নিউজ ক'টায়? বাংলাদেশেই বা খবর পড়ে কখন? জিনিয়া পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল, 'এম্মা, তুমি উঠে গেছ! জল বসিয়েছি, ফুল তুলে এনে চা করছি।'

চায়ের ট্রে নামিয়ে জিনিয়া বলল, 'দেরি হয়ে গেল? এ কী তুমি মুখ ধোওনি? অমন করে বসে আছ কেন?' রণজয় তবু বসে থাকে দু-হাতে মাথাটা চেপে।

জিনিয়া একটু ভয় পায় যেন, 'রণো? কী হল? অমন করছ কেন?'

রণজয় মুখ তোলে, 'শোননি জিনা — যুদ্ধ বেধে গেছে? আজই তিনটে চল্লিশে অ্যালায়েড ফোর্স হেভি বম্বিং শুরু করেছে বাগদাদে। ও-হো-হো জিনা কত লোক, কত নিরীহ লোক পোকামাকড়ের মতো মারা পড়বে জানো? আমি ভাবি না, সত্যিই ভাবিনি, ভাবতে পারিনি যে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই যুদ্ধটা লাগবে।'

জিনিয়া রণজয়ের হাতটা ধরে থাকে, ঈষৎ কাঁপতে থাকা চওড়া কবজিটা ধরে থাকে ওর পাতলা মুঠিতে। নীরবে।

'চা জুড়িয়ে গেল। তুমি মুখ ধুয়ে এসো, আমি হানিফভাইকে ডাকি।' জিনিয়া বলে।

'মৃম্-হুঁ, যাচ্ছি।' রণজয় ওঠে। জিনিয়া ট্রে-টা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়।

এই ঘরটা ছোট। আর ছোট বলে হয়তো জিনিয়া কাজ করতে করতে নিজের ভেতরে নিজে ডুবে যেতে পারে। যেন কোথাও যেতে পারে না বলে এখানেই ওর একটা অন্তর্প্রবেশ ঘটে। বিয়ের পর থেকেই ও এইরকম একটা একার জগৎ রচনা করতে শুরু করে। ঘরটাকে ও খানিকটা সাজিয়ে নিয়েছে। গ্যাসের বার্নারটা যেখানে সেই দেওয়ালটা স্লেট-পাথরের ভারি সুন্দর কালো। রাঁধতে রাঁধতে ও চক দিয়ে সেই দেয়ালে কখনও গানের লাইন বা কবিতার স্তবক বা চরণ লিখে ফেলে। কোনওদিন বা রান্নার মেনু লিখে আলপনা দিয়ে সাজায়। এই কালো দেয়ালের ওপরে চুনকাম করা শাদা দেওয়াল। তেলকালির ছিটে লাগবে বলে ও সেখানে দুটো পোস্টার লাগিয়েছে। পায়ে বল নিয়ে লিনেকার আর হ্যাল্যান্ডের গুলিটের একটা ছুটে যাওয়া মুহূর্তের ফোটোগ্রাফ। বাঁ দিকে তবু জায়গা থাকে। খবরের কাগজ থেকে কেটে সেখানে ও মেরিলিন মনরোর একটা ব্রোমাপ সেঁটে দেয়। দুই জানলার ওপরে গাভাসকার আর কপিলদেব। একটা লাফিয়ে ওঠা ঘোড়ার ছবি ক্যালেন্ডার থেকে কাটা।

আর একবার চায়ের জল চাপিয়ে ও মনরোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'মেরিলিন, দ্য ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ড উইল নট লেট মি লিভ ওলসো।'

'জিনি, তোর কোনও কাজের লোক-টোক নেই?' হানিফ এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায়।

'এতদিন তো ছিল না, মাসতিনেক হল একজন দয়া করে কাজ করছে।'

'মানে? তোর এই শরীর, মারা পড়বি যে!'

'মেয়েরা অত সহজে মরে না, বুঝেছ।'

'খুব বীরাঙ্গনা হয়েছিস।'

'হতে হয়েছে। পরিস্থিতির চাপে।' চা ছাঁকতে ছাঁকতে জিনিয়া আড়চোখে হানিফকে দ্যাখে।

'আসলে ব্যাপারটা কী জানো? এখানে কাজ করে বাউরিরা। আর তারা না-খেয়ে মরলেও মুসলমানের এঁটো কাপও ধোবে না।'

'বলিস কী?'

'এতদিনে একটা হিন্দুস্থানী বউ পেয়েছি। কাজ খুবই নোংরা তার ওপর চোর। কনফার্মড চোর। কিন্তু উপায় কী বল? ঘর মুছতে দিই না, বাইরে বাসন বের করে দিই। কাপড়ও তাই। আর বাগান ঝাঁট দেয়। চলো ওঘরে।'

ঠিক হয়েছে জিনিয়া হানিফের সঙ্গে বাড়ি যাবে। সিরাজুল সাহেব আর তাঁর স্ত্রী দু-জনেই বারবার বলেছেন রণজয় যেন জিনাকে নিয়ে হানিফের সঙ্গে আসে। সিরাজুল অসুস্থ না-হলে নিজেই আসতেন -- এভাবে যে মেয়ে-জামাইকে দাওয়াত দেওয়া উচিত নয় তা স্বীকার করে একটা চিঠিও দিয়েছেন রণজয়কে।

রণজয় অবশ্য এখনই যেতে রাজি হয় না। তাই এ ব্যবস্থা। 'ভালোই হল জিনা, এবার দেখ কোনও অসুবিধে হবে না তোমার। এখানে একটা কাজের লোকও যদি ঠিকমতো পাওয়া যেত। পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না। এই সময়, বুঝলে জিনা, তোমার মায়ের কাছেই থাকা উচিত।'

জিনিয়া চুপ করে থাকে। রণজয় নিজের মনেই বলে চলে, 'এসময় আমার ওপর তোমার ভরসা করা উচিত না, পৃথিবীটা যে কী ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে জিনা নইলে ভাবো টার্কি বলছে সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলতে দেবে। আজকের কাগজ দেখেছ? দেড়লক্ষ মারা গেছে কিংবা উন্ডেড হয়েছে। রাশিয়া পর্যন্ত চুপ করে আছে। পেরেস্ত্রৈকা হচ্ছে। টিভিটা খোল তো।'

জিনিয়া বলে, 'তুমি পরে যখন যাবে আমি তোমার সঙ্গে চলে আসব। আর আমি নিজেই পারব এসব সামলাতে, তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'এই তো তোমার মুশকিল জিনা, কিছু বললেই এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড় যে কোনও কথাই বলা যায় না।'

'এত বড় কঠিন কথা বলে দিলে তাও না? অন্য মেয়ে হলে কবে চলে যেত।'

'কী এমন কড়া কথা বলেছি জিনা যে চলে যাবার ভয় দেখাচ্ছ?'

'ভয় দেখাইনি তো। তুমিই বরং ভয় দেখাচ্ছ যাতে আমি চলে যাই।'

রণজয় উত্তর দেবার আগে জিনিয়া উঠে টিভিটা অন করে। টিভির শব্দে ওঘর থেকে হানিফ চলে আসে। দরজার কাছে জিনিয়ার কাঁধের ধাক্কা লাগে হানিফের বাহুতে।

'কীরে অত হনহনিয়ে চল্লি কোথায়?'

'কফি বানাতে। তোমরা খবর শোনো।'

খবর হয়ে গেলে হানিফ আর রণজয় অনেকক্ষণ কথা বলে না। হানিফ বুকে বালিশ দিয়ে বসে। চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মোছে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার পেছনটা একটু চুলকে নেয়। এটা ওর স্বভাব। কথা বলতে বলতে ও এভাবে অনাবশ্যক মাথা চুলকোয়। আর তাতেই বোধহয় ওর চুলগুলো, বেশ বড় বড় ঢেউ খেলানো, এলোমেলো হয়ে থাকে। হানিফের মুখ লম্বাটে, দু-পাশে একটু বেশি চাপা হওয়াতে আরও লম্বাটে দেখায়। সরু, টানা মেয়েলি ভুরুর নিচে মেয়েলি নরম চাহনির বড় বড় চোখ। রেগে গেলে বা বিরক্ত হলে ওর ভুরু যতটা কুঁচকে যায় চোখ কুঁচকে যায় আরও বেশি। আর ওর এই নিঃশব্দ রাগ বা বিরক্তির খবর একমাত্র জিনিয়াই সবচাইতে আগে পেয়ে যেত। হানিফের ঠোঁটের ভাঁজে আর চাহনিতে এক শান্ত, কঠিন ভাব যেন ওর স্বভাবের এক অনতিক্রমনীয় দূরত্বের ইঙ্গিত দেয়। তীক্ষ্ণ নাকের দু-পাশে আবছা দাগ -- চশমার। জুলপিতে সামান্য শাদার আভাসে ওকে বয়সের চাইতে পরিণত দেখায়।

ও বলে, 'রণোদা, চেহারাটা বেশ রেখেছ, মনেই হচ্ছে না দশ বছর পরে তোমায় দেখছি। আমার তো চুল পেকে গেল।'

রণজয় নিজের মস্ত থাবা দুটো নিজের সামনে মেলে ধরে, 'হানিফ, চিন্তাভাবনা কমিয়ে দিয়েছি। আমি তো বুঝি কাজ। স্রেফ পরিশ্রম। খাটো, খাও আর ঘুমোও। তুমি তো দুনিয়ার এক ইঞ্চি বদলাতে পারবে না তো কী হবে এসব আঁতলেমি করে? নইলে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পরেও এরকম একটা যুদ্ধ বাধে? এরকম একটা অন্যায়, অসম যুদ্ধ?'

হানিফকে যেন মুগ্ধতার পায়। রণজয়ের শক্ত সমর্থ পুরুষালি চেহারা, মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর অথচ কী অকপট সারল্যমাখা মুখশ্রী। ও বলে,'রণোদা তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। এ অবস্থায় জিনিকে একলা নিয়ে যেতে সাহস হচ্ছে না। রাস্তায় যদি শরীর-টরীর খারাপ হয়।'

'বুঝতে পারছি হানিফ, কিন্তু একে তো এই পায়ের জন্য এতদিন কামাই হয়ে গেল -- ছুটি-ফুটি অ্যাডজাস্ট করতে হবে। দিনকতক ডিউটি না করলে মুশকিল। তাছাড়া জিনার শরীরের কনডিশান মোটামুটি নর্মাল। হঠাৎ করে খারাপ হবে না। কিন্তু আমি ডিউটি গেলে ও একা থাকে খুব টেনশনে থাকি। তুমি আসাতে যে কী রিলিভ্‌ড ফিল করছি।'

'এইবার থলি থেকে বেড়াল বেরিয়েছে! সত্যি কথাটা স্বীকার করলে তাহলে যে আমি গেলেই বাঁচো?' জিনিয়া কফির ট্রে নামিয়ে রাখে। হানিফ একটা বিস্কুট তুলে নেয়, 'জিনিটা তেমনি ঝগড়াটেই আছে দেখছি। এক'টা বছর আমরা বেশ আরামেই ছিলুম রে জিনি!

রণোদা, বেচারির অবস্থা বুঝতে পারছি।' হানিফ একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। উত্তরে জিনিয়া মুঠি পাকিয়ে চোখ বন্ধ করে জিভ ভ্যাংচায়।

'বাজারের ব্যাগ-ট্যাগ দাও জিনা — আজ মাংস আনি। যা অবস্থা, আটা পাওয়া যাচ্ছে না, শুনছি আট টাকা কিলো হবে। তেল চল্লিশ — ওটা নাকি পঞ্চাশ হবে। ডাল চোদ্দ, পনেরো।'

জিনিয়া লকার থেকে টাকা বের করে রণজয়ের পকেটে গুঁজে দেয়। হানিফের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হানিফভাই তোমার রণোদাকে সামলাও। হঠাৎ এত হিসেব করতে বসলে তোমার হেল্প দরকার হবে। তুমি ত ইকনমিক্স পড়াও।'

হানিফ বলে, 'ওরে জিনি, সংসারের ইকনমিক্স বইপড়া বিদ্যেয় হয় না। ওটা তোরাই ভালো পারিস।'

'তাই?' জিনিয়া বলে। ডাইনিং-এর কোণে টাঙানো বাজারের ব্যাগ নিয়ে আসে। রণজয়ের হাতে দিয়ে বলে, 'জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে।'

'কী আনব বল?' রণজয় বলে।

'পারবে কমরেড, তিনমাসের চাল-ডাল-তেল-নুন আটা-ময়দা-চিনি-ঘি আনতে?'

'ওই নুনটা পারব, বাকিটা দেবী অসাধ্যসাধন।'

জিনিয়া হঠাৎ বলে, 'সত্যি কী হবে গো? আমরা তো হপ্তা হিসেবে বাজার প্রসারি সারি যদি ...? এ মাসে গ্যাস পেলাম আড়াই মাস পরে। কেরোসিনও পাওয়া যাচ্ছে না। তার ওপর কী লোডশেডিং। আচ্ছা, মোমবাতি কিনে এনো ত কয়েক প্যাকেট।'

এবারে হো হো হাসিতে ঘর কাঁপিয়ে দেয় রণজয়, 'তুমি মাইরি কী বললে? মোমবাতি? সব ছেড়ে নে শালা, এবার মোমবাতি স্টক কর। হানিফ শুনলে তো আমার বিবির কথা? মোমবাতি! হাঃ হাঃ।'

'ছি!' জিনিয়ার মুখ লাল হয়ে যায়। 'হানিফভাই-এর সামনে কী যা তা ল্যাঙ্গোয়েজ বলছ।'

'কী হল রণোদা, জিনিকে চটাচ্ছ কেন?' হানিফ উঠে আসে। রণজয়কে বলে, 'একটু ওয়েট করো, আমিও যাব। ফিরে এসে, জিনিটাকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে খবর শুনতে হবে।'

'খবর!' রণজয় একটা হতাশ ভঙ্গি করে। 'একমাত্র খবরের লোকেদেরই রমরমা। কী সব গপ্পো বানাচ্ছে — সাদ্দাম নাকি ছুরি দিয়ে নিজেই নিজের পায়ের বুলেট বের করে টাইগ্রিস সাঁতরে পার হয়েছিল। খবর খেয়ে যদি পেট ভরানো যেত।'

'কেন? না খেয়ে আছ নাকি? যাচ্ছ তেল পুড়িয়ে মাংস কিনতে — এসব নবাবি ছাড়।' হানিফ পোশাক পালটাতে যায়।

আজ সকালে রণজয় ফ্যাক্টরি গেছে। তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে যাওয়াতে জিনিয়া ভাবল দেরি হলেও একসঙ্গে খেতে দেবে ওদের। হানিফকে চানের তাড়া দেবার জন্য ও এঘর-ওঘর ঘুরল। কোথাও দেখতে না পেয়ে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে গলা চড়িয়ে ডাকল,

'হানিফভাই।' ওর মনে পড়ল ছোটবেলায় ও শুধুই 'হানিফ' বলত বলে কম বকুনি খায়নি আম্মার কাছে। শেষ পর্যন্ত ক্লাস নাইনে উঠে 'হানিফভাই'। 'ভাইসাহেব' বা 'বড়ভাই' ওর মুখ দিয়ে কোনও দিন বেরোল না। 'রক্তকরবী' পড়ার পরে ও নন্দিনীর 'পাগলভাই'-এর সুরে কথাটা বসিয়ে নেয়। আজ সেই সুরই বাতাসে ভেসে যায়। আর যেন কোনও বিস্মৃত জন্মের ওপার থেকে হানিফের গলা ভেসে এল, 'জি-নি-ই-ই-ই।'

দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল হানিফ। দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে ঝিরঝির হাসে। সেই হাসির অবগাহন থেকে জিনিয়ার কথা উঠে আসে, 'মনে আছে তোমার?'

হানিফ হঠাৎ হাসি থামিয়ে দেয়। ওর চোখে চোখ রেখে বলে, 'আমার সব মনে আছে রে জিনি। কিছুই ভুলিনি।'

'চান করবে না?'

'করব। বাড়িটা বেশ করেছিস। দোতলা কবে তুলবি?'

'একতলাতেই থাকার লোক নেই তো দোতলা। তাছাড়া এইটুকু করতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ওর বন্ধুরা জোর না করলে এটুকুও হত না। তবু এত ফাঁকা লাগে।'

'ফাঁকা রেখেছিস কেন? এতদিন তো তোদের বাচ্চা-টাচ্চা হওয়া উচিত ছিল।'

'ও তো চায়। চাইত। আমিই রাজি ছিলাম না।'

'কেন? মা হতে চাস না নাকি?'

'কী যে বাজে কথা বল — মা না-হতে চাইলে এখনই বা হচ্ছি কেন? আসলে তা নয়।' জিনিয়া থামে।

'থামলি কেন, বল?'

'কি জানো, একটা বাচ্চা হওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু বাচ্চাটা তো মানুষের বাচ্চা — তার জন্য কত ধ্যান, কত কেয়ার, কত আয়োজন দরকার বল তো?'

'সে তো ঠিকই। কিন্তু সে তো আজকাল সবাই করে।'

'তাও নয়। এই বাচ্চাটা তো আমাদের বাচ্চা — আমরা না-মানতে পারি কিন্তু সমাজ? ধরো ও যদি মেয়ে হয় ওর বিয়েটাই তো সমস্যা হবে।'

'পাগল হয়েছিস নাকি তুই? তোরা দিব্যি দশবছর কাটিয়ে দিলি আর তোর বাচ্চা বড় হতে হতে সমাজ আরও পালটে যাবে। ও তো হবে টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির ছেলে কিংবা মেয়ে।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু এই পরিবর্তনটা তো সত্যি সত্যিই ততটা হয়নি যতটা তুমি বলছ।'

'কেন তোদের সেরকম কোনও প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। আমার জন্য রণোর সব গেছে — বিনিময়ে ওকে একটা বাচ্চাও দিতে চাইনি আমি। আবার এও জানি একটা বাচ্চা থাকলে তার সমস্যাগুলো আমাকেই একা সামলাতে হত। তোমার জাহাঙ্গীরকে মনে আছে?'

'হ্যাঁ, কেন? সে তো বারাসত না বসিরহাট কোথায় যেন পড়ায়?'

'ও তো পূরবীকে বিয়ে করেছিল। পূরবীকে ওদের বাড়ির সবাই মেনেই নিয়েছিল, কিন্তু পূরবী পারছে না। দুটো ছেলে হয়ে গেছে এখন ও কী করবে বল? আমাকে চিঠি লিখেছে এই ঘরে বসে থাকার জন্য এত বিপ্লব করে বিয়ে করাটাই ওর ভুল হয়েছে। ওদের বাড়িটা তো তেমন নয়।'

'তা তোরও কি সেই সমস্যা?'

হানিফের গলায় কৌতুক লক্ষকরে জিনিয়া দুম দুম পা ফেলে ঘরের দিকে যায়। হানিফ প্রায় দৌড়ে ওর হাত ধরে ফেলে। দু-কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে ঘুরিয়ে দেয় ওকে নিজের দিকে। বলে, 'সত্যি করে বল জিনি তুই কেমন আছিস?'

জিনিয়া টের পায় ওর মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। ও আরও আস্তে কাঁধের ওপর থেকে হানিফের দুই হাত নামিয়ে দেয়। চোখ নিচু করে, যেন স্বগত ভাষণ, বলে, 'আমি খুব ভালো আছি হানিফভাই — রণো আমাকে কোনও কষ্ট দেয় না।'

টেলিভিশনের সামনে বসে আছে হানিফ। জিনিয়া পর্দা সরিয়ে মুখটুকু বাড়িয়ে বলল, 'কি আজ তোমরা নাস্তা করবে না নাকি?'

'কেন রণোদা কোথায়?'

এবারে জিনিয়া ভেতরে আসে। হাত নেড়ে বলে, হানিফ দ্যাখে ওর আঙুলে ময়দা লেগে আছে তখনও, 'সে তো গেছে বাংলা কাগজ পড়তে — কি নাকি ভালো ভালো গপ্পো বেরোচ্ছে — এসে দেখবে কেমন ডেসক্রিপশন দেবে— ইরাকিদের কত ট্যাঙ্ক আছে, কীরকম সব বাঙ্কার আর বাংলাদেশে নাকি যত বাচ্চা জন্মাচ্ছে সবার নাম সাদ্দাম এইসব। আর তুমি তো স্থানুবৎ একবার রেডিও, একবার টিভি-র সামনে বসে আছ তো বসেই আছ।'

হানিফ মজা পায়। বলে, 'তোর ছেলে হলে নাম রাখিস সাদ্দাম।'

'বয়ে গেছে। আমি অত গড্ডলিকা স্রোতে ভাসি না।'

'তবে কি বুশ? এবারে নোবেল প্রাইজ ও-ই পাবে।'

'ইয়ার্কি কোরো না। আমি তো ভেবেই পাই না একটা সত্যিকারের যুদ্ধ লোকে টিভি-তে দেখছে কী করে?'

'রান্নাঘর বাদে তুই তো কিছুই জানিস না। যুদ্ধের ব্যাপার তুই কী বুঝবি? শুনছি কলকাতায় বিস্তর লোকে ডিশ অ্যান্টেনা বসিয়েছে যুদ্ধ দেখবার জন্য। সতেরোই জানুয়ারি থেকে টিভি-র নতুন সিরিয়াল -- দ্য ওয়ার ইন গালফ অর দ্য গালফ ইন ওয়ার। ঠাট্টা নয় জিনি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টেলিভাইজড ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ড।'

'একটা পটকা ফাটলে যারা কানে আঙুল দেয় কি খাটের তলায় ঢোকে তারাই এসব দ্যাখে। ছি! মানুষ কোথায় নেমেছে?'

'এত রেগে যাস কেন জিনি? এটা হল হাইটেক ওয়ার তো আমরা দেখব না? এখন তো আমরা খাওয়ার টেবিলে বসে মাংসের হাড় চুষতে চুষতে সপরিবারে একটা সত্যিকারের

খুন কি রেপ দেখতে পারি ইস উস করতে করতে তা এটা দেখব না? চোপড়ার মহাভারতের ঠং ঠং ফাঁপা গদাযুদ্ধ কত পানসে বল তো?'

টিভি-র সুইচ অফ করে দেয় জিনিয়া। বলে, 'কিন্তু ভারতবর্ষে, হানিফভাই, ওই গদাযুদ্ধটাই বোধহয় টিকল। এই ভারতবর্ষে আমার ছেলে বা মেয়ে কোথায় থাকবে? ভারতবর্ষ কি তাকে স্বীকার করবে? সে কি ভারতবর্ষকে স্বীকার করতে পারবে?'

'ও, তবে এটাই তোর ভয়। এই ভয় তো আমাদের সবারই আছে জিনি। তুই তো তবু চেষ্টা করেছিস। আমি তো তাও সাহস পাই না।'

উত্তরে জিনিয়া হানিফের একগোছা চুল মুঠো করে ধরে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'একা একা থেকে তোমার মাথাটা গেছে। এবার একটা বিয়ে করো।'

'তেমন মেয়ে কই যে-আমায় বিয়ে করবে?'

'তুমি কি হিন্দু মেয়ে বিয়ে করতে চাও? কেন এখন তো অনেক মুসলিম মেয়ে বি এ এম এ পাশ করছে আরও নানা দিকে যাচ্ছে। এত হিন্দু হিন্দু কর কেন? হিন্দুর মতো হলেই কি মুসলমানরা উদ্ধার পাবে? হিন্দুদের মধ্যে কোনও কুসংস্কার নেই ভাবছ?'

'তবু আমাদের ব্যাকওয়ার্ডনেস অনেক বেশি।' হানিফ বলে।

'তাহলে তো আরও বেশি করে এই সমাজের ভেতরে ঢুকতে হবে। মনে রেখো হানিফভাই হিন্দুদেরই সতীদাহ ছিল মুসলমানের নেই। মেয়েদের ওপরে অত্যাচার হিন্দু পুরুষরা কিছু কম করেনি। বিধবাদের কথা ভুলে গেছ?' জিনিয়ার মুখ লাল হয়ে যায়।

'তুই এত ভাবিস জিনি? তাহলে.... ' হানিফ কথাটা শেষ করে না।

হানিফের চুলে আবার ঝাঁকুনি দেয় জিনিয়া। মুচকি হেসে বলে, 'রণো মুসলমান হলে আমি খুশি হতাম হানিফভাই। কিন্তু ও হল কমিউনিস্ট তাই আমার দুঃখ নেই। তবে কিনা হিন্দু কমিউনিস্ট।'

'হিন্দু কমিউনিস্ট মানে?' কবজি ধরে জিনিয়ার হাতখানা নামিয়ে আনে হানিফ। ওর হাতের উষ্ণতা তাপের ধর্মেই জিনিয়ার ক্রমে শীতল হওয়া হাতে প্রবাহিত হয়। কিছুক্ষণ এভাবেই কাটে। শরীরের এই তাপ বিনিময়েই যেন অনেকখানি বলা হয়ে যায়। 'কই বললি না তো হিন্দু কমিউনিস্ট কী বস্তু?'

হাতটা একরকম মুচড়েই ছাড়িয়ে নেয় জিনিয়া। বলে, 'জানো না? হিন্দু কমিউনিস্ট কালীপুজো করে। সে পুজো বারোয়ারি হলে চাঁদা না দিলেই তুমি প্রতিক্রিয়াশীল, আর মুসলমান কমিউনিস্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে সে কাফের।' হানিফ কী যেন বলতে চায়, জিনিয়া বলে, 'আমি জানি তুমি কী বলতে চাইছ — এর বাইরে যারা আছে যারা এসব মানে না তারা সংখ্যায় অল্প আর তাদের মানা না-মানার ওপর কিস্যু নির্ভর করে না। এমন-কি তাদের মা কিংবা বউ যদি এইসব রিচ্যুয়ালস মানে তারা অখুশি হয় না।'

'তাহলে মুসলমান হয়ে তুই লক্ষ্মীপুজো করিস কেন?'

জিনিয়া হাসে। তারপর তেমনি মুচকি হেসেই বলে, 'আমার ভালো লাগে। খুব ভালো

লাগে, ধূপ, ধুনো, ফুলের গন্ধের মাঝখানে সমর্পিত চিত্তে বসে থাকতে। আমি যে কোনও একটা বিশ্বাস ধরে রাখতে চাই — সেই বিশ্বাসের ভূমিতে আমার সন্তান জন্মাবে, দাঁড়াবে। হাঁটবে। ওই যে রণো এসে গেছে, খাবার নিয়ে আসি। আজ কচুরি আর আলুর দম।'

'তোমার হানিফভাই-এর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?' রণজয়, মশারির ভেতর থেকে মাথাটা বের করা, গলা পর্যন্ত কম্বল টানা, কাগজে চোখ রেখেই বলে। জিনিয়া ওষুধ খাচ্ছিল বলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না। জল খাওয়ার সময় ওর গলা দিয়ে যেন জল নেমে যাওয়া দেখা যায় এতই পাতলা চামড়া ওর। গ্লাসটা উঁচু করে অল্প অল্প করে জল খায় জিনিয়া। ওর খোঁপাটা এত বড় যে পেছনদিকে সামান্য হেলানো মাথা আর কাঁধের মাঝখানে শুধু খোঁপাটাই থাকে, যেন খোঁপার জন্যই মাথাটা আর হেলতে পারে না। জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে ঢেকে রাখে জাগের পাশে। একটা ছেঁড়া তোয়ালে দিয়ে পা মুছতে মুছতে বলে, 'হঠাৎ এ কথা?'

'— না, ও পরশু যাবে বলছিল। আমি সাতাশে যেতে বলেছি। রোববার আমি ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারব।'

'ট্রেনে তুলে দেবার দরকার কী?'

'তুমি কি কিছুতেই সহজ হবে না জিনা? এত অ্যাটাক করে কথা বলছ কেন?'

'তুমিই তো শুরু করলে 'তোমার হানিফভাই' দিয়ে। হানিফ কি তোমার চেনা ছিল না? ও আসাতে তুমি কি খুশি হওনি?'

'কী মুশকিল, খুশি হব না কেন? তবে তুমি একটু বেশি খুশি হয়েছ।'

'মানে?'

'মানে-টানে কিছু নেই। তুমি কত একা থাক — তাই।'

'আমি কোনওদিন কিছু বলেছি তোমাকে?'

'না বললেও বোঝা যায় জিনা।'

'না যায় না। অন্তত তুমি তা বোঝ না। বুঝলে .....।' কথাটা শেষ করে না জিনিয়া। লাইট নিভিয়ে বিছানায় ঢোকে।

'আলোটা নেভালে যে? দেখছ না পড়ছি।'

'ঝগড়া করবার জন্য আলো দরকার হয় না।'

'ঝগড়া কে করছে?'

'আমার খুব ঘুম পেয়েছে রণো।'

'ঘুমের আর দোষ কী — সারাদিন যা বকবক করছ।'

'শুধু বকবকটাই দেখলে?'

খসখস শব্দে রণজয় বোঝে জিনিয়া ওপাশ দিয়ে মেঝেতে নামল। আলো জ্বেলে কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে চোখের ওপর হাত চাপা দেয় ও।

'একটা বেড সুইচ করা দরকার।' রণজয় বলে।

'তোমার তো দরকারের শেষ নেই।'

'আমার দরকারের জন্য বলিনি জিনা— তোমার কত কষ্ট হয়।'

'আমার কষ্ট? আমার দরকার? কোনওদিন জানতে চেয়েছ এসব আমি চাই কি না?' জিনিয়া পেটের ওপর হাত রাখে। রণজয় কাগজ রেখে জিনিয়ার হাতে হাত রাখে।

'তোমার কী হয়েছে জিনা? আমাদের ইচ্ছে আর দরকার কি আলাদা?'

'না, একটুও আলাদা নয় রণো — তোমার ইচ্ছেটাই আমার ইচ্ছে, তোমার দরকারটাই সব সময় আমার দরকার।' জিনিয়া আবার চোখে হাত চাপা দেয়। রণজয় বোঝে জিনিয়া আর একটা কথাও বলবে না। অথচ ওর হাতের তলায়, ওর বিশাল করতলের ত্বকে জিনিয়ার গর্ভের সন্তান লাথি মারে। নড়েচড়ে। সেই ভাষা রণজয় বোঝার চেষ্টা করে। জিনিয়া ওপাশ ফেরে। রণজয় উঠে জল খায়। বাথরুমে যায়। আলো নেভায়। অন্ধকারে দু-হাতের ওপরে মাথা রেখে চিত হয়ে তাকিয়ে থাকে শূন্যতায়।

কিন্তু অন্ধকার তো অন্ধকারই। শূন্যতাও তো শূন্যতাই।

•

খিচুড়ি খেতে খেতে হানিফ বলে, 'জিনিরে, তুই তো সেন্ট পার্সেন্ট ভটচায গিন্নি হয়ে উঠেছিস! আমাদের রান্না ভুলে গেলি নাকি?'

রণজয় বলে, 'জিনা কিছুই ভোলেনি হানিফ, আর ক'টা দিন থেকে যাও — বিরিয়ানি থেকে ফিরনি পর্যন্ত খাওয়াবে। তখন কথাটা ফিরিয়ে নেবে।'

'না, না, রণোদা কালকেই যাব। বাড়িতে বলে এসেছি খুব বেশি হলে সাতদিন আর আজ দশদিন হল। বাপ্‌স্ এ যে প্রায় একজীবন কাটিয়ে দিলাম।'

'এত বোর হয়ে গেছ নাকি?' রণজয় বলে।

'বোর আর হতে দিচ্ছ কই? তোমার যা পাবলিক রিলেশন। ভালোই অবশ্য জিনিটারও সময় কাটে।'

'এই নাও কাগজ এসে গেছে।' জিনিয়া কাগজ দিলে রণজয় বাঁ হাতে কাগজ খুলে পড়তে শুরু করে, 'তেল আবিভ হিট এগেইন। সাদ্দাম ইন ফুল কমান্ড অ্যাডমিট অ্যালিজ। এই রে, সর্বনাশ। দেখ কাণ্ড — ইরাক বিগিনস ব্লোইং আপ কুয়েতি অয়েল ফিল্ডস! কী হবে বুঝতে পারছ? এ যে রাবণের চিতা! ভাবো ত হানিফ, এইটুকু, এই অ্যাত্তুকুনি আমাদের এই পৃথিবী, তাতে এই আগুন জ্বললে মানুষ বাঁচবে কী করে?'

'কিন্তু এরকম একটা হুমকি তো সাদ্দাম আগেই দিয়েছিল।' হানিফ বলে।

'অমন হুমকি অনেকেই দেয় কিন্তু সত্যি সত্যিই কি তা করা উচিত? সভ্যতার এত বড় সর্বনাশ!'

'এটা তো আত্মরক্ষা রণোদা। শান্তির নামে সভ্যদেশ আমেরিকা আর তার বাহিনী যা করল সেটাও তো ডেডলাইন পর্যন্ত হুমকিই ছিল। বাট ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড। তোমার রাশিয়াও

তো নীরব সমর্থন করল।'

'তুমি কি কুয়েত-দখল সমর্থন কর?' রণজয় কাগজে চোখ রেখেই বলে।

'এটা সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না। কুয়েত কী করল? ঝপ করে তেলের দর নামিয়ে দিল, এদিকে আট বছর ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে ইরাকের ইকনমি ভেঙে পড়েছে। ওদের তো তেলই ভরসা।'

'বাঃ বাঃ তুমি দেখছি সাদ্দামকে হিরো বানিয়ে ফেলেছ। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমেরিকান ইম্পেরিয়ালিজমকে নিশ্চয় সাপোর্ট করি না, এমনকি কেউ যদি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তোলে আমি তাকেই সাপোর্ট করব, কিন্তু এটা ইউ এন এ-র প্রস্তাবে পৃথিবীর আঠাশটা সভ্য দেশের বাহিনী — নট আমেরিকান ইম্পেরিয়ালিজম।'

'ওটা তো হুডডইঙ্কিং। যাই বল রণোদা এই নপুংসকের দুনিয়ায় তবু একজন বীর আছে।' হানিফ বলে।

'কে যে বীর বলা কঠিন।' রণজয় খেতে শুরু করে।

'কেন পিপল যাকে বলছে।'

'পিপল-এর কতটুকু শক্তি হানিফ? পারল যুদ্ধটাকে ঠেকাতে? বিশ্বজনমত এক কথায় রেপ করেই তো যুদ্ধ। যুদ্ধ যারা বাধায় তারাই থামায়। নিজেদের প্রয়োজনে। এই হাইটেক-এর যুদ্ধে পিপল-এর কোনও শক্তি নেই — দে আর চেইনড্।'

'সে কি রণোদা, তুমি না নকশাল ছিলে। তুমি কমিউনিস্ট হয়ে একথা বলছ?' হানিফ জিনিয়ার দিকে তাকায়, 'ছি ছি, জিনি তুই খেতে বসিসনি কেন?'

'সেই থেকে যা যুদ্ধ লাগিয়েছ তোমরা। চাটনি দিই?' জিনিয়া চাটনি আনতে গেলে রণজয় টিভি খোলে। সুইচ অন করার সাথে সাথে টিভি-র পর্দায় সংবাদপাঠিকার মুখটা দুলতে থাকে।

'খেজেরিকা আবার লো ভোলটেজ শুরু হল — বাস্টার্ড।' শেষ শব্দটা মুখ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে রণজয় নিজেই অবাক হয়ে গেল।

•

তারে ধুতি মেলছিল হানিফ, জিনিয়া বলে, 'আমাকে দিলেই তো কেচে দিতাম।'

'তোর এই অবস্থা, শেষে কি খুনের দায়ে পড়ব? তাছাড়া আমি হলাম 'পুরিয়া' — নিজ হাতে করি কাজ পার্টি, সেল্ফ হেল্প কথাটার জীবন্ত প্রতীক।'

হানিফ নরেন্দ্রপুরের ছাত্র। ওখানকার পুরনো ছেলেরা নিজেদের বলে 'পুরিয়া'। হানিফের পরোপকার করাটা প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পড়ে বলে জিনিয়া মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত 'পুরিয়া কল্যাণ'।

'শার্ট-প্যান্ট পরছ কবে থেকে?'

'কলেজে পড়াতে গিয়ে। বাসে-ট্রামে বুঝলি ধুতি-পাঞ্জাবি অচল। ধুতি-শার্ট সেকেলে

বাংলা সিনেমার হিরো হিরো। জনারণ্যে মিশিবারে চাই, শার্ট-প্যান্ট ধরিয়াছি তাই।'

'রণোর ছোঁয়া লেগেছে, অকবির কবিতা।'

'তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিস, কাল ভোরের ট্রেনেই যাব।'

'ভাবছি যাব না।'

'সে কী? কেন?' উত্তর না দিয়ে জিনিয়া চলে যায়। ও ঠিক বুঝতে পারল না হঠাৎ এরকম কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগেই ও কথাটা বলল কেন? এই দশ বছরে কি ওর আগের বিশ বছরের জীবন মুছে গেছে, নাকি তার উলটো বলেই ও যেতে চায় না? রণজয় কি পারবে ওকে ওর সন্তানকে রক্ষা করতে? গোটা দুনিয়ার মানুষের জন্য যে-লোকটা দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছে ছোট্ট একটা প্রাণের জন্য তার কোনও উদ্বেগ জিনিয়া তো টের পায় না? এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস বিববাষ্পে ভরে উঠছে, এই ভূমি পাথর হয়ে উঠছে — সেই পাথর রক্তে রক্তে পিচ্ছিল, কোথায় ভূমিষ্ঠ হবে সেই মানবসন্তান যার জাত নেই, দেশ নেই, ঐতিহ্য নেই? এই ভালোবাসাহীন পৃথিবীতে এই শিশু বড় হবে কী করে? জিনিয়ার মনে হয় তার শিশু গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত না হলেই ভালো। মাতৃগর্ভের মতো নিরাপদ ভূমি আর কোথায় আছে? রান্নাঘরের দেয়ালে ও লিখে রাখল — 'এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা।'

'তুমি নাকি হানিফকে বলেছ যাবে না?' রণজয় বলে, 'হঠাৎ ডিসিশন চেঞ্জ করলে যে?'

জিনিয়া শুয়ে পড়েছিল। আজ এবেলা রান্নার ঝামেলা নেই। ফ্রিজ থেকে বের করে গরম করে নিলেই হবে। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে ওর। ঘাড় নাড়াতেও কষ্ট। রণজয় আলো জ্বাললে ও চোখে হাত চাপা দেয়।

'ডিসিশন তো তুমি নিয়েছিলে— আমি না। বরং আমি আজকে ডিসিশন নিলাম।'

'উফ্, জিনা, জিনা, কেন এত বেঁকিয়ে কথা বলছ? আজ একটা সাইকেলকে প্রায় ধাক্কা দিয়েছিলাম।'

'সে কী! তুমি কি একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না? তাই বুঝি এত দেরি হল?'

'না, না, বেশি ঝামেলা হয়নি। ফার্স্ট এইডেই কাজ হয়েছে।'

'কই দেখি?' জিনিয়া রণজয়ের দিকে তাকায়।

'এই সামান্য লেগেছে, কনুই-এর কাছে আর পায়ে।'

'আবার পায়ে? তোমাকে নিয়ে কী যে করি? এলে কী করে?'

'বলছি তো কিছু হয়নি। ওই রাস্তাটা ক্রশ করে নালায় পড়েছিলাম। তারপর নিজেই তো উঠে স্কুটার থামালাম। তুললাম। দোকানদারগুলো খুব ভালো, বুঝলে জিনা, গরম-গরম দুধ খাওয়াল একগ্লাস। এখন একেবারে ও কে। কিন্তু তোমার কি শরীর খারাপ? অসময়ে শুয়ে?'

'রণো, হাত মুখ ধুয়ে একটু আমার কাছে বসো, আমার ভালো লাগছে না।'

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল হানিফের। চোখ খুলে দেখল খাতায় কালি গড়িয়ে পড়ার মতো অন্ধকার ঢুকে পড়েছে ঘরে। বুঝল, আলো নেই কোথাও; নইলে জানলার পর্দায় এদিক-ওদিক দিয়ে আলো আসে। এ জায়গা আগে নাকি ধু ধু মাঠ, এখানে বলে ডাঙাল, ছিল। এখন দেখলে মনে হবে সল্ট লেক। বড় বড় বাড়ির মালিকের ভয়ও বেশি তাই প্রায় প্রতিটা বাড়ির সামনেই আলো জ্বলে। সারারাত। রাত এগারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত পাহারাঅলাদের হাঁক শোনা যায়।

বালিশের পাশ থেকে টর্চ নিয়ে ও ঘড়ি দেখল — সাড়ে তিনটে। জিনিয়া বলেছে ও যখন যাচ্ছে না তখন হানিফ খেয়েদেয়ে দুপুরের গাড়িতেই যাবে। হানিফ পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল। এমনিতেও ও দেরিতে ওঠে। শুতে শুতে রাত একটা-দেড়টা হয়ে যায়। রাত ছাড়া পড়াশুনো করার নির্জন অবসর কই আর?

শেষ পর্যন্ত জিনিয়া না-যাওয়াতে হানিফের প্রথমে খারাপ লাগলেও হানিফ বুঝেছে এ একরকম ভালোই হল। যে-সম্পর্কের কোনও ভবিষ্যৎ নেই সেই সম্পর্ক তৈরি করার যন্ত্রণার চাইতে সেই সম্পর্ক রক্ষা করার যন্ত্রণা প্রায় সহনাতীত। কিন্তু এই দশটা বছর কি জিনি ওকে ভুলে ছিল? দু-জনে একসঙ্গে বড় হয়েছে পাশাপাশি, কত সকাল-সন্ধ্যা-দুপুরের স্মৃতি ঘন হয়ে আছে ওদের দু-জনকে নিয়ে তবু জিনিকে এত অচেনা মনে হয় কেন ওর? জিনির শাদিও তো এমনি এক অচেনা ব্যাপার, কিন্তু একমাত্র জিনিই তো পারে নিজের জন্য এমন এক রহস্যময় জীবনচরিত রচনা করতে।

একমাত্র টেবিল ল্যাম্পটা জিনিয়া এ ঘরেই রেখে গেছে। ও রাতে পড়াশুনো করে এটা জিনির এখনও মনে আছে। এমনকি ও চায়ে দু-চামচ চিনি খায় সেটাও। কিন্তু জিনিয়া বলে এটা নাকি কোনও স্পেশাল ব্যাপার নয়। এরকম ছোটখাট ব্যাপার মনে থাকে বলেই নাকি ওর বড় কিছু করা হল না। জিনিয়াকে বুঝতে পারে না হানিফ। জিনিয়ার সত্যিমিথ্যেও বুঝতে পারে না ও।

হঠাৎ ঘরের অন্ধকার পাতলা হয়ে যাওয়াতে হানিফ বুঝল আলো এসেছে।

টেবিলে একটা গ্লাসে জল ঢাকা দেওয়া। গ্লাস তুলে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে ফেলল হানিফ। তখুনি দরজায় শব্দ পেল ও।

'হানিফ? হানিফ? দরজা খোল।'

'রণোদা? খুলছি।' টেবিল থেকে চশমাটা নিয়ে আলো জ্বেলে দেয়। চাদরটা জড়িয়ে বাইরে আসে। রণজয় উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে।

'কী হয়েছে রণোদা? জিনি কই?'

'জিনার খুব জ্বর হানিফ — আর অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। পেট ব্যথা করছে। তুমি একটু ওর কাছে থাকো, আমি ডাক্তার সেনকে নিয়ে আসি।'

'চলো দেখি। জ্বর দেখেছ?'

'একশো চারের ওপর। কী হবে হানিফ?'

মুহূর্তে যেন সৈনিকের তৎপরতা পায় হানিফ। বাথরুম থেকে এক বালতি জল নিয়ে যায়। রণজয়কে বলে, 'ধরো তো, আস্তে করে ওকে ঘুরিয়ে দাও, মাথায় জল দিতে হবে। আইস ব্যাগ আছে? নেই? আচ্ছা তোয়ালেটা দাও।'

খানিকক্ষণ জল ঢালার পর জ্বর দেখে হানিফ।

'রণোদা, ডাক্তারের বাড়ির ডিরেকশান দাও আমি যাই।'

'না, না, আমিই যাই, ততক্ষণ হানিফ, আমার জিনা থাকবে তো?'

'ওসব ভেবো না। আমি রইলাম।' রণজয়ের হাতে চাপ দেয় হানিফ। রণজয় আলো জ্বালাতে জ্বালাতে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। ওর স্কুটারের আওয়াজ মিলিয়ে গেলে হানিফ জিনিয়ার কপালে রুমাল দিয়ে জলপটি দেয়? হঠাৎ জিনিয়ে গোঙায়, 'রণো, কোথায় তুমি? আমার খুব শীত করছে।' বলতে বলতে ওর কাঁপুনি শুরু হয়। হানিফ কম্বলটা ওর গলা পর্যন্ত টেনে দেয়। পাশের কম্বলটাও দেয়। তাতেও কাঁপুনি কমে না দেখে ওঘর থেকে নিজেরটাও নিয়ে আসে। তিনটে কম্বলের তলায় তবু জিনিয়ার শরীর কাঁপে। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকে, 'জিনি?'কোথায় কষ্ট?'

কাঁপতে কাঁপতে জিনিয়া চোখ খোলে। আরক্ত। হানিফ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। জিনিয়া দু-হাত উঁচু করে হানিফের হাত জড়িয়ে ধরে, 'হানিফভাই? ভাইসাহেব? আমার শরীর কাঁপছে কেন? আমার বাচ্চা?'

'তোর বাচ্চা আছে জিনি।'

'কই?' এত ভয় পায় জিনিয়া যে হানিফের দুটো থরথর হাতই রাখে ওর পেটের ওপর। হানিফ কিছু দেখতে পায় না-- ওর নিজেরই অশ্রুবাষ্পে ওর দৃশ্যমান যা কিছু সব পূর্ণ-- জিনিয়ার আরক্ত ব্যাকুল দৃষ্টিও ওর চোখে পড়ে না। সৃষ্টির উষালগ্নে হয়তো এমনই ছিল ভুবন, এমনই অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ-- সেই দৃশ্যের তো কোনও দর্শন থাকে না, শুধু এক বিপুল ও তীব্র অনুভব থাকে। সেই অনুভবে হানিফ টের পেয়ে যায় জিনিয়ার গর্ভ এখনও সৃষ্টি আর নির্মাণের উদ্যোগে বিহ্বল। সমস্ত শরীর মথিত করে যে-আবেগ উঠে আসে প্রাণপণ চেষ্টায় ও তাকে নামিয়ে আনে বামহাতের ব্যাকুলতায় জিনিয়ার কান্নাভেজা কম্পিত চিবুক আর গালের ওপর। ডান হাত দিয়ে কম্বলগুলো চেপেচুপে দেয়।

হানিফের মনে হয় কয়েক শতাব্দী কেটে যায় বুঝি-- গাড়ির আওয়াজ আর কয়েক জোড়া দ্রুত পদশব্দ ওকে ইন্দ্রিয় সচেতন জগতে ফিরিয়ে আনে। ও রুমালটা আবার ভিজিয়ে জিনিয়ার কপালে দেয়। ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ আর চশমার কাচ মোছে।

রণজয়ের পেছন পেছন মধ্যবয়সি ডাক্তারবাবু ঢোকেন। দু-জন মহিলা পুরুষদের একরকম ঠেলেই জিনিয়ার কাছে আসেন। জিনিয়ার শরীরের কাঁপুনি কমলেও থেকে থেকে অল্প কেঁপে ওঠে। ডাক্তার স্টেথো লাগান। নাড়ি দেখেন। কম্বল সরিয়ে পেটেও স্টেথো দেন। জিনিয়া অস্ফুটে 'উঃ' করে ওঠে। প্রেসারের যন্ত্রটা বের করে ডাক্তার ওর হাতে পটি

বাঁধেন। হাঁ করিয়ে জিভ দেখেন।

রণজয় জিনিয়ার মুখের উপর ঝুঁকে বলে, 'জিনা?' ওর গলা ভেঙে যায়। জিনিয়া ফুঁপিয়ে উঠতে ডাক্তার বলেন, 'একদম উত্তেজিত হবেন না। মিঃ ব্যানার্জি আপনি শান্ত হন। এঁকে হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে। ইমিডিয়েট।'

'ভয়ের কিছু নেই তো?' রণজয় ভয়ে ভয়েই জিগ্যেস করে। সেই সময় জিনিয়া, 'আ আ' দীর্ঘস্বরে যন্ত্রণায় মুচড়ে যায়। 'পানি, পানি দাও।' হানিফ দৌড়ে একটা চামচ নিয়ে আসে। ওর ঈষৎ হাঁ-মুখে জল দেয় দু-তিন চামচ।

'অ্যাম্বুলেন্সকে ...' রণজয় কথাটা পুরোপুরি শেষ করার আগে ওর সঙ্গে আসা একজন বলে, 'দীপককে ফোন করতে বলেছিলাম। ও এইমাত্র খবর দিয়ে গেল একটা অ্যাম্বুলেন্সের অ্যাক্সেল ভেঙেছে, আর একটা নেই। ও ট্যাক্সি আনতে গেল।'

ডাক্তার বলেন, 'একটু ওয়ার্ম ওয়াটার দিন তো একটা ওষুধ খাইয়ে দিই, তাতে ইমিডিয়েট খানিকটা রিলিফ হবে।'

হানিফ আবার দৌড়ে যায়। যেতে যেতে বলে, 'রণোদা, জিনির জামাকাপড় গুছিয়ে দাও।'

জিনিয়াকে রণজয় একাই পাঁজাকোলা করে ট্যাক্সির কাছে নিয়ে আসে। দরজা খুলে দীপক বলে, 'তুমি ওঠো, আমি আর হানিফসাহেব ধরছি।' হানিফ উঠে জিনিয়ার পা-দুটো কোলে নেয়। রণজয়ের কোলে জিনিয়ার মাথাটা উঁচু হয়ে থাকে। মহিলা দু-জন ব্যাগ আর জিনিয়ার শাল দিয়ে দেন। একজন, বয়স্ক, বলেন, 'চিন্তা করবেন না আমি রইলাম আপনাদের না-ফেরা পর্যন্ত। বন্দনা বরং যাক সঙ্গে।' রণজয় বলে, 'না বউদি, আপনারা বরং পরে আসুন।'

ডাক্তারের স্কুটারের পেছনে দীপক ওঠে। আরও কয়েকটা স্কুটার আর মোটর সাইকেল স্টার্ট নেয় ট্যাক্সির সামনে। দু-পাশে। পেছনে।

হানিফের তপ্ত মুঠোয় ধরা জিনিয়ার বরফ-ঠাণ্ডা পায়ের পাতা কুঁকড়ে যায় যন্ত্রণায়। হানিফ মাথা নিচু করে যেন ওর আটকে রাখতে না পারা ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু দিয়ে জিনিয়ার শরীর ধুইয়ে দেবে। এত জোরে ওর হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত আর প্রসারিত হয় যেন পাঁজর ভেঙে ওর সমস্ত রক্ত বেরিয়ে আসবে — বিশুদ্ধ ও উষ্ণ জীবনদায়ী রক্তস্রোত। ওর ফুসফুসের সমস্ত বাতাস যেন ওর শরীর নিতে চায় না — শুধু দিতে চায় এই ভাবী জননীকে।

জিনিয়া নড়ে ওঠে, 'রণো? হানিফ, আমার বাচ্চা?' বাকিটুকু ওর নিজেরই গোঙানিতে চাপা পড়ে যায়।

রণজয় আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে। জিনিয়ার কপাল থেকে খুচরো, লেপটে থাকা চুল সরিয়ে দেয়। মন্ত্রের ধ্বনির মতো ওর কণ্ঠ বেজে ওঠে।

'কোনও ভয় নেই জিনা। আমরা সবাই আছি।'

হানিফ বাঁ হাত দিয়ে রণজয়ের বাহু স্পর্শ করে। প্রতিধ্বনির মতো ও বলে ওঠে,

'কোনও ভয় নেই জিনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আপাতত এই আশ্বাসটুকুই ওরা যৌথভাবে দিতে পারে। যেন ওরা নিজেরাও পেতে চায় এমন কোনও মন্ত্রের মতো উচ্চারিত বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসেই জিনিয়াকে ঘিরে রচিত হয় এক যোদ্ধার বেষ্টনী। এক নতুন চক্রব্যূহ যেন সেই ব্যূহ থেকে মৃত্যুকেও জীবন্ত ফিরতে দেবে না ওরা।

জিনিয়াকে ঘিরে ওরা ছুটে চলে এমন এক যুদ্ধের দিকে যেখানে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনও প্রতিপক্ষ নেই।

প্রতিক্ষণ ১৯৯১

রামলালের বহু

দেয়ালে টাঙানো ঝুড়িটা নিয়ে বেরুবার আগে রামলাল বলে, 'বাহার যাবি না ত কি? হামরা কী কসুর হল বল? শিবলাল তোহরা ভি বেটা হ্যায়। মান লে জান্‌কী, মান লে। উহুঁ, মুহ্ হাত ধো। কুছ খা লে। পানি আন, ঘর বাহার ঝাড়ু-উড়ু দে। এ হে রে জান্‌কী?'

জান্‌কী বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসেছিল। বসেই থাকে। ওর সামনে দিয়ে এইসব বলতে বলতে রামলাল ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায়। বারান্দা পেরোতে স্রেফ দু-কদম। তারপর উঠোনের মাঝখানে আমগাছের ডালে আটকানো আঁকশিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

জান্‌কী তেমনিই বসে থাকে। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে রামলালের যাওয়ার দিকে চোখ রেখে। বাঁশের গেট-দড়ির ফাঁসে আটকানো বলে রামলালকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুড়ি-আঁকশি মাটিতে রেখে গেট আটকাতে হয়, আর গেট আটকানোর পর ঝুড়ি-আঁকশি তুলে মুখ উঁচু করলে জান্‌কীর চোখে চোখ পড়ে। রামলালের মুখটাই হাসি হাসি। চুল পাতলা, লালচে, এখন তাতে কাশফুলের রং। নাকের দু-পাশে দুটো গভীর রেখা থুতনির দু-পাশ দিয়ে নেমে এলেও চোখের চারপাশের আঁকিবুঁকি রেখাতে একটা হাসির ভাব। একটু বসা চোখদুটোও যেন হাসিতে জ্বলজ্বল করে — ওর খয়েরি চোখের মণি। সেই চোখে চোখ পড়লে জান্‌কী হাসেনি এমন হয়নি। যেন এ-চোখের আলো ও-চোখের মণিতে প্রতিফলন পায়। আজ জান্‌কীর চোখে তেমন প্রতিফলন নেই -- যেন এমন আড়ালে ওর চোখ দুটো যে সেখানে আলো পৌঁছতে পারে না। সেই উ দাসীনতায় রামলাল প্রতিহত হয়। ঠিক বোঝে না কী করা উচিত। তবু তেমনি হাসি মুখেই বলে, ' দিমাগ খরাব হোগলিবারে জান্‌কী।' বলেই যেন এখুনি কপট ক্রোধে তেড়ে আসবে জান্‌কী সেই কপট শঙ্কায় দ্রুত ঘুরে যায় দ্রুত ঘূর্ণনের গতিকেই ডাইনে মুচড়ে দিয়ে মাঠের রাস্তায় নেমে পড়ে।

আজ দেরি হয়ে গেছে রামলালের।

অন্য দিন ওরা দু-জনেই বেরোয়। আজ ঘুম থেকে উঠেছে আরও আগে, তবুও দেরি। দেরি হবার কারণ ছিল বলে দেরি হল না, দেরি হবার কারণ তৈরি হল বলে দেরি হল। আজ ভোরে, খুব ভোরে, ভালো করে আলো ফোটবার আগে রামলালের বড় বেটা শিবলাল গাঁওমে চলে গেল। তিনদিন ছিল ছেলেটা। এখন অবশ্য মরদই বলা চলে ওকে, ঘরে যখন বহু আছে। দুটো ছেলেও আছে হামাগুড়ি দেওয়া আর দৌড়ে বেড়ানো।

শিবলাল রামলালের ছেলে হলে তো নিয়মমাফিক জান্‌কী ওর মা হয়। নিয়মমাফিক এইজন্যে যে জান্‌কী শিবলালের গর্ভধারিনী নয়। শিবলাল রামলালের বেটা, রামলালের

দেশগাঁওয়ে যে ভগবতী বহু আছে তারও বেটা। প্রথমদিন জান্‌কী কিছু বলেনি। রেঁধেছে-বেড়েছে, খাট-পেড়েছে, বিস্তারা-উস্তারা ভি লাগিয়ে দিয়েছে। আপনা হাথ মে। দ্বিতীয় দিন সে, রাতে যখন শিবলালের ঝাঁ-ঝাঁ নাক ডাকছে ঘোমটা তুলে রামলালকে বাইরে ডেকে নেয়। রামলালের খুব ঘুম পেয়েছিল। বলে, 'কাহে ইতনা রাতমে....? কথাটা শেষ হবার আগেই জান্‌কী হিসহিস করে বলে, 'তুমার বেটা আমাকে মা বলে নাই।' 'তো কেয়া?' রামলাল বলে, 'তোহরা বেটা তোহরাকো মা নহি বোলতা তো কেয়া ও বেটা নহি বনতা?' তারপর ওর ডান হাতের পাঁচটা আঙুল জান্‌কীর জামার ভেতর ঢুকিয়ে একটা মোচড় দিয়ে ছেড়ে দেয়। 'যা যা, বহুত রাত ভইল্‌বা।' তাও কালকে জান্‌কী চুলা ধরিয়েছে। ভাত, রুটি আর ডাল বানিয়েছে। কিন্তু থালা নিয়ে ছেলের সামনে গেল না। রামলাল ডাকাডাকি করলে বলে, 'এ্যাত ডাগর মরদ কি বেটা হয়? উয়াকে লইজ্জা লাগে আমার, কিসকে আল ইখানকে? উয়াকে যাত্যে বলো। উসকো যানে বোলো।'

খাওয়ার বাসনও শেষ পর্যন্ত রামলালকেই মাজতে হয়। জান্‌কী নাকি শিব্‌লালের জুঠা মাজবে না। রামলাল একবার নিচু গলায় 'সওতেলি মা' বলতে জান্‌কী একটা কাঠ দিয়ে নিজের কপালে বাড়ি মেরে ফুলিয়ে ফেলে।

জান্‌কীকে কে যে রামলালের কাছে জুটিয়ে দিয়েছিল, নাকি ও নিজেই জুটে গিয়েছিল, এসব কথা জান্‌কী ভাবে না। বয়স কত হল তাও হিসেব নেই। কোন সালে ও পয়দা হয়েছিল তা যাদের জানবার কথা তারা তো কবেই মরে ঝরে গেছে। আবার বেঁচে থাকলে ওর উমর বলতে পারত এমনও নয়। তাও ছেলে হলে হয়তো মনে রাখার মতো একটা কিছু স্মৃতিতে থাকত —'হই যে গঁ, বিবার মণ্ডলবাবু রডের ধারে অ্যাকসিডেনে ম'ল সি রবিবারের ঘুর্‌য়া রবিবারে বেটাট হল।' কিন্তু বিটি কবে মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল এটাও কি একটা মনে রাখার মতো ঘটনা?

তা জান্‌কী কাকা-কাকির ঘরে থাকত আর লোকের বাড়ি কাজ করত। ঝুড়িতে করে মাঠ থেকে গোবর কাঠ আনত। লাইনের ধার থেকে পোড়া আর কাঁচা কয়লা আনত। বাউরিঘরে বিটিছিল্যা ডাগর হল্যাই বিয়া বসাতে হয়। জান্‌কীও আস্তে আস্তে ডাগর হচ্ছিল— লম্বায় ততটা নয় যতটা হাতে-পায়ের গড়নে। শরীরের গড়নে। কাকার তো নিজেরও তিনটি মেয়ে। তাদেরও তো বিয়ে দিতে হবে। তবে তারাও বসে খায় না — ছোটটাই টলে টলে চলে এই যা, নইলে বড় আর মেজ বাবুঘরে পাট করে। ফেরার পথে মাঠের থেকে কাঠ আর লাদ কুড়িয়ে আনে।

রামলাল তখন দোকানে দোকানে বাঁকে করে জল দিত। মিষ্টির দোকানে। ভাতরুটি খাবার সস্তা হোটেলে। রামলাল যাদব, আর যাদব বলেই তো জলচল ছিল ওর। রামলালের ছোটখাট শরীর, কাঁধে বাঁক নিলে সেই শরীরে একটা দোলা আসত। লালপাড় ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, তার ওপর শক্ত করে লাল গামছা বাঁধা, খালি গা, শীতকালে হলুদ রঙের হাতকাটা জালি গেঞ্জি, মাথায় লাল মাফলার জড়ানো — রামলাল একটু দ্রুত-চলনে এমনিতেই

চলে, কাঁধে বাঁক নিলে সেই চলন দ্রুততর হয়। বাঁকটা যেন চলনের তালে আর দু-দিকে জলভর্তি দুই টিনের অল্প নামা-ওঠায় একটু বঙ্কিমরেখায় নামে আর ওঠে।

এই জল নিতে গিয়ে রামলাল জান্‌কীর দেখা।

তখন অবশ্য জান্‌কীর নাম জান্‌কী ছিল না। তাই রামলাল যেতে আসতে ওর নাম জিগ্যেস করায় চোদ্দ বছরের বালিকা তার নামটি বলে — 'যমুনা'।

দুই রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে রামলাল ঠিক দোকানে দোকানে জল দিতে আসেনি। তার ঘরে জমিন আছে, বলদ আছে। বাপ মা ভাই আর বহিন আছে। ভগ্‌বতী আছে। তার দুই ছেলে আর দুই মেয়ে আছে। খেতের চাওলে এক সালের খোরাক হয় ঠিকই। সবজিও হয়। একটা গাই আছে — বাড়ির বাচ্চারা খেয়ে বিশেষ বাঁচে না যে বেচবে। তা বাদে সেটা তো গাভিন হয়, তখন মুশকিল। তা বাদেও তো তেল-নুন মশলা সাবান কাপড়া এসব কিনতে হয়। সেইসব কেনার জন্য পয়সা লাগে। রুপেয়া ভি লাগে। আর সেই ফিকিরেই মুলুকের লোকদের একটা দলের সঙ্গে রামলালও চলে এল বাংলো-বিহার সীমান্ত এলাকার এই শিল্পবসতিতে।

রামলাল দুধ বেচতে পারত। তাদের মুলুকের লোকেরা, মানে যারা যাদব বা গোয়ালা, তারা তো এই কারবারই করে। ভঁইস, গাই কেনে, আঁধার থাকতে উঠে মেহনত করে। দুধ দোয়ায়, পানি মেশায়। কেউ কেউ মিল্ক পাউডার মেশাবার দক্ষতায় এমন পারদর্শী হয়ে ওঠে যে মাপজোক লাগে না। সিরেফ পাকিট খুলবে বালটি মে ডালবে। পানি ডালবে — ব্যস দুধ ক্যানে ভরে সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়বে। তাদের কেউ কেউ আবার ফ্যামিলি আনে। তাদের বহুরা নাস্তা করে একটু হাতে-পায়ে বড় হয়ে উঠা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘাস কাটতে যায়। দুপুর রোদে তারা ঘাসের বোঝা মাথায় চাপিয়ে ঝমর ঝমর বাড়ি ফেরে।

রামলালের এই কারবার পসন্দ হল না। সে গোয়ালা বস্তি ছেড়ে কেব্‌ল্‌স রোডের ধারে একটা ঝুপড়ি বানাল। একদিকে একজনের জমির সীমানা চিহ্নিত উঁচু পাঁচিল, সেই পাঁচিলের ওপর অল্প তুলে দিল তার ঘরের টালির চালা। রাস্তার দিকের চালাটা এত নিচু যে দরজাটা সেদিকে হওয়ায় কোমর নুইয়ে শরীর আধখানা করে ঘরে ঢুকতে হয়। সেই ঘরে দড়ির চারপাই-এর ওপরে তেলচিটে বালিশ আর ভগ্‌বতীর হাতে তৈরি কাঁথার ওপরে রামলাল যমুনাকে শোওয়াল।

কাকা-কাকি বলেছিল। এসবই যমুনার শোনা কথা তার বোনেদের মুখ থেকে, কল্যাণেশ্বরী গিয়ে মালাবদল করতে। সিঁদুর পরাতে। রামলাল নাকি সেজন্য টাকাও দিয়েছিল। কত টাকা যমুনাকে ওরা বলতে পারেনি। কিন্তু কাকিই বলল, 'রেতের বেলিতে ঝাবি। লতুন কাপড় দিলুম। চাঁদির চুড়ি দিলুম, কানের ফুল আর নাকছাবি। হারট দিথ্যে লারলুম, ইমিটিশন পর্যা লে।'

সন্ধ্যারাতে কাকা-কাকির ঘরে জান্‌কী বাবুঘরের আনা ভাত খায়। ডাল খায়। কপির

ঝাল খায়। খেয়ে একটু বসে। কাকি বলে, 'আর ইদিক পানে আসবি না।'

এতক্ষণে যমুনা কথা বলে, 'কেনে?'

কাকি হাত ঘুরিয়ে ওর মুখের সামনে কথাগুলো বলে, 'কেনে তুমি জানো না? উয়ার কাছকে বেছিস আবার ঘরকে আইসতে খুঁজিস? উ কি বাউরি ব্যটে? উ ত হিন্দুস্থানী! ঘরকে আলে নিন্দা হব্যাক নাই?'

তা ঠিক। যমুনা ভাবে ভাগ্যিস তাদের ঘর থেকে রামলালের ঝোপড়ি অ্যানেক ধুর। সে যদি বাবুঘরে কাজ না করত তাহলে এত ধুরে আসত না। আর এত ধুরে না এলে রামলালের সঙ্গে দেখাও হত না। দেখা না-হলে তার জাত যেত না। বাউরিঘরেই তার বিয়া হত। গেরামের লকে মদ-মাংসের ভোজ খেত। এখন তাকে বাউরিঘরে নেবে না। রামলালকে তার ভালো লাগে। রামলাল তো তাকে লুকিয়ে নিয়ে যায়নি সিনমার পারা। তাকে 'বহু' করে ঘরকে নিয়ে গেছে। এই নতুন শাড়ি বেলাউজ সায়া চুড়ি দুল নাকছাবি আলতা কিরিম পাউডার ই-সকল ত উয়ার পয়সাতেই হচ্যে। যমুনা একটু ভয় আর খুশি নিয়ে ঘোমটা টেনে রামলালের সঙ্গে রিকশা চেপে পতিগৃহে আসে।

ঝাঁপ খুলে রামলাল-কুপি জ্বালে। পাঁচিলের গায়ে সাঁটা ক্যালেন্ডারের কালীর সামনে ওর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে বলে, 'লে! অব তু হম্‌রা বহু বনি। তোহরা নাম হামি দিলম জান্‌কী। রামলাল কী জান্‌কী বহু।'

রামলালের সিঁদুর ছোঁওয়ানো বহু হয়েই জান্‌কীর এতগুলো বছর পেরাঁই গেল। দু-চার মাস বাদে ঘোমটা টেনেই সে দু-বাড়ি কাজ ধরল। দু-বাড়ি মিলিয়ে পেত দু-কুড়ি টাকাপয়সা। তখনও গোবর কুড়াত। কয়লা কুড়াত। ঘর নিকাত। বেড়ার গায়ে সন্ধেবেলায় ঝিঙে ফুল ফুটে থাকত। খাটিয়াতে রামলাল শুয়ে শুয়ে গল্প করত। জান্‌কী মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ওর ফাটা পায়ে তেল মালিশ করে দিত।

একদিন রামলাল বলে, 'ডাগদর কা পাশ চল বহু।' তখন মাঠ ডিঙিয়ে পিঠাইকেআরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লোকে যেত। বিজলিবাতি হয়নি, তবে ডাগদরসাব খুব ভালো বলে গরিব লোকে একটু বেশি বেশি যেতে শুরু করেছিল। জান্‌কীর শরীর ভালো যাচ্ছিল না বলেই তো রামলাল নিয়ে গেল সেই অসপতাল মে, জান্‌কীর অল্প জ্বর, গায়ে-হাতে ব্যথা, আরও নানারকম মেয়েলি উপসর্গ। বহুর বাচ্চা হবে ভেবে রামলাল চিন্তিত হয়।

তা কিসের কী! স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরুণ ডাক্তার বলেন, 'অ্যানিমিয়া।' বহুর শরীরে খুন কুছ কমতি আছে। অপ্‌রিশন করালে নাকি বাচ্চা হবে। তাতে সুঁই দিল দুটো তো জান্‌কী পালিয়ে এল।

গরিবদের জন্য বিনাপয়সার সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী তো পালাতেই পারে।

আবার একদিন রামলাল বলে এত বাড়ি আর হোটেলে, দোকানে সে জল দেবার কাম ছেড়ে দেবে। সে নাকি কোন গ্যারেজে জল দেবার কাম পেয়েছে। সে গ্যারেজের মালিক নাকি তার এইসব কাম ছেড়ে দেবার ক্ষতি পুষিয়ে দেবে। তাহলে রামলালের তো টাইম

থাকবে আরও অন্য কাম করার।

'কী কাম কইরবে?' রামলালের পিঠে তেল মাখাতে মাখাতে জান্‌কী জিগ্যেস করে। উত্তরে রামলাল হাসে আর হাসতে হাসতেই বলে কালীমাঈ-এর কৃপায় তার কোনও অভাব থাকবে না। সে নাকি স্বপন দেখেছে কালীমাঈ তার কাছে ফুল চাইছে। তাই সে ঠিক করেছে বাড়ি বাড়ি দোকানে দোকানে মন্দিরে মন্দিরে সে ফুল বেচবে। রামলালের কথা শুনে জান্‌কী তাজ্জব। বলে কী বুড়ো? সে তো মনে মনে রামলালকে 'বুঢ়া' ই বলে। সন-তারিখের হিসেব না জানলেও সে জানে রামলালের বয়স দেদার। তার বিয়ের সময়, যদি সেই সিঁদুর পরানোকেই তাদের বিয়ে বলে ধরা হয়, রামলালের কষের দাঁত নড়ছিল। দাঁত পড়ার মতো বয়স অবশ্য হয়নি রামলালের কিন্তু রামলাল যে তাকে জোয়ান মরদের মতো সুখ দিতে পারেনি এ কথাটা তো জান্‌কী একাই জানে। আবার জোয়ান মরদের মতো নিজের সুখ আদায় করে নিতে পারে এই বুঢ়া সেটাও জান্‌কীই জানে। রামলাল খালি এলিয়েই পড়ে এত বছর ধরেই। বোধ হয় এত জল টেনে বুঢ়াটা থক্যে যায়, জান্‌কী ভাবে। জান্‌কীর এখন জওয়ানি নেই তা তো নয় কিন্তু শরীরের নিয়মে জওয়ানি থাকলেও তার কোনও উত্তাপ নেই। তারই শরীর থেকে তাপ নিয়ে রামলাল যখন একটু হাঁ-করে ঘুমায় আর নাক দিয়ে ফরফর আওয়াজে বাতাস ছাড়ে তখন জান্‌কীর ঘেন্না করে না এটাই তাজ্জবের কথা। উলটে মায়া লাগে। যেন জননীর মমতায় মরে যায় তার নতুন-জাগা শরীর আর শরীরের খিদে। রামলাল তো তার লজ্জা নিয়েছে—জান্‌কী তো রামলালেরই 'বহু'। রামলাল ওর স্বামী ব্যটে। জান্‌কীর বাচ্চা হয়নি তো সে দোষ জান্‌কীর। কেননা ততদিনে জান্‌কীর জানা হয়ে গেছে দেশে রামলালের বহু আছে, শ্বশুরাল আছে, দু'টা বেটা আর দুটা বিটি আছে। সেই জানার সঙ্গে সঙ্গে জান্‌কী আরও জেনে ফেলে রামলাল কোনওদিন তাকে মুলুকে নিয়ে যাবে না। মুলুকের সেই বহুও কোনওদিন রামলালের এই ঘরে আসবে না। রামলালই বছরে একবার-দু-বার যায়। শাওন মাসে যায় ধান রুইতে আর ছট পরবে যায় জামাকাপড় দিতে। ধান উঠাবার সময় কোনও কোনও বার যায় আবার যায়ও না। বাচ্চা নেই, একটাও বাচ্চা নেই, ত জান্‌কী কী দিয়ে ধরে রাখবে তার স্বামীকে? ক্যালেন্ডারের কালীর সামনে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে যে-স্বামী তাকে আর কী দিয়েই বা ধরে রাখতে পারে জান্‌কী। সে যে মা হতে পারেনি, সেটা তার দোষ। সে যে সুখ পায় না এইটাও তারই দোষ। তার শরীরের দোষ। তার মনের দোষ। সে তো তেমন করে কিছু ভাবতে পারে না। বলতে পারে না। সে শুধু তার হাত দু-খানি দিয়ে কাজ করতে পারে। সেবা করতে পারে। রামলাল যেমন যেমন বলে ঠিক তেমন তেমন করে। তাতে প্রথম প্রথম তার চুলের গোড়া থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে শিউরে উঠত এটা সত্যি। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ শেষমেষ কোনও বর্ষণ কিংবা ঝড়ের মাতন আনল না। এখন তো সেই রোমাঞ্চ নেই, কিন্তু জান্‌কীর ভেতরে বুড়ো রামলালের জন্য গাঢ় থেকে গাঢ়তর মায়া ঘনিয়ে থাকে। যেমন ধানের ভেতর দুধ জমে ওঠে তেমনি ঘনরসের ভারে ওর ভেতরটা নুইয়ে থাকে। যেমন কচি

ছেলের মায়ের স্তন জমে-ওঠা দুধের ভারে টনটন করে তেমনি বুড়ো রামলালের জন্য জানকীর মন দুখায়। রামলাল যে দু-চারদিনের জন্য দেশে যায়, জানকীর যেন দিন শেষ হয় না। যেন রাত ভোর হয় না। একটা বাচ্চাও নেই যে কোলে ঝাঁপাবে। টলমল পায়ে হাঁটবে। রামলাল ছাড়া ওর শরীরে অন্য কারও স্পর্শ নেই, তাই রামলালের দিকে বয়ে যাওয়া ছাড়া ওর জন্য অন্য কোনও বহমানতা নেই। এ-এক নিরুপায় উজানে ভাসা।

সেই রামলাল যখন বলে ফুল বেচবে জানকী ভেবেই পায় না এত ফুল ও কোথায় পাবে। এমনিতে এই রুখাশুখা মাটিতে ফুল ফোটে না, নিজের জমি নেই, বাগান নেই, কী বলে বুড়া?

কিন্তু তারপরেও তো পনের-বিশ-সাল কাটল। ঝুড়ি-আঁকশি নিয়ে পরের বাগানের জবা টগর কলকে এইসব ফুল শুধু বাইরে থেকে, পাঁচিল কি বেড়ার বাইরে থেকে পেড়েই রামলাল এখন মাসে তিনশো রুপেয়া কামায়। দুটো গ্যারেজে জল দিয়ে সাড়ে তিনশো। দিনে দিনে ফুলের চাহিদা বেড়েছে, আজকাল বেলপাতাও জোগায় রামলাল। মণ্ডলবাবুকে বছর পাঁচেক ফুল-বেলপাতা দেওয়ার পরে লাইনের ধারে মাঠের ওপর একচিলতে জমি একটি আমগাছ সমেত পেয়ে যায় রামলাল। মণ্ডলবাবু বলেন,'ভেস্টেড ল্যান্ড রামলাল, গরমেন্টের খাস জমি, আমি আছি, কোনও ব্যাটা তোকে ওঠাতে পারবে না। তাড়াতাড়ি একটা ঘর তুলে ফেল।' রামলাল বলে, 'জি সরকার।' এখন তো রামলালের নিজের ঘর হয়েছে। দেড় কামরা এক বারান্দা আর আমগাছ, মধ্যিখানে একটু লম্বাটে উঠোন। কাউকে বাড়ির হদিশ দিতে গেলে সে সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে বলে, 'ও যো পার্টি আপিস হ্যায়? উসিকা বগলমে যো ঘর দেখতানি, ওহি মেরা ঘর হ্যায়।'

সেই ঘর তো জানকীরও। গত বছর থেকে দুই আমগাছ ফল দিচ্ছে অল্পস্বল্প। অবিশ্যি একবারও পাকা পর্যন্ত গাছে থাকেনি সেই দশ-বারোটা আম। কাঁচাতে পুড়িয়ে চাটনি করে খেয়েছে ওরা। পাতলা ছিট ছিট খোসা আর খুব টক হওয়াতে রামলাল চোখ কুঁচকে বলে,'ল্যাংড়া আম বা।' জবা আর টগর লাগিয়েছে জানকী। সেই গাছের ফুল রিকোবার জন্য নয় — ঘরে কালীপ্রতিমা বসিয়েছে তার জন্য। ভিন্ডি আর ডিংলো হয়েছে। ক'টা বেগুন টমেটো আর লঙ্কাচারা বসিয়েছে। ওই এক চিলতে উঠোনেই বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। ছাগল আছে একটা সেটার জন্য। লোকের বাড়ি কাজ জানকী অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে। রামলালের পেছন পেছন আর একটা ঝুড়ি কাঁকালে নিয়ে সেও ফুল তুলতে বেরোয়। রূপনারায়ণপুরে এখন বসত বেড়েছে। নতুন বাড়িগুলোর বাগানে সারা বছরই কিছু না কিছু ফুল ফোটে। সৌখিন গাছে রামলাল-জানকী হাত দেয় না, কিন্তু এত বছর ধরে ফুল পেড়ে পেড়ে যেন হকই হয়ে গেছে ওদের পাঁচিলের বাইরে থেকে আঁকশি দিয়ে ডাল নুইয়ে টেনে ফুল পাড়ার। এমনকি চেনাজানা বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ফুল নেয় ওরা। রূপনারায়ণপুরে এ ব্যবসা একচেটিয়া শুধু রামলালের। জানকীর চুল কোমর পর্যন্ত। কালো সোজা মোটা শক্ত ঝোপের মতো চুলে লম্বা জটা পড়েছে। জটাগুলো খালি লালচে। পাকানো দড়ির

মতো। মাসে এক শনিবার ওর ভর হয়। চুল এলিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ওষুধ বলে। শিকড়ি বাকড়ি। কেউ কেউ ওকে দেয়াসিন বলে।

এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল জান্‌কীর। এভাবেই রাত কেটে যাচ্ছিল জান্‌কীর। সে দিনরাত্রির চলন তো রামলালই বেঁধে দিয়েছিল। এমন এক নিশ্ছিদ্র সম্পূর্ণতার মধ্যে তো কোনও ফাঁকফোকর থাকে না যে তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকে পড়তে পারে। কোনও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য জায়গা থাকে না সেই পরিক্রমার মধ্যে, তা সে যদি রামলালের ঔরসজাত সন্তান হয়, তাও। কেননা সে সন্তান তো জান্‌কীর গর্ভে বাস করেনি। জান্‌কীর স্তন্যপান করেনি। জান্‌কীর কোলে কাঁকালে চড়ে — এই উঠোনে কি ঘরে ছুটোছুটি করে শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক হয়ে ওঠেনি। তা যদি হত তাহলে এই দৃশ্যে জান্‌কী অন্য অবস্থান পেত। অন্য অক্ষাংশে দ্রাঘিমাংশে স্থাপিত হত তার মাতৃসত্তা। তাহলে সেই সম্পূর্ণতার নকশা ভিন্নতর হত তিনজনের নতুন অবস্থানে। অন্য এক অপরিহার্যতায় বাঁধা থাকত তারা তিনজনে।

কিন্তু এখন তা কী করে হয়? রামলালের ছেলে, জান্‌কীর ছেলে হবার জন্য তো একেবারে জোয়ান মরদ, দুই ছেলের বাপ আর এক বউ-এর স্বামী হয়ে এই বৃত্তে ঢুকে পড়তে পারে না। আর সেই জোয়ান লম্বা-চওড়ায় আস্ত এক মরদও জান্‌কীকে 'মাজি' বলে সম্বোধন করল না। একবারও না। হ্যাঁ, হতে পারে সে রামলালের বেটা, ভগবতীরও বেটা, রামলালের বেটার বউ-এর স্বামী, রামলালের নাতির বাবা — এই সব কথাও মিছা নয়, কিন্তু তাহলেও তো সে জান্‌কীর বেটা নয়।

জান্‌কীর কোনও বাচ্চাই নেই মা বলে ডাকবার। বাচ্চাই যখন নেই, তার গর্ভে ছিলও না কোনওদিন, তাহলে সেই না-হওয়া বাচ্চা তার কোল থেকে নেমে কোনও জমিনে দুই টলমল পা রাখতেও পারে না। তবু সেই না-হওয়া বাচ্চাকে মনে মনে ভাবলেও তো সে চিরদিনই বাচ্চা থাকে। যেন নন্দলালা। যেমন মাথায় চুড়ো করে চুল বাঁধা, নাড়ু হাতে গিরিধারী গোপাল। তেমন একটা ছবি তো সব মেয়েদের মতো জান্‌কীর মনেও থাকতে পারে। গভীর স্পষ্ট রেখায় না হলেও অপটু হাতের টানে ধ্যাবড়ানো কালি-তুলির আঁকা কোনও ছবির মতো অস্পষ্ট কোনও অবয়বে। সেই ছবি তো একদিনে তৈরি হয়নি। একদিনে তৈরি হয়ও না। রামলালের ঘরের দেয়াল ও মেঝে মাটির। সেই দেয়াল মেঝে নিকানোর লম্বা টানে টানে কতদিনের গন্ধে আর চলাচলে এই ছবি তৈরি হয়। আমগাছের নিচে তালাই পেতে শীতের দুপুরে কাঁথা সেলাই করতে করতে এই ছবি মনে আসে। তখন উঠোনের লাউমাচার নিচে চোখ বোজা হলুদ শাদা ডোরা বেড়ালটা পর্যন্ত এই দৃশ্যের এক আবশ্যিক অন্তর্গত হয়ে ওঠে।

জান্‌কী কাঁথা সেলাই করে বুড়ো রামলালের জন্য। পুরনো চাদরের এধারে-ওধারে ছাপা শাড়ি বসিয়ে। সে কাঁথায় কোনও জটিল সূক্ষ্ম নকশা নেই, ওসব জান্‌কীর আঙুলে আসে না, সে শুধু মোটা মোটা ফোঁড়ে রংবেরঙের রেখা টেনে যায় কাঁথার এক প্রান্ত

থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

'বুঢ়ার জাড় লাগে। যেমনি গেদ্যে ভুখ উয়ার তেমনি জাড়', কথাটা মনে মনে বলতে গিয়েও জান্‌কীর দু-ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ভেসে যায় বাতাসে ছোট ছোট অদৃশ্য ঢেউ তুলে। কথা বলার লোক নেই বলে যতটা নয়, কেননা রামলাল তো আছে, কথা বলার সুযোগ নেই বলেই হয়তো কেননা রামলালই তো কথা বলে বেশির ভাগ সময়, জান্‌কীর এরকম নিচু স্বরে একা একা কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। অনেক আগে ও যখন বাবুঘরে কাজে যেত তখন সেইসব বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলত, গল্প করত বলে এই অভ্যেস ছিল না। তাতে তার কতদিন ঘরে ফিরতে দেরি হত। সেই সব ছেলেমেয়েরা, সবাই নয়, কেউ কেউ এখনও তাকে দেখলে বলে, 'দিদি কেমন আছ?'

কিন্তু এখন রামলালের পাশাপাশি নয় তো পিছন পিছন হাঁটলে রামলালই তো বকে যাবে।

'জান্‌কী কিতনা লাল জবা দেখতানি?'

'জান্‌কী জলদি চল।'

'জান্‌কী ইয়ে তোহরা মাস্টারবাবুকা ঘরবা।'

উত্তরে জান্‌কী খালি বলে —

'হঁ ত।'

'হঁ ত।'

'হঁ ত।'

কাঁথাটা হয়ে গেলে জান্‌কী সেটা চারপাইতে মেলে রাখে। রামলালের তো কোনও ছবি নেই। তাই রামলালের বসা চোখের হাসি হাসি ভাবটা জান্‌কীর ঠোঁটের বঙ্কিমতায় ফুটে ওঠে। সুঁচের ফোঁড়ে ফোঁড়ে রামলালের শীতে কুঁকড়ে যাওয়া শরীরের চামড়ার মতো খুব ছোট ছোট কাঁপন তৈরি হয়েছে কাঁথার শরীরে। শীতের বিষণ্ণ অপরাহ্নে চারপাইতে মেলে দেওয়া কাঁথা আর তার ওপরে ঝুঁকে পড়া নিজেকে দেখতে পায় না সে, রামলালের চোখের হাসি নিজের ঠোঁটে নিয়ে জান্‌কী হয়ে ওঠে এক শাশ্বত ও সম্পূর্ণ ছবি।

রামলালের বেটা ভোররাতেই চলে গেছে। রাতে বাপের পাশে বসে আলুচোখা, আচার আর ডহর কি ডাল দিয়ে চাপাটি খেয়ে বাপের খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমায় সেই ছেলে। আবার আঁধার থাকতে উঠে বাবা বৈদ্যনাথজির পরসাদি প্যাঁড়া আর এক লোটা পানি খেয়ে রামলালকে গড় করে চলে গেছে। জান্‌কীকে কিছু বলেনি। জান্‌কীও কিছু বলেনি। অতবড় একটা মরদ যদি তার ছেলে হত, সে খুশি হত, কিন্তু সে তো ঘোমটা টেনে থাকল। ছেলেকে বাসে তুলে দেবার জন্য রামলালও বেরিয়ে যায়। অন্য দিনের মতো জান্‌কীকে বলে যায় না। যেন জওয়ান ছেলের বাপের গর্বে ছেলের পিছু পিছু বুড়ো বাপ হয়ে, এতটুকু হয়ে রামলাল হেঁটে যায়। ছেলে নাকি তার মায়ের মতো লম্বা, চওড়া, গোরা। ছেলের লাল টকটকে ফর্সা মুখখানায় তাই বুঝি মেয়েলি আদল পেয়েছিল জান্‌কী। ভালো করে তো ও

দেখেনি। কিন্তু ছেলে যখ ন গামছা পরে আমগাছের নিচে তেল মাখছিল তখন জান্‌কী দেখে বাপস্ কী হাতের পাঞ্জা। কী পায়ের গোছ। কী বুকের ছাতি। তাহলে ছেলের মা তো দুগ্‌গা ঠাকুরের পারা হব্যাক। সেই দুগ্‌গা পিরতিমার পারা বউকে যে এই ঘরে মানায় না — এইরকম করে পায়ে কোমরে পিঠে তেল মালিশ করতে বলা যায় না সেটা জান্‌কী অনুমান করল। বাপ-বেটা চলে গেলে জান্‌কী খানিক কেঁদে নেয়। খুব নীরবে। তার বুকের ভেতর যেন এক গহ্বর — অতলান্ত শূন্যতা। সেই শূন্যতা থেকে উঠে আসছে এই অশ্রু — কোনও ধ্বনি ছাড়াই সেই জলধারা ওর গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে ওর কোলে পড়ে — শিশুহীন ওর শূন্য কোলে।

ছাগলটা ডাকছে। জান্‌কী উঠল। না-উঠে উপায় নেই। শূন্য ঘরে সে কার ওপরে রাগ দেখাবে? তাকে দেখায় আলুথালু কোনও প্রেতিনীর মতো। সেই প্রেতিনী অবয়বেই সে উঠে ঘরে গেল। তিনদিন আগেও এই ঘরে তার চলন ছিল রানীর মতো। এখন সে এক নিঃস্ব, দুঃখী মানুষের মতো দেয়ালে হেলান দিয়ে হাঁপায়। ছেলের খাওয়ার ডিশ লোটা পিঁড়ি সব যেমনটি ছিল তেমন। একপাশে ঝুড়ির নিচে বাটিতে ক-খানা রুটি, তারই দুটো তুলে নিয়ে একটু গুড় মাখিয়ে ছাগলটার সামনে ধরে ও। 'ছি ছি নিজের রাগে তুকে খাত্যে দিলুম না।' ছাগলটি গলা বাড়িয়ে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। 'ছাগলটাকে দুট্যা পাতা ফেল্যা দিল্যে খাথ, ত দিলেক নাই।' ছাগলটা যখন এতটুকুনি তখন রামলালই নিয়ে আসে ওটাকে। সেই ছাগলছানাকে এখন জান্‌কীর দু-হাতের বেড়ে ধরা যায় না। কান দুটো লটরপটর করে। রামলাল বলেছে ঘাঁঘর বুড়ির থানে দেবে ওটাকে। জান্‌কী বলে, 'আল্যোদা ছাগল দাও। ইট আমি দিথ্যে লারব।'

আজ আর বেরনো যায় না। ঘর ঝাড় দিয়ে গোবর মাটি দিয়ে নিকিয়ে দিল। বারান্দা উঠোন পর্যন্ত নিকিয়ে তকতকে করে তুলল, যেন রামলালের বেটার পায়ের চিহ্নমাত্র না থাকে। খাটিয়া ধুল। কাঁথা চাদর বালিশের ওয়ার নিয়ে রাস্তার ধারে কলের তলায় কেচে নিল বৌ-ঝিদের সঙ্গে ঝগড়া করে। সেগুলো মেলে বাসন মেজে কলসি বালতি নিয়ে চান করে জল নিয়ে এল। ছোট ঘরে কালীমূর্তির সামনে ফুল তুলে রেখে বাইরে এসে রোদ দেখল। আমগাছের ছায়া দেখল।

রামলাল এবারে আসবে বুঝে ও চুলা ধরাতে গেল।

রামলাল যেমন আসে তেমনি এল। ঝুড়ি থেকে বেলপাতা তুলে বারান্দায় রাখল। খালি ঝুড়ি আমগাছে টাঙিয়ে ধুতির খুঁটের গেরো খুলে আলু কপি টমেটো আর লঙ্কা রাখল বারান্দায়। ততক্ষণে জান্‌কী অল্প ধোঁয়াসমেত উনুন নিয়ে বারান্দায় উঠে এসেছে।

'বহু তানি তেল দে। নাহনেকা পানি হ্যায়?' জান্‌কী কোনও উত্তর দেয় না, শুধু তেলের বাটি আর গামছা ওর পায়ের কাছে নামিয়ে দেয়।

তেল মাখতে মাখতে রামলাল বলে, 'আলুগোবি বনা। টামাটার কি চাটনি বনা, বহুত ভুখ লাগা। আরে কুছ বোল?'

নিত্যদিনের মতো রামলাল চান করে ভিজে গামছা পরে কালীমাঈ-এর পুজো করে। পুজো মানে ফুল-বেলপাতা-চন্দন আর ধূপদীপ। পুজো মানে দুটো কলা,বাতাসা আর শশা ছোট থালায় সাজিয়ে বিড়- বিড় করে রামলালের মতো করে রামলালের ভাবায় কিছু বলা।

নিত্যদিনের মতোই রামলাল চাদর জড়িয়ে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে জান্‌কীর পেছনে বসে বকে যায়। সেই বকুনির সঙ্গে রান্নার শব্দ আর গন্ধ মিশে যায়। সেই গন্ধে ঘুরে ঘুরে আসে তার মন্দির বানানোর কথা। সেই মন্দিরে পুজো করবে 'বারাহমন পূজারীজি'; সে নয়। তার আসল ইচ্ছে ছিল রামজি নয় তো হনুমানজির মন্দির করার। এখানে কালীমন্দির তো আছেই কিন্তু সে দেখেছে কালীমাঈকো সব জনে পূজে। বহোত ভয় পায় লোকে মায়িকে। সে মন্দিরে সেবাইত হয়ে রামলাল দিন গুজরাবে।

অন্যদিন জান্‌কী তার অভ্যাস মতো মশলা কষাতে কষাতে নয় তো ভাতের ফ্যান গালতে গালতে বলে যায়, 'হঁ অ ত।' মাঝে মাঝে একটু মুখ ফিরিয়ে রামলালের দিকে তাকিয়ে হাসে। আজ সে একমনে রান্নাই করে যায়। একটু পরে হঠাৎ সে শোনে আজ রামলাল কিছু অন্য কথা বলছে — রামলাল বলছে তার বেটার কথা। তার বেটা ত আচ্ছা সমঝদার লেড়কা। এখন থেকে জমিজমা ওই দেখভাল করতে পারবে। রামলাল বুড়ো হয়েছে, যখন মন চাইবে আপনা ঘর যাবে। চাহে দু-চার মাহিনা থেকেও আসতে পারবে। জান্‌কী কি তখন ফুল তোলা আর জোগানোর কাজটা চালিয়ে যেতে পারবে না?

খেতে বসে উলটোদিকে জান্‌কীর থালা না দেখে রামলাল বলে, 'তোহরা থালিয়া?' জান্‌কী সবটা তরকারি ওর সামনে ধরে দিয়ে বলে, 'ভুখ নহি।'

'ভুখ নহি?' রামলাল ভারি আশ্চর্য হয়। এত বছরের মধ্যে জান্‌কী তো কোনও দিন সুস্থ শরীরে সচেতন ভাবে এমন আজীব বাত বলেনি ! সে বোকার মতো আবারও বলে, 'ভুখ নহি? কাহে রে জান্‌কী?'

জান্‌কী তেমনি নির্লিপ্ত কঠিন মুখে বলে, 'কাহে মাহে কুছু লয় — অমনি, আমোওনি ভুখ লাগে নাই।'

রামলাল তবু হাসি হাসি মুখেই বলে, 'তব ত হামারা ভি ভুখ নহি।'

এছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারে ও। তার এই ঘরে তো তারা দু-জন। মাঝখানে কোনও বাচ্চাটাচ্চাও নেই যে, সে সেই বাচ্চার আড়াল নিতে পারে। আড়ালে চলে যেতে পারে। বাচ্চা নেই বলে রামলাল অবশ্য তেমন করে ভাবে না, মানে তার নিজের কথা, কিন্তু কখনও কখনও জান্‌কীর ভাবনায় তার এই কথাটা বিদ্যুৎ ঝলকে মনে আসে। যেমন এখন এল। যদি একটা 'মাজি' বলে ডাকা লেড়কা থাকত তাহলে কি জান্‌কী এমনি থালা সাজিয়ে তার সামনে ভুখা দাঁড়িয়ে বলতে পারত, 'ভুখ নহি।' কিংবা যদি বলতেও পারত তাহলেও রামলাল ছেলেকে দু- গরাস খাইয়ে নিজে খেয়ে নিতে পারত। তার যে ভুখ লাগলে মাথার ঠিক থাকে না। ভুখ লাগে বলেই তো রামলাল আঁধার থাকতে ওঠে। এক ল্যাঙোটি ছেড়ে আর এক ল্যাঙোটি পিনহে। সারাটা দিন শুধু চলে। সারাটা দিনই। ফিরে এসে যদি ভুখই না

মিটল তো ও বিকেলে সিংজির গ্যারেজে জল দেবে কী করে? ভুখ আছে বলেই তো ও জান্‌কীকে বহু বানিয়েছে। তা জান্‌কীরও তো ভুখ আছে। নইলে সেই বা ওর বহু বনল কেন? সেই ভুখ যদি না লাগে তো জগৎ ঝুটা বনে যাবে। নিমক রোটি চাহিয়ে, পানি চাহিয়ে অউর মরদকো বহু চাহিয়ে, ব্যায়সে বহুকা ভি এক মরদ চাহিয়ে। ইসব ভুখ ঔর পিয়াস কা বাত হ্যায়। ইয়ে জগ ভুখ ঔর পিয়াস সে বনতা।

রামলাল আবার বলে, 'তু ভি খালে। কুছু। লে মেরা সাথ বৈঠ।' কপি আলু ঝোলে মাখামাখি একদলা ভাত জান্‌কীর দিকে বাড়িয়ে দেয় -- 'খা রে মেরি জান্‌কী মাঈ, নহি ত...'

রামলাল সেই ছাগলছানা লালকে জান্‌কীর কোলে ফেলে দিয়ে কবে যেন বলেছিল, 'তোহরা বেটা লে জান্‌কী মাঈ।' আবার এই ঘরে কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করার পর মাসে যে শনিবার জান্‌কীর ভর হয় -- চুল এলিয়ে বসে থাকতে থাকতে কাত হয়ে পড়ে যায় যখন ধুনো-গুগগুলের ধোঁয়ার মধ্যে, তখনও রামলাল হাত জোড় করে বলে, 'জান্‌কী মাঈ'। সেই জান্‌কী মাঈ তখন ওবুধ-মাদুলি দেয়। যেন কোলে-কাঁকালে বাচ্চা নেই বলে রামলাল জান্‌কীর ছোট কোলটাকে বিস্তৃত করে দিতে চায়। কিন্তু সে সব তো ওর বহু বুঝল না তাই এখন 'জান্‌কী মাঈ' শুনে খেঁকিয়ে বলে, 'ওহ্‌ কত লহরাচ্যে! তুমার বেটাকে খাওয়াও। বেটার মাকে ভি খাওয়াও। '

রামলাল প্রস্তরমূর্তিবৎ গেঁথে যায় জান্‌কীর ছুঁড়ে দেওয়া প্রতিটি শব্দের আঘাতে। হাতটা তেমনি প্রসারিতই থাকে, মুখের হাসি তবু যেন যায় না, লেগে-থাকা জ্বরের মতোই হাসির অবশেষটুকু থাকে 'তব এহি বাত। তব ত তোহরা মনমে শা-ন্‌-তি নহিবা।'

'মেরি মনমে শানতি নহিবা ত নহিরে বুঢ্‌ঢা। তুর বেটা-বহু লিয়ে তুই থাক আমি রইতে লারব।'

'কাহে ইতনা গুস্‌সারে জান্‌কী?' -- এই বাক্যটা রামলাল উচ্চারণ করতে পারে না, এতই অবাক হয়ে যায় ও। হাতে ভাতের দলাটা ঠাণ্ডা হয়। শক্ত হয়। ও হাতটা নামিয়ে থালার ওপর উপুড় করে রাখে। মুঠোটা যেন নিজেই খুলে যায় আর দলাটা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে চারপাশ থেকে ভাত ঝরে পড়ে। রামলাল নিজের অজান্তেই তালুর গোড়াটা দিয়ে চাপ দিলে পুরো দলাটাই ভেঙে যায়। দেশে তার খেতি-জমিন বউ-বাচ্চা আছে এ কথা তো জান্‌কী জানে। সে নিজে তো জান্‌কীর কাছেই আছে। কত আদরে-সোহাগে এই কথাটা তার কতদিন আগেই বলা হয়ে গেছে। কই, তখন তো জান্‌কী এমন গোস্‌সা করেনি। বরং সেই বহু-বেটা ছেড়ে রামলাল যে জান্‌কীর পায়ে পড়ে আছে এই ভাবনায় সে বেশি বেশি করে রামলালের 'বহু' হয়ে উঠেছে। রামলাল বছরে যে একবার-দুবার মুলুক যায়, তাতেও জান্‌কী রাগ করেনি, রাগ করার কোনও উপায়ই তো রামলাল রাখেনি। পরবের শাড়ি, পিরান, ধুতি সব দু-জনে মিলে কিনেছে, পরবের পরের দিনই রামলাল চলে এসেছে। তাও ও শুধিয়েছে, 'বহু, ছট পূজা হ্যায়, তু ভি চল মেরা সাথ, তালাওকে পাশ চল।' জান্‌কী বলে,'না বাবা,

আমি উ-সকল কইরথ্যে লাইরব। আমি মা বিষহরির পুজা দিব।'— তাহলে? জান্‌কীর রাঁধা ভাতে তার ভুখ মেটে, জান্‌কীর আনা জলে তার পিয়াস মেটে। জান্‌কীর পাতা বিছানায়, জান্‌কীর শরীরের তাপে সে উষ্ণ হয়। এসব সত্যি। বিলকুল সাচ। তাছাড়া তার ছেলে এখন জওয়ান হয়েছে। সে যদি নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসে সে বাপ হয়ে তাকে মানা করতে যাবে কেন? বাপকে, বুড়ো বাপকে দেখার পিয়াস লেগেছে যে বেটার সেই তো এমনি ছুটে আসে। সে তো বাপের কাছে কিছু চায়নি। সে তো ভেনু থাকে। সে তো রুপেয়া-উপেয়া কুছ্‌ মাঙেনি। উলটে কৌটোভরা সাতুতু এনেছিল। খেতের চানার সাতুতু। বেসনের লাড্ডু এনেছিল। বাবা বৈদনাথজির পরসাদ ভি। কালীমাই-এর পুজা বাবদ দশ রুপেয়া দিয়ে গেছে শিবলাল। সে জান্‌কীকে 'মাজ্জি' বলেনি এটা ঠিক কিন্তু সে তো জান্‌কীর রাঁধা ভাত রোটি ডাল তরকারি খেয়েছে। জান্‌কীও তো তাকে বেটা বলে ডাকেনি। কথা বলেনি। এসব তো মা-বেটার ব্যাপার, সেখানে রামলাল কী করবে? কী করতে পারে রামলাল? মা-বেটার যদি এক দুসরাকে লিয়ে পিয়াস না জাগে তো আঁখসে কৈসে পানি বরসে? অউর পানি বরসাতি নহি ত মিট্টি কৈসে নরম হোগি? সব তো ধুপমে জ্বল যায়েগা। আগসে জ্বল যায়েগা।

তা সেই জ্বলনে এখন জান্‌কী জ্বলে। ওর জটাঅলা চুল তুলে খোঁপা করে। বড় অসময়ে এই ভঙ্গি ওর। সেই ভঙ্গি তাই আর সেই ভঙ্গি থাকে না। খোঁপাটা একটু বেশি উঁচু হয়ে যায়। চুড়ো করে মাথার ওপরে থাকে। যেন সেই খোঁপার ভারে জান্‌কীর মুখ সামনে ঝুঁকে যায়। নত হয়। আর নত হয় বলে ওর চোখের ঝরঝর জল সোজা মাটিতে পড়ে। ও দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে, 'কেউ নাই গঁ। আমার কেউ নাই।'

জান্‌কীর গলায় এমন আওয়াজ ওঠে এটা বোধ হয় জান্‌কী নিজেও জানত না। সেই তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ও নিজেই চমকে খানিক বিরতি নেয়। সেই বিরতির পরে আবার ও চেঁচিয়ে ওঠে, 'মর মর তুই মর‍্যা ক্ষারে জান্‌কী ....।'

এই আর্তনাদের সামনে রামলালের কোঁচকানো মুখ থেকে হাসির অবশেষটুকু মুছে যায়। সে তো এতদিন জেনেছে ওর এই বহুর আওয়াজ কমজোরি। মিহি। গাঢ়। সে আওয়াজে ভাত বেড়ে স্বামীকে ডাকা যায়। সওদাপাতি করা যায়, কি চাহে ছাগল-টাগলও চরানো যায়। তাছাড়া ঘরে কালীমূর্তি বসানোর পর জান্‌কী মালা গাঁথতে গাঁথতে নয় তো চন্দন ঘবতে ঘবতে গুনগুনিয়ে গান গায়। সেই গানের কথা রামলাল বোঝে না, বোঝাও যায় না। এমনি জড়িয়ে যায় একটা শব্দের সঙ্গে আর একটা শব্দ, কিন্তু সব মিলিয়ে শোনা যায় একটা একটানা সুর মৌমাছির গুনগুনানির মতো লাগে — ওর মনে হয় এই নেশায় যেন নিদ এসে যাবে — ছেলেবেলায় মায়ের হাতের আলতো চাপড় খেয়ে সে সুরে ওর নিদ আসত যেন সেই বিস্মৃত সুরে ওর এই বহু গান গায়।

কিন্তু আজ জান্‌কী কী সুরে আওয়াজ উঠাল? যেন কোনও কুত্তাকে কেউ বেধড়ক পেটাচ্ছে -ইতনি আওয়াজ। বলির পশুর অন্তিম আর্তনাদের মতো সর্বস্ব হারানো হাহাকারের সুর গলায় তুলে নিয়ে জান্‌কী মেঝেতে লুটোয়। সেই বিলাপে সে মরে যেতে চায়। কেবলই

মরে যেতে চায়। শুধু তাই নয়, মরবার আগে সে তার আত্মপরিচয়টুকু পর্যন্ত মুছে দিয়ে যেতে চায়। হিংস্র আঙুলের ঘর্ষণে জ্যাবজেবে করে পরা সিঁদুর মুছে দিতে চায় — দেওতা সাক্ষী রেখে পরানো সিঁদুর। যে-সিঁদুরের জোরে সে 'বহু', রামলালের 'বহু'। সে যে কার কন্যা, সে জানে না। কারও জননী নয় সেটা জানে কিন্তু সে যে 'বহু', রামলালের 'বহু', এ কথাটা তো বড় বেশি করে জানে। বড় বেশি করে জেনে এসেছে এতদিন। এত বছর। আজ রামলালের সত্যিকারের বহুর বেটা এসে তাকে নীরবে বুঝিয়ে দিয়ে গেল সে সত্যিসত্যিই তার বাপের শাদিশুদা বহু নয়।

তাহলে? তাহলে সে কী?

রামলাল উঠে পড়ে। ভাতমাখা হাতেই জান্‌কীকে টেনে ওঠায় মাটি থেকে। সোজা করে বসিয়ে দিতে দিতে জিগ্যেস করে, 'এত কাঁদছিস কেনরে বহু? গোস্‌সা করিস বুঝি? লেকিন রোতি কিউ?'

চোখের জলে, সর্দিতে, মেঝের মাটিতে, ধেবড়ানো সিঁদুরে মাখামাখি মুখখানা তুলে জান্‌কী হেঁচকি তোলে।

'তানি পানি পি লে।' বাঁ-হাতে বহুকে জড়িয়ে ডানহাতে ঘটি তোলে ওর মুখের কাছে, তারপরই বোঝে, এভাবে জল খেতে পারবে না জান্‌কী। 'শির উঠা।' বলে নিজেই বহুর মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে দেয়। জান্‌কী হাঁ করলে অল্প অল্প জল ঢেলে দেয়। একটু পরে জান্‌কী বলে, 'ছাড়ো।' সেই কান্নাভাঙা ফ্যাসফেসে আওয়াজে রামলালের নাকের দু-পাশ কুঁচকে যায় হাসিতে। ও বহুকে ছাড়ে না। ঠাণ্ডা ছড়ানো ভাতগুলোকে জড়ো করে পাঁচ আঙুলের পেষণে নতুন করে মাখে। একদলা তুলে জান্‌কীর মুখে দেয়। ভাত খাওয়া গলায় জান্‌কী বলে, 'তুমি খাও।' 'হাঁ হাঁ' বলে মস্ত মস্ত গরাসে রামলাল খেতে থাকে। বাঁ-হাতে তখনও জড়ানো থাকে জান্‌কীর শরীর। ওর আর এক ভুখ আর পিয়াসের জন্য সেই শরীরের প্রয়োজন আছে।

সকাল হবে। রামলাল মাথায় চাদর, গায়ে চাদর জড়িয়ে ঝুড়ি-আঁকশি নিয়ে বেরুবে। জান্‌কীও আর একটা ঝুড়ি নিয়ে ঘোমটা দিয়ে ওর পেছন পেছন চলবে।

রামলাল বলবে, 'বহু জলদি চল্, বহুত জাড় লাগতা।'

জান্‌কী বলবে, 'হঁ ত।' কেননা রামলালকে প্রদক্ষিণ করা ছাড়া জান্‌কীর আর অন্য কোনও কক্ষপথ জানা নেই।

সচেতনা ১৯৯২

গিদ্ধর কী মাঈ

গিরিধারীকে কেউ গিরিধারী বলে না। এ দুঃখ যতটা ওর নিজের, তার চাইতে অনেক বেশি ওর মায়ের। গিরিধারী ছাড়া ওর মায়ের আছে তো খানকতক ফাটা কাপড়-সায়া-ব্লাউজ, চারটে ছেঁড়া ময়লা কাঁথা, দুটো ন্যাকড়া-গোঁজা তেলচিটে বালিশ, একটা ছেঁড়া মাদুর, খানকতক অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাসন আর একটা হুঁকো। আর দুটো বস্তা আছে, ঝুড়িও আছে তিনটে। ঝুড়ি নিয়ে ও কয়লা গোবর কুড়োয়। বস্তাটাই রোজ লাগে। পুরনো কাগজ, লোহা, টিন, কৌটো এইসব কুড়োয়।

ছেলেটা যখন সবে হাঁটতে শিখেছে তখনই সুরতিয়ার বর দুসরা শাদি করল। নাকি সুরতিয়া গন্ধা। সুরতিয়া কিসে এত গন্ধা হল তা ও বোঝেনি। শ্বশুরবাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে কোনও দিন ও বাহার যায়নি। ঘরেই কামকাজ সারতে সারতে কখন যে সুরয পশ্চিমে ঢলে যেত ও টের পেত না। বাড়ি ভর্তি লোক। ভঁইস। সেসব দেখভাল করা, ঘরদুয়ার সাফসুতরা করা ও-ছাড়া কে করবে? সুরতিয়ার রং কালো হলেও বড় বড় চোখ কাঁধ ছাপানো চুল দেখেই ওরা বহু পসন্দ করেছিল ওর ন-বছর বয়সে। সুরতিয়ার রং কালো কিন্তু মাথা হেলিয়ে দাঁড়ালে যেন পাথরপ্রতিমা। তার যেমন চওড়া কবজি তেমন পায়ের গোছ, ভরাট বুক আর ধীর চলনের ভারি চওড়া পেছন তো এমন ভরা বাড়ির বহু হবারই মতো। মণ মণ গেঁহু হয়। দুধের ফেনা ওপচানো বালতি, এ-ঘর সে-ঘর, এ-দুয়ার সে-দুয়ার, এ সবের মাঝে এমন রাজেন্দ্রানী নারী শরীরই তো মানায়।

কাজেই রং কালো হলেও সুরতিয়ার শাদি হয়। গাওনা হয়।

বাপ পসন্দ করেছিল বহুকে। বাপ যদ্দিন ছিল রামঅবতার কথাটি বলেনি। শাদির সময় তার বয়স তেরো বছর। গাওনা হবার পরেও সে বউকে তেমন করে পায় না। যেন সুরতিয়া তার বউ নয়, তার বাপের বেটার-বহু। তার মা তো তার বাপের কথায় ওঠে বসে। তার বাপ যেমন যেমন বলবে তাদের গোটা সংসারটাই তেমন তেমন চলবে। অথচ রাম অবতার দশ ক্লাস পর্যন্ত ইংরেজি স্কুলে পড়েছে, জুলপি কামানো লম্বা চুল রাখে ফিল্মের হিরোর মতো। গিরিধারী জন্মাবার পর থেকেই তার মন উড়ু উড়ু। ছেলে হামা দিতে শিখলে সুরতিয়ার চোখ থেকে পানি গড়ায়। পিচুটি জমে ওঠে ঘন ঘন। ডাগদর দেখানো হল। ওযুধ খেয়ে আর চোখে আইড্রপ দিয়ে সুরতিয়ার চোখ তখনকার মতো ভালো হল তো শ্বশুর একরাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই যে শুল আর উঠল না।

শ্বশুর মরার পরে ঠিক এক বছর সুরতিয়া শ্বশুরাল ছিল। রামঅবতার মাঝে মাঝে ওর

বিছানায় রাত কাটাতে আসত। রামঅবতার সে সময়ের আগে বা পরে কোনও কথা বলত না, যেমন ভুখ লাগলে মানুষ খায়, তেমনি গবগবিয়ে খেত ওকে। সুরতিয়ার তাতে দুখ বাড়ত, কিন্তু একটা ভঁইসের মতোই কালো মস্ত শরীরটা চিত করে ও শান্তভাবে স্বামীকে গ্রহণ করত। পীড়ন করতে দিত। রামঅবতার উঠে গেলে ও কাপড় ছেড়ে, হাত-পা-শরীর ধুয়ে আসত কুয়োপাড়ে। অত রাতে জল তোলার শব্দে কেউ জেগে যেতে পারে ভেবে আস্তে জল তুলত। শরীর ঠাণ্ডা হলে ও ফিরে এসে ছেলেকে দেখত ঠিক আছে কি না।

এভাবেই হয়তো কাটত কিন্তু রাম অবতারের দুসরা শাদির কথা উঠলে সুরতিয়া ছেলে কোলে বাপের কাছে চলে আসে। তার বাপের ছোট বাড়ি, অল্প জমিন, দু'টো বলদ আর এক ভঁইসানী। ভঁইসানীটা বুড়ি। সুরতিয়া ওর পিঠে চেপেছে বালিকা বয়সে। ওর দুধ খেয়েছে। ওর দুধ খেয়েই তো তার এম ন শরীর। ভঁইসানী এখন দুধ দেয় না। বাপ বুড়ো হয়েছে। মাও জোয়ান নেই। তো সুরতিয়া, এক দুখী আওরত তায় কোলে এক বাচ্চা কী করবে? রাম অবতার খোঁজ করতেও এল না। বাপ বলল সে খোঁজ করবে। সুরতিয়া মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে বলল, 'কভি নহি।'

বুড়ো বাপ, বুড়ি মাঈ তো বেশিদিন বাঁচেনি। একজন একজন করে সবাই মরে গেলে সুরতিয়ার দাদা আসে বাংলা মুলুক থেকে। সে তার বানাবার কারখানায় কাম করে, ওখানে ভঁইস কিনেছে, জার্সি গাই কিনেছে। কারখানায় কাজ করেও সে একেলা নয় তো ওবেলা সাইকেলের হ্যান্ডেলে দুধের ক্যান ঝুলিয়ে বাড়ি বাড়ি দুধ বেচে। দাদা এসে সুরতিয়াকে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসতে চাইলে সুরতিয়া উনুনে লকড়ি গুঁজে দিয়ে দাউ দাউ আগুনের আভায় কালো মুখ রাঙিয়ে বলে, 'কভি নহি।'

তা দাদা আর কী করে? কী-ই বা করতে পারে শিউপূজন? তার তো সময় নেই। তাই সে বাপের ঘর, জমি বুড়ি-ভঁইসানী আর বলদ দুটো বেচে বোন আর ভাগ্নেকে নিয়ে রূপনারায়ণপুরে, তার ঘরে এল। সে কোয়ার্টার্সে থাকে না। চাকরির নিয়ম অনুযায়ী তার প্রাপ্য দু-কামরার ছোট কোয়ার্টার্স। সেখানে তার পাঁচ-ছটা ছেলেমেয়ে, বউ, দুটো ভঁইসানী আর একটা গাই তাদের বাচ্চা নিয়ে আঁটবে কী করে? থানার কাছেই তার নিজের ঘর সে বানিয়ে নিয়েছে। একতলা তিনকামরা মস্ত উঠনের বাড়ি। সেখানে সুরতিয়া আড়াই বছরের গিরিধারীকে নিয়ে বারান্দার এককোণে খাটিয়া পেতে শুল।

বছরখানেক এভাবে, তারপর দাদা আর ভাবির অসুবিধা হওয়াতে সুরতিয়া উঠোনের ধারেই এক ঝোপড়ি ছিল লকড়ি রাখার, সেখানে উঠে এল। মাটিতে তালাই পেতে ছেলে নিয়ে নিশিযাপন করে সে।

ছ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত গিরিধারী মায়ের আঁচল ধরেই ঘোরে। তারপর সুরতিয়া ওকে স্কুলে দেয়। কারখানার বাংলা মাধ্যম স্কুলেই দেয়। বাংলা মুলুকে ছেলে বড় হচ্ছে বলেই হয়তো। তা সে স্কুলেই গিরিধারী তার নতুন নামটি পায়। কোনও এক পরিহাসপ্রিয় দিদিমণি তাকে এই বলে সম্বোধন করলে সারা স্কুলের ছেলেমেয়েরা 'গিদ্ধর' গিদ্ধর' বলে

ওর পেছনে ছোটে। তা সে স্কুলে গিরিধারী থাকে কী করে?

মা বস্তা নিয়ে কাগজ, টিন, লোহা কুড়োতে পথে নামে। ছেলে সিগারেটের পুরনো প্যাকেট নিয়ে তাস খেলে। মা ঝুড়ি নিয়ে লাইনের ধারে ধারে কয়লা কুড়োয়। ছেলে কয়লার ঝুড়ি ঘরে দিয়ে আসে। দিনমানে যেমন-তেমন, ভাত জোটে কি জোটে না, সন্ধেবেলা উনুন ধরালে ছেলে বলে, 'মা, আলু ভরকে রোটি বনা।'

এই স্পেশাল রুটি বানানোতে সুরতিয়া গিরিধারীর মা হয়ে ওঠে। শীতের হিম হিম সন্ধ্যায় কাঁথা জড়িয়ে উনুনের ধারে বসে গিরিধারী। সুরতিয়া একটা বড় অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে দুটো বড় আলু চার টুকরো করে খোসাসমেত সেদ্ধ করতে দেয়। তার ভাঙা বাংলায় আর মুলুকের হিন্দি মেশানো ভাষায় ছেলেকে গল্প বলে — কখনও কোনও শোনা কাহিনি তার মুখে নতুন আদল পায়, যে-গল্প সে শুনে এসেছে তার মায়ের ওম জড়ানো কোলটিতে বসে বা নানির ডাল বাছার ফাঁকে ফাঁকে সেই সব হনুমানজি, রামজি, লছমনজি আর সীতামায়ির কাহানি তার মতো করে নিচু গলায় বলে যায়। কখনও তার নিজের ছেলেবেলার গল্প মনে পড়ে, তার বাপের জমি আর খেতের ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া দুপুর। কুয়োতলার জল আনার গল্প, মল বাজিয়ে বাজিয়ে জল আনার গল্প, ভঁইসানীর পিঠে চড়ে বেড়াবার গল্প।

ছেলে বলে, 'মাঈ তব তোহরা শাদি ভঈলবা?'

মায়ের মুখে একটু লাজুক হাসি ফোটে — বুঝি-বা কিশোরী সুরতিয়ার আদল পায় তার ভাঙা প্রতিমাস্বরূপ মুখখানি। সে একটু উদাস হয়ে যায়। বিয়ের দিনটি তার তেমন মনে পড়ে না। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তার বিবাহপর্ব পার হয়ে গেছে। আলো, বাজনা, নতুন চেলির খসখস শব্দ, কিশোর বরের অপরিচিত মুখটি যেন স্বপ্ন। বহুত মিঠি সপনা। 'রৈন কা সপনা'। এসব তার মনে যেন আবছা ছবি হয়ে আছে। জল রঙের ধোয়া ছবি। সে ছবির কোনও রেখাই স্পষ্ট নয়। সে ছবির কোনও রঙই আলাদা করে বোঝা যায় না। তবু সে তো ছবিই। রং রেখা আলাদা করে বোঝা না গেলেও সে ছবির একটা স্বপ্নিল দূরত্ব আছে। রহস্য আছে। মধুরিমা আছে। নইলে সুরতিয়া খসে পড়া ঘোমটা মাথায় নতুন করে তোলে কেন? তার বড় বড় রক্তাভ চোখের কোণে জমা পিচুটি মুছে নেয় উঁচু হওয়া হাঁটুর কাপড়ে। ছেলের উৎসুক ব্যগ্র মুখখানির দিকে তাকিয়ে তার তরুণ স্বামীর প্রেমময় দুই বাহু আর দশ আঙুলের সোহাগ মনে আসে। এত কম, এত কম পেয়েছে সুরতিয়া যে, তার মনে যেন ওই ক'টা মাসের প্রতিটি মুহূর্ত খোদিত হয়ে আছে। প্রাচীন কোনও শিলালিপির মতো ধূলিজড়িত তবু সেই অক্ষর যা শুধু সুরতিয়াই পড়তে পারে। লেচির ভেতরে মশলা দেওয়া আলুসেদ্ধ পুরে দুই করতলের চাপড়ে সেটাকে চেপ্টে বড় করতে করতে বলে, 'হাঁ বেটা, তব হাম শ্বশুরাল গই।'

ছেলে বারো-তেরো বছরের হল তবু সুরতিয়া ওকে কোনও কাজে দেয় না। তবে ও নিজে একটা কাজ পায়। জল তোলা, বর্তন আর কপড়া-উপড়া সাফ করার কাজ। ঝাড়ু

দেবার কাজ। কাজটা পায় ও মইনুদ্দিন সাহেবের বাড়ির পেছনে কাগজ কুড়োতে গিয়ে। মইনুদ্দিনের বড় মেয়ে হাসিনা মুরগি খুঁজতে গিয়ে ওকে দ্যাখে। হাসিনা মাধ্যমিকে অঙ্কে ব্যাক, সেলাই জানে বিস্তর। সে দৌড়ে মাকে বলে, 'আম্মা একজন লোক রাখবেন, কাজের?'

মইনুদ্দিন সাহেব ফুড ইন্সপেক্টার। তাঁর তিন পুত্র ও ছয় কন্যা। এদিকে মেয়েদের তিনি স্কুলে দিয়েছেন। বড় ছেলে আমিনুদ্দিন কলকাতায় কলেজে পড়ে। মেজ রহিমুদ্দিন ক্লাস এইট আর ছোট নাসিরুদ্দিন সবে ফাইভ-এ উঠেছে। তাঁর স্ত্রী প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। মেয়েরা বড় হওয়াতে আর বাধ্য হওয়াতে রান্না বাদে সবই চলে যায়। বউয়ের হাতের রান্না ছাড়া মইনুদ্দিন সাহেবের চলে না। তাই ফতিমা টুলে বসে রান্নাটা নিষ্ঠার সঙ্গে করেন। তাতেই তিনি বিকেলে কোমরের ব্যথায় প্রায় উঠতেই পারেন না। মেয়েরা বিকেলে খালি ভাতটুকু করে।

তা এতসব ঘরের কাজ করলে মেয়েগুলো পড়বে কখন? সেজ মেয়ে রোশেনারা এরই মধ্যে সময় করে নেয়। সে একটু দুবলা পাতলা বলে বোনেরাও তাকে এই কনসেশনটুকু দেয়। ফলে রোশেনারা ক্লাস নাইনে ওঠে ফার্স্ট হয়ে। বিকেলে সাইকেল চালিয়ে রায় স্যারের বাড়ি অঙ্ক কষতে যায়।

ফতিমা প্রথম যখন আসেন তখন তাঁর কোলে কাঁখে পরপর সন্তান। পেটেও সন্তান। দেশ থেকে একটা কাজের মেয়ে, দশ-এগারো বছরের সাইদাকে এনেছিলেন বলে তাঁর অসুবিধে হয়নি। কিন্তু সাইদা তো একটা মেয়ে। তাকে তো বাপ মা একদিন বিয়ে দিতেই পারেন। তেমনি একদিন সাঈদাকে দেশে চলে যেতে হয়। তখন ফতিমাকে কাজের লোক খুঁজতে হয়। আর খুঁজতে খুঁজতে তিনি আবিষ্কার করেন এখানে পয়সা দিয়েও কাজের লোক, তাও শুধু বাইরের কাজ করার লোক পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এমনিতে যারা বাড়ি বাড়ি কাজ করে সেই বাউরিরা মুসলমানের বাড়ি কাজ করবে না। তাদের মরদরা বাগান-টাগান সাফ করা কি জল তুলে দিতে রাজি হলেও মেয়েরা নাকি মুসলমানের এঁটো মাজবে না। এমনকি কোনও ডিহি গ্রাম থেকে কাঁকালে মুড়ির বস্তা নিয়ে যে প্রৌঢ়া তিলি রমণীটি আসে সেও মুড়ি মাপবার সময় উঁচু থেকে আলগোছে মুড়ি ঢেলে দেয় মুড়ির টিনে পাছে তার মুড়ি মাপার পাইটি ছোঁয়া হয়ে যায়। ফতিমা পরে জেনেছেন এরা নাকি বাউরিদেরও ছোঁয় না। চাষের জমিতে যে ধান হয় তাতে সংবছরের খোরাকটুকু চলে, বাদবাকি ডাল তেল নুন মশলা চা চিনি জোটাতে বাড়ির মেয়েছেলেদের বস্তা কাঁখে সাত জাতের ছোঁয়া বাঁচিয়ে মুড়ি বিকুতে হয়। 'তবে কি ছোঁয়া বাঁচে মা? তাই ঘরে ঢোকার আগে পুকুরে ডুব দিয়ে নিই।'

কাজে কাজেই গিরিধারীর মাকে পেয়ে ফতিমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

সুরতিয়াও খানিকটা বাঁচে যেন। রোজ কয়লা কুড়িয়ে বেচতে বেচতে তার দেরি হয়ে যায়। সারাদিন কৌটো লোহা কাগজ কুড়িয়ে হপ্তা শেষে আগে বয়াকর যেত বেচতে তো এখন রূপনারায়ণপুরেই এসব পুরনো লোহালক্কড় বেচার দোকান হয়েছে। এখন একটা

মাসমাইনের কাজ পেয়ে ও দিন গুনতে শুরু করে কবে রুপেয়া পাবে। ইদের কত দেরি। এরা পুজোতে কাপড় দেবে না ইদে দেবে। সুরতিয়াকে ওরা বলেছে আর দু-মাস পর রোজা রাখবে ওরা এক মাহিনা তক। তারপরে চাঁদ দেখে নামাজ পড়বে। খানাপিনা হবে। নতুন কাপড় হবে। তখন সুরতিয়াও অনেককাল পরে নয়া শাড়ি পিনবে। সে ঠিক করেছে যে-করেই হোক রুপেয়া পেলেই ছেলের জন্য নয়া পিরান কিনবে। প্যান্ট ভি কিনবে। তার অমন রাজার বেটার মতো ছেলে কিনা ফাটা ময়লা গেঞ্জি পরে, তাপ্পি দেওয়া পরের প্যান্ট পরে শুকনো মুখে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। সুরতিয়ার ভাবি তার ছেলের দুটো একটা ফাটা শার্ট কি প্যান্ট নয় তো গেঞ্জি গিরিধারীকে দেয়। তাকে দিয়ে এটা-ওটা ফাই ফরমাস খাটিয়ে নেয়। তার নিজের ছেলে বড় ইস্কুলে পড়ে ঠিকই কিন্তু সে খুব পিকচার দেখে স্কুল পালিয়ে। সিগ্রেট ভি পিতা — এসব সুরতিয়া জানে। তাই গিরিধারী যখন মাকে কখনও মামির দেওয়া শার্ট-প্যান্ট দেখায় আর ভাইয়ার গল্প করে, ভাইয়া কীরকম সব ফিল্মি গানা গাইতে পারে, ডায়ালগ বলতে পারে অমিতাভজির মতো, তখন সুরতিয়া সত্যিই রেগে যায়।

'ই ত ঠিক বাত কে তু গিদধর হ্যায়। উ সব হাম জানতি হ্যায়, ফেক দে ও কামিজ। কেয়া তু উসসে ফির ভিখ মাঙেগা?'

এখন সুরতিয়া নিজের পয়সা দিয়েই ছেলেকে জামা প্যান্ট কিনে দিতে পারবে।

রমজান মাস শুরু হয়েছে। সুরতিয়ার কাজ বেড়েছে। ওকে ভোরে আসতে হয় কাজে। ফলে কয়লা কুড়োতে দেরি হয়। ফতিমার আবার ঘর ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে না মুছলে মন ওঠে না। রোজ তিনখানা ঘর, দুটো বারান্দা, কুয়োতলা, উঠোন জল দিয়ে ধুয়ে মোছা চাই। বড় চৌবাচ্চা দু-বেলাই খালি হয়ে যায়। দু-বেলাই ভরতে হয়। মুরগির ঘর সাফ করতে হয়। কাপড় কাচতে হয় বড় দু-বালতি। ফতিমার নিজের, মইনুদ্দিন সাহেবের লুঙ্গি পাজামা গেঞ্জি পাঞ্জাবি রোজ সাবান কাচা। মেয়েরা আগে নিজেরাই সালোয়ার কামিজ কাচত, এখন সুরতিয়ার মতো কামিন থাকাতে তারাও বালতিতে এসব ভিজিয়ে দেয়। ফতিমার বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কাঁথা, টেবিল ক্লথ সব হাসিনার হাতের তৈরি। আব্বা শাদা পছন্দ করেন বলে নানান নকশার এইসব কাচাকাচিও ফি এতোয়ার সাফ করতে হয়। ফতিমা মাঝে মাঝে ভাত দেন সুরতিয়াকে। ও কুয়োপাড়ে বসে চোরের মতো খেয়ে নেয়। সেদিন কোথা থেকে গিরিধারীও জুটে যায়। দু-চার গ্রাস খেয়ে মা ছেলের দিকে সানকিটা ঠেলে দেয় — 'খালে বেটা মামাকো মৎ বোল।' হুস হাস করে গিরিধারী সানকি খালি করে, লাল দাঁত বের করে বলে, 'মা তানি পানি দে।'

রেহানা বলে, 'ও মা, তুমি তো কিছু খেলে না, খালি খালি পানি খেলে কি পেট ভরে?'

তখন গিদধর কি মাঈ হয়ে যায় সুরতিয়া। বোঝে পেটের ভেতরে মোচড়াচ্ছে। ঘোমটা

টেনে নাবায় কপালের ওপর। বলে, '.... দিদি কেন আছে?'

'কেন? ও হো ভাতের ফ্যান? তুমি খাবে? দাঁড়াও আম্মাকে বলছি।'

বাটি ভরে ফ্যান নিয়ে আসে রেহানা — তারপর কৌতূহলে দাঁড়িয়ে থাকে সুরতিয়ার সামনে। মানুষের ফ্যান খাওয়া দেখবে বলে ন-বছরের রেহানা ওর সামনে থেকে চলে যেতে পারে না।

'নিমক দিবি দিদি?' সুরতিয়ার দুই করতল গরম হয়ে ওঠে ফ্যানের তাপে। জিভ ভিজে যায় লালাক্ষরণে।

রেহানা ছুটে নুন আনে চামচে করে। বলে, 'দাঁড়াও আমি ঘুঁটে দিই। রাখো, বাটিটা মাটিতে রাখো।'

হাঁটু ভেঙে বসে রেহানা, নুন মিশিয়ে দেয় ফ্যানের বাটিতে। আর অমনি হাঁটু গেড়েই বসে থাকে চামচ হাতে, সুরতিয়া বাটি তুলে তৃষ্ণার্ত গাভীর মতো চুমুকে চুমুকে বাটি নিঃশেষ না-করা পর্যন্ত। এমন আশ্চর্য ঘটনা আম্মাকে বলাতেও তিনি বিন্দুমাত্র অবাক না হলে রেহানা দৌড়ে দিদির কাছে যায়, 'বড় আপা, গিরধারীর মা ফ্যান খেয়েছে।' হাসিনার মুখটা করুণ হয়ে যায়। সেলাই থেকে চোখ না সরিয়েই বলে, 'ও খুব গরিব। খেতে পায় না তাই খেয়েছে। তবে ফ্যান খাওয়া ভালো, ভিটামিন আছে।'

রেহানা বলে, 'তবে আমরা খাই না কেন? আমরা তো ছাগলকে দিতাম। দিতাম না?'

হাসিনা একটু মুশকিলে পড়ে। এমন পুষ্টিকর খাদ্য নিজেরা না খেয়ে ছাগলকে দেয়ার কারণটা ও ঠিক চট করে বানাতে পারে না। এমন পুষ্টিকর খাদ্য, গরিব যারা, খেতে পায় না বলে তারাই খায়, চেয়ে চেয়ে খায়, এ ব্যাপারটাও যুক্তি দিয়ে সাজানো কঠিন। তার চাইতে সত্যি বলা অনেক সোজা। কিন্তু সেই সত্যকথন রেহানার কৌতূহল মেটালেও হাসিনার নিজের সইবে না। তাই সে বোনকে বলে, 'তোমার পড়াশোনা নেই? এখনও পর্যন্ত একদিনও রোজা রাখনি, মনে আছে? যাও পড়তে বোস, নয়ত তোমার স্কুলের ক্রাফট নিয়ে এসো।'

রেহানা প্রায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায়। দেশলাই বাক্স, আঠা, জরি, চুমকি আর পুঁতি নিয়ে আসে। ওয়াল হ্যাঙ্গিং তৈরি করতে হবে।

রোজার কদিন আবার সন্ধেবেলা আসতে হয় সুরতিয়াকে। বেগুনি, আলুর চপ, মিষ্টি, মুড়ি খাওয়া হয়। লুচি পরোটা তরকারি তৈরি হয় কোনওদিন। সবার খাওয়া হলে সুরতিয়া বাসন মেজে ডাকে — 'হে মাঈজি হামি বাসন মেসে দিয়েসে।' রেহানা দৌড়ে আসে এক ঠোঙা খাবার নিয়ে। সুরতিয়ার আঁচলে দিয়ে দেয়। খুব করুণ মুখে বলে, 'আজ ফ্যান নেই।'

গিরিধারী একদিন বলে, 'ভাত দে, হররোজ চপ মুড়ি আচ্ছা নহি লাগতা।'

সুরতিয়া মুশকিলে পড়ে। রাতে সে উনুন ধরাচ্ছে না। দিনের বেলা কাঠকুটো জ্বেলে আলুভাতে ভাত রেঁধে মায়-ব্যাটায় খায়। রোজ ভরপেট ভাত হয় না। গত দু-মাসের মাইনে থেকে সে ছেলের জামা কেনার পয়সা রাখতে পারেনি। সে মনে মনে ভেবেছে

পরবে বখশিস পেলে কিনবে। ছেলের কথায় সে চুপ করে থাকে। গিরিধারী বলে, 'ভাত না দিবি ত রোটি পাকা। আলু ভরকে রোটি হামারা বহুত পসন্দ্। বহুত আচ্ছা লাগতা।'

'কাল দেগা বেটা, অব শো যা।' মাত্র এটুকুই বলে সুরতিয়া।

নতুন কাপড় পাবার আগে সুরতিয়া একপ্রস্থ পুরনো শাড়ি ব্লাউজ পায় মনিব বাড়ি থেকে এই শর্তে যে ও সেগুলো পরেই কাজ করতে আসবে। হাসিনা বলে, 'আম্মা ওকে আমার এই ছাপা শাড়িটা দিই। আমার ব্লাউজ হবে না, সালমার ব্লাউজ হবে মনে হয়। যা নোংরা জামাকাপড়ে আসে দেখলে ঘেন্না হয়।'

পরিষ্কার শাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত নাবে সুরতিয়ার। তাতে পায়ে জার্মান সিলভারের মল দেখা যায়। সালমার খুব ছটফটে উচ্ছল স্বভাব — একটানে সুরতিয়ার ঘোমটা নাবিয়ে দিলে ওর কাঁধের একটু ওপরে ঝুলে থাকা ছোট চুল বেরিয়ে পড়ে। হাসিতে ফেটে পড়ে সে, 'বড়ম্মা, দেখুন এ যে একেবারে বয়কাট চুল। মুখখানা লম্বাটে — আমি এর নাম দিলাম রিনি সাইমন। শুধু চোখ দিয়ে যদি ...... ।'

হাসিনা হাসি চেপে বলে, 'তুমি কি চুল কেটেছ?'

সুরতিয়া নির্বোধের মতো হাসে, 'নহি দিদি, হামরা ত অ্যায়সে হি .....।'

আজ কাজে যায়নি সুরতিয়া। বাড়িতেই হাসিনার দেওয়া শাড়ি ব্লাউজ পরে মুখখানা গামছায় মুছে নেয়। হাত দুটো আজ এতদিন পর ওর ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। হাতে কোনও চুড়ি পরে না ও। গলায় একটা স্টিলের চেন আছে। কানেও কিছু নেই। কিন্তু ছেলের সামনে এখন নতুন করে এসব পরা যায় না। তার ছেলে খুব হঁশিয়ার লেড়কা — ঠিক বুঝে ফেলবে। আজ মামা ডেকেছে, ওর বাবুজি এসেছে পাটনা থেকে ওদের নিতে; তাই মায়ের এত সাজ।

সুরতিয়া তো রামঅবতারের চেহারাই ভুলে গেছে। ছেলে বছরখানেক হতেই ও চলে এল তো সেই ছেলেরই বয়স এখন তেরো-চোদ্দ। তেরো সাল বাদ ওর মরদ কেন এল ও বুঝে উঠতে পারে না। তার ঝোপড়ি এক উঠোনে হলেও তাকে রাস্তা ঘুরে সামনের গেট দিয়ে বাপের ঘরে ঢুকতে হয়। বাপ নেই, মা নেই, তাই উঠোনের দিকে দেয়াল তুলে দিয়েছে বড়ভাই। ভাবি বলে, নাকি দাদার বিজনেসের পার্টি আসে, সুরতিয়ার ঝোপড়ি দেখা গেলে ওদের লজ্জা হবে। তাছাড়া তাতে সুরতিয়ারই নাকি ভালো হল, একদিকে পাকা দেয়াল পেল। দাদা টালির ছাদ করে দেয় তার আদরের বোনটিকে। অন্য তিনদিকে ইটের দেয়াল করে দেয় মাটির গাঁথনিতে। কেরোসিন তেলের টিন পিটিয়ে চ্যাপ্টা করে দরজা করে দেয়। ভাবি নথ নেড়ে বলে, 'বহুত রুপিয়া খর্চ হো গলবা।'

দাদার উঠোনে চারপাইতে দাদা আর রামঅবতার বসে সিগারেট খায়। অনেকদিন পর সুরতিয়া আর গিরিধারী ভরপেট ভাত, ডাল, ভাজি, তরকারি, আচার খায়। মামা গিরিধারীকে ডাকে। গিরিধারী ভয় আর বিস্ময়ে এগোয়। বাপ্, এই লম্বা চওড়া আদমি ওর বাবুজি? কেমন গোঁফ, কেমন ধবধবে পিরান আর চুস্ত পরা, কেমন জুতো, হাতে ঘড়ি, গলায় সোনার হার। মামা চোখ ইশারা করলে গিরিধারী বাপের স্ফীত দুই পায়ের পাতা স্পর্শ

করে। কী পরিষ্কার পা যে বুড়ো আঙুলের গোড়ায় ঘন লোম ঘাসের মতো উচিয়ে আছে ও দ্যাখে।

ভাবি বললেও সুরতিয়া ওঠে না। একগলা ঘোমটার নিচে ঠোঁট টিপে বসে থাকে কাঠ হয়ে। ভালো-মন্দ, ভয় আনন্দ, তার কোনও অনুভূতিই জাগে না। শুধু উৎকর্ণ হয় ও যেন একটা শব্দও শ্রবণের বাইরে যেতে না পারে।

কিন্তু রামঅবতারের কথা শুনে ও মাথা নাড়ে, 'কভি নহি, কভি নহি, মেরা বেটা, গিরধর মেরা বেটা হ্যায়। যবসে হাম ঘর ছোড় কর চলি আয়ি, উস দিনসে ও সিরেফ মেরা বেটা হ্যায়। অউর কিসিকা কুছ নহি।'

এপক্ষে রামঅবতারের সাতটি মেয়ে। তাদের কারও কারও বিয়ে হয়ে গেছে। সে তাই ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। তার এত জমিন, বাড়ি, এসব কে দেখবে তা না হলে? ও বরং সুরতিয়াকে কিছু টাকা দিয়ে দেবে। তাছাড়া সুরতিয়া মুসলমান বাড়িতে কাজ করছে। রামঅবতার তার ছেলেকে কী করে মুসলমান বাড়িতে কাজ করতে দেয়? দেশে জানলে কেউ তার হাতে জল খাবে?

ঝমঝম পা ফেলে ও ঝুপড়িতে চলে আসে। পারলে ভাত তরকারি উগরে দেয়। কেননা দাদা আর ভাবি বলে এটা গিরধারীর পক্ষে ভালো। সুরতিয়ার পক্ষেও ভালো। না হয় রামঅবতার মাসে মাসে ওকে টাকা দেবে। গিরধারী কত আরামে থাকবে সেটা সুরতিয়া ভাবল না?

বিকেল পর্যন্ত গিরিধারী ওখানেই থাকল। সন্ধেবেলা এসে মাকে দেখাল নতুন জামা কাপড় বাবুজি কিনে দিয়েছে। সুরতিয়ার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। ও উঠে হুঁকো সাজে। তামাকের ধোঁয়ায় ওর মাথাটা হালকা হয়।

রাতেও ছেলে মামার বাড়ি থেকে খেয়ে আসে। মাকে বলে, 'বাবুজি হামকো লে যায়েগা।'

'ত ফির যা উসকা সাথ।' সুরতিয়া শুয়ে পড়ে।

'ও ত আচ্ছা আদমি। তু ভি চল হমারা সাথ।'

'নহি।'

'কাহে?'

'উ হামকো যানে নহি বোলা।'

'ত হামভি নহি যাউঙ্গা।' বলে মাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে গিরিধারী।

সুরতিয়া উঠে ছেলের শিয়রে বসে। হুঁকো সাজতে ইচ্ছে করল না বলে বিড়ি ধরায়। ও তো সতীনের ঘর করবে না বলে অমন শ্বশুরবাড়ি স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছিল। আজ তেরো বছর পরে সেই শ্বশুরবাড়িতে ওকে যেতে বললেও ও যেত না। কিন্তু ওর বর তো তা বলেনি। এখন তার শরীর শুকিয়েছে। সে আর জোয়ানি নয় তবু তো সে এখনও অওরত। কিন্তু সে যে অওরত, একথাটা কেউ ভাবেনি। হয়তো সে নিজেও ভাবেনি। সে তো এখন শুধু গিরিধারীর মা। গিরধারী কি মাঈ। তাই ছেলে ঘুমোলেও সে ঘুমোতে পারে না। যেন

কেউ আসবে তার বেটাকে নিয়ে যেতে তাই সে ছেলের শিয়রে নিশি জাগে। বাইরে আকাশ জাগে। তারারা জাগে। হাওয়ারা ছোটাছুটি করে জাগে। শব্দহীন আনন্দে শাদা ফুলগুলি ফুটে ওঠে। গাছেরা পাতা দিয়ে ঘিরে রাখে তাদের। মাটির গভীর থেকে উঠে আসে কেঁচো, পিঁপড়ে। আরশোলারা দেয়ালের ফুটো থেকে, রান্নাঘরের আনাচকানাচ, ফাটল থেকে খরপায়ে বেরিয়ে আসে। হেলেদুলে এঁকেবেঁকে কোনও সরীসৃপ চলে যায়।

সুরতিয়া যেন একা জাগে না। এই সব প্রাকৃতিক জীবও জাগে। কার সাধ্য তার ছেলেকে নিয়ে যায় এমন জাগরণ থেকে?

সারাটা রাত সুরতিয়া গিরিধারীর মা হয়ে জেগে থাকে।

মেয়েদের সকালে স্কুল বলে ফতিমা এমনিতেই ভোরে ওঠেন। এখন রোজার মাস বলে রাত তিনটের সময় উঠে হিটারে ভাত রাঁধেন। ছেলেমেয়েরা যারা যারা রোজা রাখবে তারা, তিনি নিজে আর মইনুদ্দিন সাহেব দুধ ভাত খেয়ে নেন যতটা পারেন। সাহানা ক্লাস সেভেনে পড়ে, খুব শক্তসমর্থ বড়সড় চেহারা, এবছর প্রথম থেকেই রোজা রাখছে। নাসিরুদ্দিন ফাইভে পড়ে, সেও একদিনও কামাই করেনি। সে রোজ সন্ধেবেলায় কুর্তা পাজামা পরে, মাথায় শাদা নেটের কাজ'করা টুপি, কোরান পড়ে। তার নিষ্ঠা, স্মৃতি আর বুদ্ধি দেখে মইনুদ্দিন ভাবেন ওকে মাদ্রাসায় পড়িয়ে মৌলবি করলে হত। কিন্তু তিনি পরিবর্তমান দুনিয়াকে ঠাহর করে দেখেছেন ইংরেজি শিক্ষাই ভালো। তিনি নিজে ভালো আরবি জানেন, তাঁর বিবিও জানেন, তাতেই নাসিরের চলবে এটা তাঁর মনে হয়।

দরজা খুলে একে একে বোনেরা বেরিয়ে আসে। ক্লাস টেনের সালমা, নাইনের রোশেনারা, সেভেনের সাহানা আর ক্লাস ফোরের রেহানা। সবচেয়ে ছোট পাঁচ বছরের সুলতানা, সে মায়ের পাশে ঘুমোয়। ফতিমা একটু শুয়ে নেন এসময়। হাসিনাই সামলায় বোনেদের স্কুল যাওয়া পর্বটা।

'এ কী! এত ভোরে তুমি কেন?'

সালমার পেছন পেছন বাকি বোনেরা গলা বাড়িয়ে দেখে বাইরের বারান্দায় চট পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে গিরিধারী ঘুমোয়। তার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে ওর মা।

সুরতিয়া জোড়হাত করে। তার বর আজকের রাতের গাড়িতে মুলুক যাবে। ততক্ষণ তার ছেলেকে যেন এই বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়।

হাসিনা বোনেদের বলে, 'তোমরা যাও। বাস চলে যাবে। আমি আব্বাকে জিগ্যেস করছি।'

ভেতরে গিয়ে হাসিনা দেখল আব্বা ওজু করছেন। ও জানে এতে তাঁর পনেরো মিনিট লাগবে। এই হাত ধুচ্ছেন ত ধুচ্ছেনই। সেই পা ধুচ্ছেন ত ধুচ্ছেনই। কুলকুচো করছেন করেই যাচ্ছেন। ও মায়ের কাছে যায়।

'আম্মা।'

ফতিমা ধড়ফড় উঠে বসেন। সব শুনে বলেন, 'আহা, থাকুক আজ। কত কষ্ট করে

ছেলেকে মানুষ করছে, তাকে নিয়ে গেলে ও বিটি আর বাঁচবে না।'

হাসিনা বিরক্ত হয়, 'কোথায় থাকবে অত বড় ছেলে? তার ওপরে চোর কি না কে জানে।'

সে উপায়ও ফতিমা বাতলে দেন, 'মুরগির ঘরটা ওকে দিয়ে সাফ করা আজ। চৌবাচ্চায় পানি ভরুক। পেছনের বাগানটা সাফ করুক। কাজে কম্মে থাকলে ভালো থাকবে। সন্ধেবেলা দুটো টাকা দিলেই হবে।'

সন্ধেবেলা চা খাবার খেয়ে দুটো টাকা পকেটে রাখে গিরিধারী। তার জীবনের প্রথম উপার্জনের টাকা।

আঁচলে গিট দেখে সুরতিয়ার বুক ধবক করে ওঠে। ও বালতির জলেই টিপে দেখে আঙুল দিয়ে -- নোট! খুচরো টাকা নয়। পয়সা নয়। কাপড় কাচার সময়, হাসিনা, বেশির ভাগ দিন দাঁড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ কাপড়ে সাবানের ফেনা থাকবে ততক্ষণ জলে ধুতে হবে। যখন একটুও ফেনা থাকবে না তখন নিজে বালতি ভরে নিয়ে তারে টানটান মেলবে। ক্লিপ আটকাবে। আজও হাসিনা দাঁড়িয়ে। এদিকে বালতির ভেতরে জলের মধ্যে দু-হাত ভরে দিয়েছে সুরতিয়া। কচলাতে কচলাতে গিট খুলে নোট দু-খানা বের করে নেয়। কত টাকার নোট ও বুঝল না, তবে বড়। ডান হাতের মুঠোয় দোমড়ানো নোট নিয়ে ও একবার ভাবল বলে মাঠে যাবে। কিন্তু তাতে পরে খোঁজাখুঁজি হলে সন্দেহ হবে ভেবে ও হাতটা উঠিয়ে পা চুলকোবার জন্য নিচু হল। আর শাড়ির ঘেরও নিচু হয়ে পা ঢাকল। ও পায়ের তলায় চাপা দিল টাকাটা। হাসিনা বালতি নিয়ে বাইরের তারে কাপড় মেলতে গেলে ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। উঠোনের কোণে জড়ো করা কাগজ কুচি, ঠোঙা আর ময়লার মধ্যে নোট দুটো, লাল দেখে বুঝল কুড়ি টাকার দু-খানা নোট, রেখে দিল। এই ময়লাগুলো ঘর ধোয়া মোছা হলে, ও-ই বাইরে ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে।

ঘর মুছতে মুছতেই সুরতিয়া শুনতে পেল ফতিমা টাকা খুঁজছেন। হাসিনা, উত্তেজনায় লাল মুখ ওকে জিগ্যেস করে, 'অ্যাই গিরধর কি মা, তুমি আঁচল খুলে দুটো কুড়ি টাকার নোট নিয়েছ?'

'না মা, হামি নেয়নি।'

'তুমি নাওনি তো কে নিয়েছে? বল কোথায় রেখেছ?' হাসিনা বলে।

'হামি নেয়নি মা ত ফির কাঁহাসে দেব?'

'মিথ্যে বোলো না।' ফতিমা মেয়ের পেছনে দাঁড়ান।

'সাচ বলছি মা, হামি টাকা দেখেনি।'

ফতিমা বলে ওঠেন, 'তুমি আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে দেখছি।'

সুরতিয়া ঝট করে শাড়ি খুলে ফেলে ঝাড়ে, 'দেখো, হামরা পাশ রুপেয়া কাঁহা, দেখো।'

হাসিনা বলে, 'কাপড় খুলছ কেন, অসভ্যের মতো? আম্মা ওর কাছে নেই। ও কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। শিগগির বল নইলে পুলিশে দেব। আব্বা আসুন আগে।'

সুরতিয়া ভয় পায়। চুরি যে ও করে না তা ঠিক নয়, তবে টাকাপয়সা কোনওদিন

চুরি করেনি। টুকটাক জিনিস চোখের সামনে পাহারাহীন থাকলে ও তো সেটা নিতেই পারে বলে ওর মনে হয়। এভাবে ও ভাবির চারটে চামচ সরিয়ে বিক্রি করেছে। মইনুদ্দিন সাহেবের বাগানে এটা-ওটা লোহার জিনিস যা পড়েছিল, এ কয়েক মাসে তা পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকানে চলে গেছে। একটা কাঁসার ঝিনুক পড়েছিল আলমারির পেছনে, সেটাও ও বেচে দিয়েছে। কিন্তু এসব ও খুব সাবধানে করে। রাস্তায় আগের মতো ঘুরে ঘুরে জিনিস কুড়োতে পারে না সে তো এখানে কাজ করার জন্যই। কাজে কাজেই এরকম দু-চারটে জিনিস সরানোর হক ওর আছে বইকি। কিন্তু আজই প্রথম ও টাকা সরাল। তাও টাকাটা হাতের মুঠোয় এসে গেল বলে ও লোভ সামলাতে পারল না। এ টাকাটা দিয়ে ও গিরিধারীর জন্য একটা চাদর কিনবে ভেবেছিল। শীতে ছেলেটার খুব জাড় লাগে।

কিন্তু পুলিশের কথায় ও ভয় পায়। যদি গিরধারীকে ধরে পুলিশ? ও উঠোনের কোণে যায়। নোট দুটো বের করে। হাসিনার হাতে দেয়। হাসিনা নোট দু-খানা নিয়ে বালতি থেকে আস্তে জল ঢেলে ধুয়ে বারান্দায় রোদে দেয়। দুটো পরিষ্কার পাথর চাপা দেয়।

ফতিমা দুটো টাকা দেন হাসিনাকে, 'বউকে বল এ দুটো নিতে।'

টাকাটা হাত পেতে নিয়ে সুরতিয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। দু-টাকায় কী হবে? গিরিধারীর চাদরের দাম পঁয়ত্রিশ টাকা।

ফতিমা বলেছিলেন, 'আহা গরিব মানুষ, লোভে পড়ে নিয়ে ফেলেছে টাকাটা, ওকে মাপ করে দিন।'

তাতে ইদ পর্যন্ত ওকে রাখতে রাজি হন মইনুদ্দিন সাহেব।

আবার সুরতিয়া শুধুই কাগজ কুড়োনিয়া হয়ে যায়। লাইনের ধারে ফেলে দেওয়া কাঁচা কয়লা কুড়োতে গিয়ে বাউরি মেয়েদের সঙ্গে আঁচড়া-আঁচড়ি করে মার খায়। সে তো এখানে পরদেশি। তার তো আছে এক বেটা। গিরিধারী। সেই বেটা তো তাকে রক্ষা করে না উলটে মায়ের কাছে রোটি চায়। সিনেমা দেখার পয়সা চায়। সুরতিয়া বলে, 'কাম কর বেটা।'

তা গিরিধারীর বয়ে গেছে কাজ করতে। ও একদিন মামার কাছে ঠিকানা জেনে মায়ের কয়লা বেচা পয়সা চুরি করে বাবার কাছে চলে যায়। সুরতিয়া কাঁদে। তার বেটাই যদি তাকে ভুলে গেল তো রইল কী? সে কার জন্য কয়লা কুড়োবে? বেচবে? কার জন্য কাগজ, টিনা, লোহা কুড়োবে? চুরি করবে? বেচবে? কার জন্য চুলা ধরাবে? পুরি ভাজবে? রোটি বানাবে? ছট পরবে কার জন্য মিঠা ঠেকুয়া বানাবে? সবই তো গিরিধারীর জন্য!

গিরিধারী আসে মাস দুয়েক পর। আবার যায়। আবার আসে। সুরতিয়া আর কিছু বলে না। ছেলে এলে, ঘুমোলে সেও ঘুমোয়। তার আর কোনও জাগরণ নেই। প্যাঁচারা জাগে। সারারাত। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে। সাপ, ইঁদুর, টিকটিকি, আরশোলা আর

পোকারা জাগে। সেই জাগরণে শুধু গিদধর কি মাঈ জাগে না। এমনকি সুরতিয়া যেন সকালে চোখ মেলে কিন্তু জাগে না।

এখন তো রূপনারায়ণপুরে অনেক ছেলেমেয়ে ছেঁড়া কাগজ পলিথিন প্যাকেট, কৌটো, লোহা কুড়িয়ে বেড়ায়। মিহিজামের ছেলেমেয়েরা আসে। গিরিধারীর মা তো একা কুড়োয় না। আরও তিন-চারটে বউও আসে, টায়ারের নয় তো হাটে কেনা নীল হাওয়াই পায়ে। পিঠে বড় বড় পলিথিনের বস্তা। তারা কথা বলে না বললেই হয়। নীরবে চোখ মাটিতে রেখে এগোয়। এখন তো রূপনারায়ণপুরে কত বাড়ি, কত লোক। আর যত বাড়ি, তত লোক ঠিক তত আবর্জনা। ফেলে দেওয়া জিনিসের পাহাড়। সেসব ফেলার তেমন করে কোনও ব্যবস্থা নেই। সুরতিয়া সেই আবর্জনার মধ্যে মানবশরীর নিয়ে ঘোরে এই সব কাগজ কুড়ুনিদের সঙ্গে — যেমন কাক মরা ইঁদুর মুখে করে নিয়ে যায়, কুকুর নোংরা এঁটো খায়, শকুনে মড়া খায় তেমনি ও মিশে যায় মনুষ্যেতর কোনও প্রাণীর মতো মনুষ্য জগতের বাইরে তার ভগ্ন প্রতিমার মতো শরীর নিয়ে। তার সে শরীরে কোনও জাগরণ নেই। কোনও উদ্যম নেই। সে শুধু এক জাগরণহীন, উদ্যমহীন শরীর বাঁচিয়ে রাখার স্বভাবে বেঁচে থাকে।

বিয়ের ছ-মাস পর হাসিনা আর তার স্বামী বাস স্ট্যান্ড থেকে রিকশা চাপে। হাসিনা রিকশাওলাকে বলে, 'আরে গিদধর তুই?'

গিরিধারী সলজ্জ হাসে। 'দিদি ভালো আছো?'

'কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'তোর মা কেমন আছে?'

গিরিধারী জবাব দেয় না। একটু পরে বলে, 'নিজে রিকশা কিনব দিদি — কদিন বাক।' তারপর আবার একটু হেসে বলে, 'ঘরমে বহু ভি হ্যায়।'

হাসিনা বলে, 'তাহলে তোর মা এখন আরামে আছে। লোকের বাড়ি আর কাজ করতে দিস না মাকে।'

গিরিধারী জোরে প্যাডেলে চাপ দেয়।

এসময় ভাগ্যিস ওর মা কাগজ কুড়োয় না। গিরিধারী তো আলাদা ঘরে থাকে। সেখান থেকে মায়ের ঝোপড়ি দেখা যায় না। তবু ও জানে ওর মা এসময় ঝোপড়িতে অন্ধকারে জেগে বসে থাকে।

গিরিধারী রিকশা জমা দিয়ে ঘরে যায় মায়ের ঝোপড়ির সামনে দিয়ে। যেতে যেতে ও বলে, 'নিদ নহি আয়ি মাঈ?'

মা উত্তর দেয়, 'অব ত শো যায়গি।'

চব্বিশ ঘন্টায় এইটুকু জাগরণের জন্যই বোধহয় সুরতিয়া বেঁচে থাকে।

প্রতিক্ষণ ১৯৯২

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কৃষ্ণা ভাবছিল যদি দরজাটা খোলা থাকে তো বেল টিপতে হয় না। তাদের কলিংবেলের আওয়াজটা খুব সুন্দর -- যেন এক ঝাঁক পাখি ডেকে ওঠে। কিন্তু সেই যান্ত্রিক কাকলিতেই মা-র ঘুম ভেঙে যাবে। সারাটা দুপুর মা ঘুমোবে না, এখন এই বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। আর এত পাতলা ঘুম মায়ের যে, কৃষ্ণার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু সেটা চাপা দিয়ে রাখে। রাখে মানে রাখতে হয়। ওর প্রতি মুহূর্তের ভয়, উৎকণ্ঠা আর এক পরিত্রাণহীনতার মধ্যে দিয়ে প্রতিদিনের হেঁটে যাওয়া। এমনিতেই কণিকা ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছেন। সুবিনয়ের দীর্ঘ অসুস্থতা, মৃত্যু এবং মৃত্যুর কারণ, গোটা পরিবারের নিষ্ঠুরতা তাঁকে ধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তার ওপরে তাঁর রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পাবার পর তিনি যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছেন। কৃষ্ণা কাছে গেলেই আঁতকে ওঠেন, 'তোকে বলেছি না আমার কাছে একদম আসবি না?'

কতদিন মা-র পাশে, মাকে জড়িয়ে ধরে, মা-র গায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোয় না কৃষ্ণা।

বেল বাজলে দরজা খুলে দেয় হানা। হানার কেউ নেই বলে বোধহয় এ বাড়িতে টিকে গেল। জ্ঞান হবার পর থেকেই তো হানাকে দেখছে কৃষ্ণা। এ বাড়িতে একা হানাই সব কাজ করে। ঠিকে লোক রাখবে বলেছিল কৃষ্ণা, কণিকাকে দেখাশোনা করতেই তো কতটা সময় লাগে। কিন্তু হানা বারণ করে, 'কী দরকার খুকু, বাইরের লোকের? দু-জন মানুষের কাজ কী এমন বেশি? ও আমি একাই পারব।' কৃষ্ণা বুঝেছিল কেন হানা বাইরের লোক রাখতে চায় না। বাড়ির লোক, নিজেদের আত্মীয়স্বজন, রক্তের সম্পর্কে যারা ঘনিষ্ঠ তারা যদি এমন নিষ্ঠুর হতে পারে, সেসব তো হানা দেখেইছে, তাকেও তো তারা রেহাই দেয়নি, তাহলে বাইরের লোক কী করবে, বা আদৌ এ বাড়িতে কাজ করবার জন্য তাদের পাওয়া যাবে কি না, এসব কথা হানা নিশ্চয় ভেবেছে। হানা না থাকলে কৃষ্ণার বোধ হয় লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেত।

'মা কি ঘুমোচ্ছে?' হানার হাতে ব্যাগটা দিতে দিতে জিগ্যেস করে ও। 'এই একটু আগে ঘুমোল, সারা দুপুর কী সব কাগজপত্তর নিয়ে বসেছিল।' হানা ব্যাগ থেকে পলিথিন প্যাকেটে রাখা ছাতা বের করে-- 'ইসস্, এই ভেজা ছাতাটা ব্যাগে রেখেছ? দাঁড়াও মেলে দিই আগে।' কৃষ্ণা ডাইনিং টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে। তার স্ট্র্যাপ দেয়া জুতো, চেয়ারে না বসে খোলা যাবে না। জুতোর তলায় কাদা লেগে আছে। সে আপন মনেই বলে, 'বৃষ্টিতে

সব পচে গেল, ধুর, স্যান্ডাকটা পরে গেলেই হত। হানাদি? আমার লাল কালো জামা আর সায়া দাও, চান না-করে ঘরে ঢুকব না।' জুতোটা দু-আঙুলে ঝুলিয়ে বাথরুমে ঢোকার আগে বেসিনের ওপরে লাগানো আয়নায় চকিতে মুখটা দেখে নেয় একবার। হানা ওর জামাকাপড় নিয়ে আসে, 'এক্ষুনি জল ঢেলো না খুকু, আমি গরম জল দিচ্ছি।'

'গরম জল! ও মাই গুডনেস! কেন?'

'কাল রাতে ঘুমের মধ্যে কাশছিলে, তোমার তো টনসিলের ধাত।'

'তোমাকে নিয়ে আর পারি না হানাদি। অত পুতুপুতু কোরো না। গরম জল লাগবে না। নো হট ওয়াটার।' বলে দরজাটা বন্ধ করে দেয় কৃষ্ণা। বাইরে হানা গজগজ করে, ও শুনতে পায়।

'এর পরে যদি জ্বর হয়, চারদিকেই জ্বর হচ্ছে, তখন কী হবে? একটা কথাও যদি শোনে এই মেয়ে।'

দরজা খুলে মুখটুকু বার করে কৃষ্ণা। 'দাও, হানাদি, তোমার বকবকানিটা থামাও।'

হানা হাসিমুখে গরম জলের ছোট বালতিটা নিয়ে আসে।

একটু পরে কৃষ্ণা খেতে বসে। 'যাই বলো হানাদি, য়্যু আর গ্রেট। গরম জলে চানটা করে এত ঝরঝরে লাগছে, মনে হচ্ছে সারাদিন বাড়িতেই আছি। বাসে যা ভিড় আর যা ঘামের গন্ধ, মুখের গন্ধ', বলতে বলতে হাত দু-খানা শুঁকে নেয় একবার। 'আজ ব্যাগু কেটেছি, ওঁরে বাঁপরে কী বিকট গন্ধরে বাঁবা।'

হানা ক্যাসিরোল থেকে ওর স্পেশাল হালকা, নরম রুটি প্লেটে দেয়। নারকোল দিয়ে আলুর দম। 'মাকে খাওয়ার পরে ক্যাপসুল আর ট্যাবলেটটা দিয়েছিলে হানাদি? দুপুরে ঠিকমতো খেয়েছিল?' হানা বলে, 'হ্যাঁ— আজ অন্যদিনের চাইতে ভালো মনে হল। পায়খানায় তিনবার গেছে।'

'পেট ব্যথা করেছিল?'

'ওই পায়খানা যাবার আগে বলছিল, ব্যথা। .... ও কী! হাত গুটিয়ে নিলে যে বড়? পুডিং খাবে না?'

হানা ছোট বাটির ঢাকা তুললে কৃষ্ণা বাঁ হাত নেড়ে বারণ করে, 'ওটা রাতে খাব। পেট ভরে গেছে। বেণুমামা ফোন করেছিল?' তর্জনী দিয়ে প্লেটে আঁকিবুকি কাটে ও।

'কই না তো।' হানা প্লেট চামচ তুলে নেয়।

কৃষ্ণা ঢকঢক করে জল খায়। বাঁ হাতের উলটো পিঠে ঠোঁটের ওপরে জল মুছে কোনও শব্দ না করে আস্তে চেয়ার পেছনে ঠেলে দেয়। চান করেই সে একবার পর্দা তুলে মাকে দেখেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে। বাইরের জামাকাপড়ে সে কখনও মায়ের ঘরে ঢোকে না। বেণুগোপালের দু-তিন সেট পায়জামা, পাঞ্জাবি, এ বাড়িতে থাকে। দেয়ালের দিকে ফিরে ঘুমোচ্ছিলেন কণিকা। জানলার পরদা টেনে দেয়া, বাইরে আকাশ ঘন এবং নত, কৃষ্ণা পরদা সরালে খানিকটা আলো ঢোকে— সে আলোয় দেখা যায় কণিকার কালো, সোজা চুলের গুচ্ছ

বালিশের ওপর ছড়ানো। সুবিনয়ের মৃত্যুর পর কণিকা নিজেই কাঁচি দিয়ে চুল খানিকটা কেটে ফেলেছিলেন, কৃষ্ণা এসে পড়াতে সবটুকু কাটা হয়নি। তাঁর চুল খুব বাড়ে বলে এখনও গোটা পিঠ ঢেকে থাকে। কৃষ্ণা ভাবল এবারে মা-র চুল ছোট করে ছেঁটে দেবে। এই বর্ষায় ব্রেক চুল থেকেই ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। জোড়া খাটে সে মা-বাবার মাঝখানে ঢুকে পড়ত। ক্লাস নাইন পর্যন্ত। শেষে বাবা একটা চৌকিতে অন্য ঘরে শুতেন। স্বপ্নদীপ শুত ডিভানে, এখন সেটায় কৃষ্ণা শোয়। ওঘরে। খাট দুটো আলাদা করে পাতা হয়েছে এ ফ্ল্যাটে এসে। বেণুমামা রাতে থাকলে একটায় শোন। আর রাতে থাকার মতো কেউ আসে না তাদের ফ্ল্যাটে। হানা এই ঘরের মেঝেতে শোয়। ফ্যানটা বোধহয় লো-স্পিডে দেওয়া। কেননা ওর অল্প গরম লাগে। ফ্যানের শব্দে ও প্রথমে শুনতে পায়নি, এখন শোনে কণিকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। মাকে ছুঁতে ইচ্ছে করে ওর, জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, কতদিন পরে এমন টানা ঘুমোচ্ছেন কণিকা যে, কৃষ্ণা চুপ করে বসে মায়ের ঘুমের আওয়াজ, যা নাকি শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসপতনে বোঝা যায়, শুনতে লাগল। এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তো তারও জীবন বাঁধা।

এই ছোট ফ্ল্যাটটা বেণুমামার বন্ধুর। সেই বন্ধু মানে আদিত্যমামা এখন দিল্লি থাকেন। তাঁর একটিই ছেলে — সে পুনেতে মেডিকেল কলেজে পড়ে। মামিও চাকরি করেন দিল্লিতেই। এই ফ্ল্যাটটার একটা চাবি বেণুমামার কাছে থাকে। উনি নাকি এটা কিনবেন, কিন্তু আদিত্যমামা এমনিতেই দিতে চান — ফলে ফ্ল্যাটটা খালি ছিল, সুবিনয়ের মৃত্যুর পরে বেণুমামাই কৃষ্ণাদের নিয়ে আসেন এখানে। সুবিনয়ের পারলৌকিক কাজ করতে উনিই নিষেধ করেছিলেন, কণিকা তবু ইতস্তত করছিলেন কিন্তু কৃষ্ণা বলে, 'যারা আমাদের তাড়িয়ে দিল, বাবাকে একবার দেখতে এল না, শ্মশানে পর্যন্ত গেল না তারা, তুমি আশা করছ আমাদের বাড়ি আসবে? তাছাড়া শ্রাদ্ধ করতে গেলে দাদাকে খবর পাঠাতে হবে, এসময় এলে ওর খুব ক্ষতি হবে মা, বরং বেণুমামা আর আমি খবরটা জানিয়ে দিই ওকে। তোমার মন খুঁতখুঁত করলে সে টাকাটা কোনও হাসপাতাল বা শ্মশানে দিয়ে দাও — বাবার আত্মা তৃপ্তি পাবে।' তার আগেই তো সবার রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল। রিপোর্ট পাবার পর, কণিকার রিপোর্ট পজিটিভ জানবার পর সব বদলে গেল। তাদের রান্নাঘরে ঢুকতে দেয়া হত না — তাদের সাবেককালের এজমালি রান্নাঘর। ঘর ভাগাভাগি আগে হলেও সেটা কাগজেপত্রেই ছিল। খাওয়া-দাওয়াও হত একসঙ্গে। সেই নিষ্ঠুরতা কৃষ্ণা কোনওদিনও ভুলতে পারবে না। হানা না থাকলে মা যে কী করত! আর বেণুমামাও যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে এল।

'কে? খুকু? কখন এলি? অন্ধকারে বসে আছিস কেন মা? আলোটা জ্বাল।' কণিকার গলা শুনে কৃষ্ণা উঠে পড়ে। হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করে। পরদাগুলো সরিয়ে দেয়। বলে, 'আমি তো অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি ঘুমুচ্ছিলে তাই ডাকিনি। চা খাবে?'

'দাঁড়া আগে বাথরুমে যাব।' কণিকা চিত থেকে কাত হন, তারপর শরীর ঘুরিয়ে বাঁ-হাতের কনুই-এ ভর রেখে, ডান হাতের পাতায় ভর দিয়ে ওঠেন।

'আমি ধরব মা?'

'নারে, পারব, এখনও গায়ে জোর আছে।' কণিকা নিচু হয়ে চটি খোঁজেন, কৃষ্ণা খাটের তলা থেকে কাপড়ের চটি, বেণুগোপাল বলেন, 'নিরিমিষ চটি', বের করে আনে। কণিকার মুখে কয়েকটা রেখা ফুটে ওঠে, 'তুই আবার চটি ধরছিস কেন? যা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়।'

'দিনকে-দিন তুমি বাতিকগ্রস্ত হচ্ছ', কৃষ্ণা উঠে ডাইনিং-এ যায়। 'এরপর হাতে পায়ে ফাংগাস ইনফেকশান হবে।'

'কী হল আবার?' হানা ট্রেতে চায়ের কাপ সাজায়।

'কী আবার হবে, চটি ধরলে হাত ধুতে হয়, তাই। বাব্বা, এরপরে .....' বলতে বলতে ফোন বেজে ওঠে আর কৃষ্ণা প্রায় লাফ দিয়ে বাইরের ঘরে বা ওর ঘরে ঢোকে। বিছানার পাশে ছোট টেবিলে ফোন।

রিসিভার তুলে ও বলে, 'হ্যালো?'

'কে খুকু? শোন আজ আমার যেতে দেরি হবে। আমার জন্য অপেক্ষা করিস না। কণিকে ব্যস্ত হতে বারণ করিস। গিয়ে বলব কেন দেরি হল। ও কে। কেমন আছে আজকে?'

'ভালো। কিন্তু তুমি আসবে তো? নইলে আমার খুব ভয় করে।'

'য়্যু আর ব্রেভ খুকু। সব ঠিক হয়ে যাবে। খেয়ে নিস। আমি খেয়ে আসব। রাখছি।'

বেণুমামাও হয়েছে তেমনি। কৃষ্ণাকে কোনও কথা বলবার সুযোগই দিল না। কে জানে কোথা থেকে ফোন করল। নিজের বাড়ির ফোনটা ব্যারিস্টার মামাকে দিয়ে দিল, তাঁর নাকি খুব দরকার। কিন্তু বেণুমামারও তো দরকার।

এঘরে এসে কৃষ্ণা দেখল, হানা মোড়ায়, আর কণিকা দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে চা খাচ্ছেন। 'কে ফোন করেছিল খুকু, ছোড়দা?'

'হ্যাঁ। দেরি হবে আসতে, বলল। খেয়ে আসবে বলল। হানাদি, আমাকে এক কাপ চা দেবে?'

কণিকা বলেন, 'রাতে থাকবে বলল? হানা আমাকে আর আধকাপ দিয়ো।'

'তোমাকে কিন্তু দেব না খুকু, তুমি বরং কমপ্লান খাও, কিংবা দুধ।'

'কেন, কেন? আ য়্যাম নট আ কমপ্লান গার্ল। আর দুধ খাবার বয়স পেরিয়ে গেছে, এ বয়সে দুধ খেয়ে কিস্‌সু হয় না।'

'সেই জন্যই তো এরকম চেহারা হচ্ছে। এই বয়সের মেয়ে, হাড় বেরিয়ে গেছে একেবারে।' কণিকা বলেন।

'বকো তো ওকে বউদি। আমাকে তো মানে না, এই এতটুকু খাবে পাখির মতো।' বলতে বলতে হানা ঠোঁটের কোণ দিয়ে চাপা হাসে। ওর হেয়ার লিপ, অপারেশন করেও একটু ফাঁক রয়ে গেছে, অপারেশনের দাগটাও, ফলে ওর ঠোঁটচাপা হাসিটা এ বাড়ির লোক ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। কৃষ্ণা একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ায় — 'দেখো কীরকম বডি ফিটনেস।' ডান হাতের আঙুল দিয়ে

বাঁ পায়ের পাতা ছোঁয় শরীর ঝুঁকিয়ে একবার, পরক্ষণেই বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ডান পায়ের পাতা ছোঁয়। খুব দ্রুত লয়ে করে যায় অনেকবার — তারপর বলে, 'ম্যাক্সি পরে আছি, পা তুলতে পারব না, নইলে অ্যায়সা ক্যারাটে দেখাতুম। কই, হানাদি চা দাও?'

কনিকা হাসেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তুমি খুব বীরাঙ্গনা, তবু যদি না রাত দুপুরে ভূতের ভয়ে মাকে জড়িয়ে না ধরতিস।'

'সে তো এখনও।' বলে কৃষ্ণা বিছানায় উঠে মা-র ছড়ানো পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে কোলে মুখ গুঁজে দু-হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে।

'খুকু!' কনিকা চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন, 'কী করছিস, তোর কি মাথা খারাপ হল? তোকে না বারণ করেছি? জানিস না তুই?' বলতে বলতে কৃষ্ণাকে ঠেলে ওঠাতে চেষ্টা করেন কনিকা, কিন্তু কৃষ্ণা আরও জোরে আঁকড়ে ধরে মাকে। বলে, 'তোমার পেটের ভেতর ঢুকে যাব। গোল পাকিয়ে শুয়ে থাকব। কেন তুমি অমন কর? কিছু হয়নি তোমার। দেখবে কদিন বাদে তোমার পেটের অসুখ সেরে গেছে।'

কনিকা এবার মেয়ের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেন। 'পাগলামি করিস না, কেন যে এত ভয় পাই, তুই বুঝবি কী করে? মা না হলে বোঝা যায় না। এ বড় ছোঁয়াচে রোগ খুকু, সর মা, লক্ষ্মীসোনা আমার।'

কৃষ্ণা ওঠে। হাত দিয়ে কপালের ওপর ঝেঁপে আসা চুল সরায়। 'খুব আনসায়েন্টিফিক কথা বলছ মা। তুমি জানো, তবু বলছ। তোমাকে ছুঁলে আমার অসুখ করবে? তা যদি হয় তো হোকগে, আমিও মরে যাব। বাইরে একটা কথা বলতে পারি না, বুক ফেটে যায়, আর বাড়িতে তুমিও যদি এমনি কর .....' বলতে বলতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকায় কৃষ্ণা, তার গলা কেঁপে যায়।

'চা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। আর একটু করে আনব?' হানাকে দেখে কৃষ্ণা চোখ মুছে ফেলে। কনিকা আঁচল দিয়ে গোটা মুখটাই মুছে নেন। গলা পরিষ্কার করেন একটা চেষ্টাকৃত কাশি দিয়ে। 'হানা, তুমি বরং দু-কাপ দুধ নিয়ে এসো, আজ আমিও দুধ খাব।'

'তুমি দুধ খাবে?' কৃষ্ণা অবাক হয়।

'কেন, আজ আমার পেট ভালো আছে, তাছাড়া হানা জল মিশিয়ে দেবে।'

'তুমি যে কী!' কৃষ্ণা গলা তুলে বলে, 'হানাদি, ওঘরে দিয়ো আমাকে। মা, আমি পড়তে যাচ্ছি। টিভি দেখবে? খুলে দেব?'

'নারে, আমি বরং একটু শুই।' কৃষ্ণা বালিশটা ঝেড়ে উলটিয়ে দেয়। বিছানাটা ঝাড়ে। চাদরটা টেনেটুনে ঠিক করে দেয়। কনিকা বলেন, 'খুকু, সন্ধে দিলি না?'

কৃষ্ণা হেসে ওঠে, 'সন্ধে না দিলেও সন্ধ্যা হয়ে গেছে মা। ঠিক আছে, আমি লেট সন্ধে দিচ্ছি, ওনলি ধূপ অ্যান্ড দীপ, নো শঙ্খধ্বনি।'

চন্দনের গন্ধে ঘর ভরে যায়। সলতে টেনে প্রদীপ নিভিয়ে কৃষ্ণা ওঘরে চলে যায়।

বেণুগোপাল কনিকার চেয়ে সাত বছরের বড়। তার মানে কনিকার চুয়াল্লিশ,

বেণুগোপালের একান্ন। বেণুগোপাল বিয়ে করেননি, থিয়েটার রোডে ওঁর অফিস, কিন্তু কলকাতার উত্তরতম প্রান্ত থেকে দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত ওঁকে প্রায় রোজই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। বিয়ে না-করলে নাকি মানুষের নানারকম বাতিক হয় — বেণুগোপালের পরোপকার করাটা প্রায় বাতিকের পর্যায়েই পড়ে এখন। ইদানীং একটু হাঁফিয়ে যান। কৃষ্ণা বলে, 'যতই হাঁফাও বেণুমামা, লোকের উপকার করতে না পারলে তোমার হার্ট অ্যাটাক হবে।' এখন ও ভাবে ভাগ্যিস বেণুমামা বিয়ে করেনি। কী ভাগ্যি যে বেণুমামার এমন একটা মহৎ বাতিক আছে — পরোপকার। কিন্তু পরোপকার মানে তো পরের উপকার, তারা কি তাহলে বেণুমামার পর? মা বলে মেয়েদের নাকি শ্বশুরবাড়িটাই আপন ঘর, বিয়ের পরে বাবা-মা, ভাই-বোন নাকি প্রায় পরের পর্যায়েই পড়ে। তাই যদি হবে, তাহলে তার কাকা, কাকিমা, জ্যাঠা, জেঠিমা, পিসিরা সবাই তাদের অচ্ছুৎ করে দিল কেন? রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে মায়ের এইচ আই ভি পজিটিভ জানার পর? মা-র জন্য কষ্ট পাবার বদলে সবাই এত ভয় পেল কেন? আর মায়ের কান্না! 'খুকু, এর চাইতে আমার ক্যানসার হল না কেন? মরেও তো শান্তি পাব না, কী হবে তোদের?' কৃষ্ণা মা-র গায়ে-পিঠে হাত বোলাতে গেলে কণিকা ফুঁপিয়ে ওঠেন, 'ছুঁস না আমাকে, ওহ্ ভগবান, কী পাপ করেছিলাম যে এত বড় শাস্তি দিলে?'

পাপ? শাস্তি? আসলে মানুষ কত দুর্বল। না, কৃষ্ণা সেরকম দুর্বল হবে না। বেণুমামা বলেছে সে সাহসী মেয়ে, 'ব্রেভ গার্ল', তা মা তাকে যতই ছেলেমানুষই ভাবুক আর ঠাট্টা করে বীরাঙ্গনাই বলুক। বেণুমামার পরামর্শে সে দাদাকে শুধু বাবার মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিল ফোনে। দাদার পড়া শেষ হতে এখনও দু-বছর, কত কষ্ট করে পড়াটা চালাচ্ছে ও, পার্টটাইম চাকরি করে, কী একটা স্কলারশিপ পায়, এখন দেশে এলে ওর সব নষ্ট হয়ে যাবে। কৃষ্ণা জানে এসব, আর এসব জেনে ফেলেছে বলে ওর নিজেকে কেমন অদ্ভুত লাগে। কলেজে বন্ধুদেরও সে বিশ্বাস করতে পারছে না — যদি তাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেয়? যার বাবা মারা গেছেন এইড্‌স-এ, যার মায়ের রক্তে রয়েছে এইড্‌স-এর ভাইরাস, তাকে তো কলেজ কর্তৃপক্ষ বিপজ্জনক মনে করতেই পারে। বন্ধুরা কেউ তার পাশে বসবার জন্য ব্যস্ত হবে না, একজন কুষ্ঠরোগীর চাইতেও সে অস্পৃশ্য হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হল তার পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাবে। তার বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে যাবে।

এ ঘরের দেয়ালে একটি মাত্র ছবি। দেয়াল জোড়া। অনেক উঁচু এক পর্বত, তার নিচে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। বিদেশ যাবার আগে স্বপ্নদীপ, ওর থেকে পাঁচ বছরের বড় দাদা, তখন কতই বা বয়স আঠারো, ছবিটা এনে দেয়। ছবিটা দিয়ে মুচকি হেসে বলে, 'আপাতত সস্তায় সারলুম, এরপরে যখন চাকরি করব, তখন দারুণ দারুণ জিনিস দেব।' কৃষ্ণার বাক্সে দাদার অনেক চিঠি আর ছবি জমা হয়েছে। এই ছবিটার দিকে তাকালে তার দাদাকে মনে পড়ে। দাদার হাসিকে মনে পড়ে। আ মিলিয়ন ডলার স্মাইল। আর এখন ছবিটার দিকে তাকালে তার মনে হয় সে কি ওই পাহাড়ের চূড়োয় উঠতে পারবে? নাকি সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে? তাকে টাকাপয়সা নিয়ে ভাবতে বেণুমামা বারণ করেছে। কিন্তু এভাবে বসে

বসে খেলে তো চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার একটা চাকরি চাই। কিন্তু এইচ এস পাশ করে সে কি চাকরি পাবে? বেণুমামা, মা দু-জনেই বলেছে জিই দিতে হবে, মেডিক্যালে চান্স পেলে ভালো, নইলে এম এসসি পাশ করার আগে কোনও কথা নয়। সে নিজে কোনও দিন ডাক্তার হবার কথা ভাবেনি। কী যে হবে তাও যেন ভাবেনি। এ দেশে কি ইচ্ছেমতো কিছু হওয়া যায়? তোমার নম্বর যেরকম হবে, তুমি সেইমতো একটা কিছু হবে। গতবার ওর বন্ধু সুনীতার দিদি ইন্দ্রানী বাংলায় পেল সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট আর ইংরেজিতে থার্টি নাইন পার্সেন্ট। বাধ্য হয়ে তাকে বাংলা অনার্স পড়তে হচ্ছে মফঃস্বলের কোনও একটা কলেজে। আসলে ইন্দ্রানী ইংরেজিতেই অনার্স পড়বে ভেবেছিল। সে আই সি এস ই পাশ করে ফার্স্ট ল্যাঙ্গোয়েজ ইংরেজি নিয়েছিল। কলকাতার কলেজে তার জায়গা হয়নি। এখন সে নাকি চিঠিতে লেখে সে কোনও দিন অনার্স পাবে না। তার নম্বর কী করে এমন উলটে গেল এ এক রহস্য।

কিন্তু এসব হল দুর্ঘটনা। কৃষ্ণার জীবনে যা ঘটেছে এবং ঘটছে সেটা তো ঘটনা — একমাত্র বেণুমামা জানে, কিন্তু তার মনে কী হচ্ছে সেটা তো সে ছাড়া কেউ জানে না। তার ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল না। স্বপ্নদীপের ছিল। কিন্তু স্বপ্নদীপের ডায়েরিতে তো এইসব ঘটনা, এইসব অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা লেখা থাকবে না। তাই গত একবছর ধরে সে অনিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখছে। তাতে তার খানিকটা স্বস্তি হয়। শুধুই স্বস্তি।

বায়োলজি খাতাটা টেনে নিয়ে সে পড়তে শুরু করে। পাতা উলটিয়ে টিস্যু চ্যাপ্টারটা বের করে। 'মূর্খ, কাকে বলে ব্লাড? ওরে কেষ্টা বল হোয়াট ইজ ব্লাড? আচ্ছা এই যে, ব্লাড যে বি ডেসক্রাইব্ড্ অ্যাজ স্পেশালাইজড্ কানেকটিভ টিস্যু, ইন হুইচ দেয়ার ইজ লিকুইড, নোন অ্যাজ প্লাজমা অ্যান্ড, অ্যান্ড ....' হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। কৃষ্ণা চমকে ওঠে বাহুতে বৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ও লাফিয়ে ওঠে, 'মা। হানাদি? হানাদি? মা-র ঘরের জানলা, জানলা ....' বাক্যটা শেষ হবার আগেই ও দৌড়ে ঢুকে পড়ে কণিকার ঘরে। কণিকা হাঁটু জড়িয়ে বসেছিলেন, বলেন, 'হানা বন্ধ করে দিয়েছে, তোর ঘরের জানলা বন্ধ করেছিস তো?'

উত্তর না-দিয়ে কৃষ্ণা ব্যাকুলভাবে কণিকার গাল পিঠ চুল চিবুকে হাত বুলিয়ে দ্যাখে ভিজেছে কি না। হানা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়, 'আমি বন্ধ করছি,খুকু তুমি একটু মায়ের কাছে থাকো।'

'উফ্ফ, যা ভয় পেয়েছিলাম। হানাদি অনেক বেশি অ্যাটেনটিভ।'

'তুই এত টেনশনে ভুগছিস কেন?' কণিকা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন।

'তোমার ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। তাছাড়া এমনিতেই এত জ্বর হচ্ছে চারদিকে যে আমার ভয় করে। খুব ইনফেক্শাস এই ক্যালক্যাটা ফিভার — বাড়িতে একজনের হলে রক্ষে নেই, সব্বার হবে। প্রায় সবার বাড়িতেই জ্বর, ভয় করে মা, যদি আমার হয় আর আমার থেকে তোমার? তার চাইতে কিছুদিন কলেজ কামাই করি।'

'জানিস খুকু, এমন বৃষ্টি হলে কত ভিজেছি, আর এখন বৃষ্টির ভয়ে জানলা বন্ধ করে শুয়ে আছি। ছোটবেলায় চুল শুকোবে না বলে মা-র কাছে বকুনি খেয়েছি আর বিয়ের পর তোর বাবার কাছে।'

'আমাদেরও তো ভিজতে দিতে, চানের আগে বৃষ্টি হলে। দাদা তো ইচ্ছে করে ভিজত। হারিয়ে যাবে বলে ছাতা নিত না। ওয়াটারপ্রুফও নিত না, বাসে ট্রেনে যাতায়াতে অসুবিধা হবে বলে।'

'দীপের চিঠি অনেকদিন আসেনি। ফোনও করে না। তুই চিঠিপত্র দিস তো?'

'দাদা এখন খুব ব্যস্ত মা। এই তো গত সপ্তাহে চিঠি এসেছে। ওর পক্ষে ফোন করাও অসুবিধে। আমি তো প্রত্যেক মাসে করি। মামাও করে। ও ভালো আছে মা।'

এর পরে দু-জনেই চুপ করে যায়। তার মানে তো এই নয় যে ওদের সব বলা হয়ে গেছে। বরং তার মানে কিছুই বলা হয়নি। কণিকার মনে এক আকুলতা ছেয়ে থাকে। ছেলেকে দেখার জন্য মায়ের আকুলতা। এই যে, খুকু বসে রয়েছে ওর পাশে। ওকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। চুমু খেতে ইচ্ছে করে ওর নবীন যৌবনদীপ্ত মুখখানিতে। বাবার মতো উঁচু কপাল মেয়েটার — পাশ থেকে দেখা যায় তা বাঁকা রেখায় নেমে নাকের রেখায় মিশেছে। হাসলে গালে টোল পড়ে। এটা কোথা থেকে পেল কে জানে। নইলে সব ওর বাবার মতো। লম্বাটে মুখ, ঘন ভুরু, তীক্ষ্ণ চিবুক, কালো কোঁকড়া চুল, ওঁর মতো অত লম্বা না হলেও কোমর ছুঁই ছুঁই। তা মেয়ে অমন সুন্দর চুল কেটে ফেলল। কণিকাকে বোঝায় — 'চুল এবং সায়েন্স দুটোকে ম্যানেজ করা মুশকিল। আমি চুলের যত্ন করতে পারি না, হানাদির কেশচর্চা আমার পছন্দ নয়, তুমি ভালো হয়ে উঠলেই আমার রাজকন্যার মতো চুল হবে।'

কণিকা জানেন যে তিনি আর ভালো হবেন না। এখন কখন কীভাবে তাঁকে যেতে হবে সেটা যদি জানতে পারতেন। হায়, এমন নির্দিষ্ট মরণও কত অনির্দিষ্ট! কণিকা তাঁর নিয়তি জানেন, কিন্তু নিয়তি-নির্দিষ্ট সেই দিনটি জানেন না। সেই মুহূর্তটি জানেন না, সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তটি, যেটি এত অনিবার্য হয়েও অনির্দিষ্ট রয়ে গেল। আরও কয়েকটা বছর যদি সুবিনয় বাঁচতেন কণিকা তাঁর আয়ু দিয়ে দিতে পারতেন। তবু সুবিনয় নিজে এতটা মানসিক কষ্ট পাননি। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জানতেন না কেন তাঁকে প্রতিরোধহীন মরতে হল। কোনও ডাক্তার বা নার্স যে তাঁকে এই ভয়ংকর সত্যটা জানাননি তার জন্য কণিকা কৃতজ্ঞ। যদিও ডেথ সার্টিফিকেট দেবার সময় নানাভাবে সত্যগোপনের চেষ্টায় তাঁদের নীরবতার কারণ কণিকা বুঝতে পেরেছিলেন। একজন এইড্‌স্-এর রোগী বোধহয় সুস্থ মানুষের কাছে মৃত্যুর মতোই ভয়ংকর, কণিকা তো সাধ করে মেয়ের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন না। আর মেয়েটাও যেন এই ক'বছরের মধ্যে কত বড় হয়ে গেল। কিন্তু কণিকা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সে যেন মায়ের কোলের মেয়েটি। অথচ সংসারটা ওই চালাচ্ছে। মামা বললেও শোনে না, কণিকাকে তো ধমক দেয় — 'ওয়ান গুড সল্‌ভ্ ওয়ানস্ ওন প্রবলেম। ওয়ান গুড বিয়ার ওয়ানস্ ওন ক্রস। ওয়ান গুড ফাইট ওয়ানস্ ওন ফাইট।'

কণিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাইরে বৃষ্টি বেশ জোরে পড়ছে। 'রাত হয়ে যাচ্ছে মা, খেয়ে নাও। হানাদি? মাকে খেতে দাও।'

'তুই খাবি না খুকু?'

'খাব। তোমাকে এইখানে দিতে বলি?' কণিকা কিছু বলার আগে কৃষ্ণা উঠে যায়। ফিরে এসে বলে, 'আমি একেবারে তোমার পেঁপে কাঁচকলা চটকে মেখে দিয়েছি। মাছ বেছে দিয়েছি, তুমি চামচ দিয়ে খাও।' হানা ছোট টেবিল একটা খাটের পাশে রাখলে কৃষ্ণা জল আর ভাতের প্লেট রাখে।

'তোরা খেয়ে নে।'

'খাব, ওই নিউজ শুনতে শুনতে খাব। তোমার খাওয়া হলে টিভিটা ডাইনিং-এ নিয়ে যাব।'

খানিকটা খেয়ে কণিকা বলেন, 'আর পারব না খুকু।'

'এটুকু যদি না খেতে পারো তো শরীর ঠিক হবে কী করে?'

'নারে, কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে', কণিকা অপ্রস্তুত হাসেন।

'ঠিকাছে। হানাদি এগুলো নিয়ে যাও। ও কী উঠছ কেন মা? এখানেই মুখ ধোও, জল এনে দিচ্ছি।'

কণিকার মুখ বিকৃত হয়ে যায়, 'বোধ হয় বমি হবে, কেমন গা গুলোচ্ছে' বলতে বলতে বিছানা থেকে নেমে পড়েন। কৃষ্ণা মাকে ধরে বাথরুমে নিয়ে যায়, কণিকা ওয়াক তোলেন, বসে পড়েন, হড়হড় করে সবটুকু ভাত বেরিয়ে যায়। কৃষ্ণা মা-র পিঠে ক্রমাগত হাত বুলায়। হানা জল নিয়ে আসে।

একটু পরে কণিকাকে ধরে ধরে নিয়ে আসে ওরা। 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো মা। এই পি এইচ কোরটা খাও। পাঁচ মিনিট বাদে টিনিটা খাবে। আমি বাথরুমটা পরিষ্কার করে আসি। হানাদি, তুমি পাঁচ মিনিট পরে এই ওষুধটা খাইয়ে দিয়ো। মশারি দিয়ে লাইট অফ্ করে দেবে।'

হানা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'তুমি ঘরে যাও খুকু, বাথরুম আমিই ...'

'না, নাহ্', কৃষ্ণা বেশ জোরেই বলে। তার ভেতরটা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে তাহলে একটা নতুন উপসর্গ শুরু হল। বমি। অ্যাসিডিটি? বেণুমামা এখনও এল না। ওঁর অবশ্য ফুটবলের নেশা নেই। গোটা কলকাতার নিশি-জাগরণ হচ্ছে বিশ্বকাপের জন্য কিন্তু খুকুর জন্য এসব নয়। তার ক্রিকেট ভালো লাগে, ভালো লাগে টিটি ব্যাডমিন্টন সাঁতার আর টেনিস স্কি, স্কেটিংও তার ফেবারিট গেম। কিন্তু গত দু-বছর তার জগৎ থেকে এসব চলে গেছে। গোটা কলেজ যখন সুস্মিতা সেন নিয়ে উদ্বেল তখন খুকুর প্রতিটা মুহূর্ত এই চিন্তায় কাটে যে বাড়ি গিয়ে মাকে কেমন দেখবে। ক্লাসে সে চুপচাপ থাকে, গম্ভীর থাকে কখনও, কিন্তু উদ্বিগ্ন থাকে না, থাকে না মানে চেহারায় কোনও দুশ্চিন্তা থাকে না। তাদের ক্লাসে সবচেয়ে ছটফটে হল ধীরা। ধীরাকেই তার সব চাইতে পছন্দ, সে শার্ট-প্যান্ট পরে

কলেজে আসে, কথায় কথায় হাতা গুটিয়ে তেড়ে যায়, স্পোর্টস-এ চ্যাম্পিয়ান। ধীরা তাকে নিজের কথা বলেছে। বলেছে, তার বাবা-মা-র ডিভোর্সের কথা। তার কষ্ট। সে তার বাবার কাছে থাকে। তার মা নাকি আবার বিয়ে করেছেন। সেখানে ধীরার একটা বোন হয়েছে। ধীরা বলে, 'আমার সমস্যাই মিটল না, ভদ্রমহিলা আর একটা প্রবলেম প্রডিউস করে বসে আছেন।'

মাকে বলে 'ভদ্রমহিলা'। অথচ এমনিতে ধীরা আচারে ব্যবহারে কত সভ্য এবং ভদ্র। ধীরার মাকে দেখতে ইচ্ছে করে কৃষ্ণার। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে, সন্তানের জন্যও তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখ একটু কম করতে পারলেন না কেন? কিন্তু এখন তার মনে হয় ধীরার মায়ের মতো যদি তার মা .... তবু তো মা থাকত, কোথাও না কোথাও। আর এখন সে যতই সত্যকে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে এক অবাস্তব প্রতিরোধ তৈরি করতে চাইছে ততই সেই সত্য তার অনিবার্যতা, তার অপ্রতিরোধ্যতা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রতিদিন। প্রতি মুহূর্তে।

জানলা খুলে বাইরে দু-হাত বাড়িয়ে দেয় ও। ভিজে দুই করতলে মুখ চেপে ধরে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা ....' প্রথমে শব্দগুলো আলাদা আলাদা থাকে, যেন প্রতিটা শব্দই কঠিন পাথর, সে একটি একটি করে তোলে। 'দুঃখে যেন করিতে পারি জয়', 'জয়'-এর 'জ' অক্ষরটাকে 'য়'-এ তে পৌঁছিয়ে দিতে যেন অনেকটা পথ পেরোতে হয় তাকে জ অ অ অ.....য়, 'জ'-এর ওপর যেন আছড়ে পড়ে ও, দু-হাতের প্রবল শক্তিতে অক্ষরটাকে টেনে তোলে একবার। দু-বার। তিনবারের বার ফিরে আসে পংক্তির প্রথমে। সুরে। 'দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।' সেই সুরের টানেই গানটা গলায় চলে আসে। বাবার প্রিয় গান। দাদার প্রিয় গান। মায়ের প্রিয় গান। খুব জোরে গায় না সে। যেন বুকের ভেতর থেকে শুধুমাত্র নিজের কানে পৌঁছবার মতো স্বরে ও ফিরে ফিরে গায় —। 'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা/তরিতে পারি শকতি যেন রয় —'

এইখানে এসে ও একটু থামে, চোখ উপচে যায় চোখের জলে, গলা আটকে আসে, 'আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,/ বহিতে পারি এমনি যেন হয়। বহিতে পারি এমনি যেন হয় — বহিতে পারি .....'

'খুকু দশটা বাজল, চলো খেয়ে নেবে। জানলা খুলেছ কেন? সরো বন্ধ করে দিই।' হানা ঝুঁকে জানলার পাল্লা টানে।

খেতে বসার আগে কৃষ্ণা একবার মাকে দেখার জন্য মায়ের ঘরে ঢোকে।

কালকে অনেক রাত পর্যন্ত পড়েছে কৃষ্ণা। সকালে উঠতে তাই দেরি। কণিকা তখনও ওঠেনি দেখে ও একেবারে চান করে এল। 'বেণুমামা কোথায় হানাদি?'

'বাজারে গেছেন।'

'আবার বাজারে কেন?'

'বউদির হরলিক্স ফুরিয়েছে ....।'

'হরলিক্স ফুরিয়েছে আমাকে বলোনি কেন? আর আলুপটলেরই বা এত দরকার পড়ল কেন? বেণুমামার সঙ্গে আমার কথা আছে — উফ্‌ফ্‌! আয়্যাড সো মেনি থিংস টু ডিসকাস......'

কাল রাতে বেণুগোপাল এলেন প্রায় এগারোটার সময়। স্কুটার চালিয়ে। কৃষ্ণা খুব বকেছে মামাকে। 'সেই রিজেন্ট এস্টেট থেকে। একটা ট্যাক্সি নিলেই পারতে। এই বৃষ্টি। যদি গাড়ি স্কিড করত! উফ্‌ফ্‌ বেণুমামা, তুমি যে দিনকে দিন কী হচ্ছ! নিজের কথা তো ভাবলে না কোনও দিন, এবার আমাদের কথা একটু ভাবো। একে এই অবস্থা .....'

'দ্যাখ আমি যথেষ্ট কেয়ারফুল, এই দ্যাখ ওয়াটার প্রুফ পরেছি দ্যাট মিনস ভিজিনি। আর আমার গাড়ির স্পিড দেখলে শামুকও লজ্জা পাবে। সুতরাং অ্যাকসিডেন্ট হবার প্রব্যাবলিটি অল মোস্ট নিল। দাঁড়া এক কাপ কড়া কফি খাওয়া, তারপর তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

বেণুগোপাল কৃষ্ণাকে বলেন কণিকাকে বাড়িতে আর না-রাখতে। 'কিন্তু মামা, হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে দিয়ে কী লাভ? কোনও চিকিৎসাই তো নেই। হয়তো এইসব ওষুধই চলবে। তাছাড়া বাড়িতে থাকলে আমি হানাদি সবসময় দেখছি। আর হাসপাতালে দিলে মা-র অবস্থা খুব খারাপ হবে। না, বেণুমামা, আমার মত নেই।'

'শোন, অত ইমোশনাল হোস নে, লজিক হারিয়ে ফেলিস না। তোর পড়াশুনো আছে, টুয়েলভ্‌ হল, এই পরীক্ষাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।'

কৃষ্ণা শান্ত গলায় বলে, 'মা-র চাইতেও বেশি ইম্পর্ট্যান্ট?'

'হ্যাঁ, মামু, বি প্র্যাকটিক্যাল — মা-বাবা কারও চিরকাল থাকে না, কিন্তু তোর কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া তুই কি কিছু করতে পারবি? নার্সিং দরকার হবে এর পরে।'

'নার্স রাখব।'

'পাবি না। এইড্‌স-এর রুগি এটা জানলে কোনও প্রাইভেট নার্স আসবে না। আর আমাদের তো বলতেই হবে। তাছাড়া তোর পরীক্ষার সময়? আজ সকালেই আমি কণিকে নিয়ে সুব্রতর কাছে যাব। দেখি ও কী বলে?'

'সুব্রত মানে ডঃ সুব্রত মিত্র?' কৃষ্ণা খানিকটা নিস্পৃহ গলায় বলে। বেণুগোপাল সেটা লক্ষ করেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ে, 'অমনি চটে গেলি? আজকালকার ছেলেমেয়েরা এত অসহিষ্ণু হয়েছে যে কোনও কথাই বলা যায় না। তোর সেন্টিমেন্ট আমি বুঝি খুকু। আমারও কি কষ্ট হচ্ছে না? কণি আমাদের একমাত্র বোন, কিন্তু সে কথাটা সবাই কেমন ভুলে গেছে। তুই ভালো করে ভেবে দ্যাখ, অবস্থা তো এরকম থাকবে না, ডিটেরিওরেট করবে — তখন? হাসপাতালে দিলে বরং লংজিবিটি বাড়তে পারে।'

'বাড়তে পারে, বাড়তে পারে, কিন্তু তুমি জোর করে বলতে পারছ না বাড়বেই। বেণুমামা, বাবাকে যখন নার্সিংহোমে দেয়া হল, তখন তো ও বাড়ির সবাই ছিল। দু-বেলা দেখতে যেত সবাই। পালা করে। মা থাকত। আমার কোনও অসুবিধাই হত না। মা কাছে

নেই তো কী হয়েছে? কাকিমা আছে, জেঠিমা আছে। আমি তো ও বাড়ির একমাত্র মেয়ে। জ্যাঠারও ছেলে, কাকুরও ছেলে। পিসিদেরও কারও মেয়ে নেই। কী আদরেই থাকতুম ওখানে। কিন্তু শুধু একটা রোগের নামেই সবাই কেমন ভয় পেয়ে গেল। সবাই। বাবার ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল, তখন কত কথাই যে শুনতে হয়েছে, মেয়ে হয়ে সেসব কথা উচ্চারণ করি কী করে? তারপর সবার ব্লাড টেস্ট করা হল। পারলে বাড়ির কুকুর বেড়ালেরও ব্লাড টেস্ট করা হত। বাবা মারা গেলেন। ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে, নইলে আমি আর মা কী করতে পারতাম? আর ভাবো তো মায়ের অবস্থাটা। জীবনটা খুব দামি, আমি জানি, খুবই দামি, আর সেটা একটাই, কিন্তু মরতে তো হবেই, আর সেটা রক্ষা করা যখন সম্ভব নয়, তাহলে সবাই ভয় পায় কেন? তুমি জানো না, আমরা যেন অচ্ছুৎ , আনটাচেবল্, তাতেও হল না, এমন কাণ্ড, এমন সব কথাবার্তা, তাও একজন মৃত মানুষকে নিয়ে যে আমরা থাকতে পারলাম না। আসলে মা-ই থাকতে পারল না। আমি একা হলে লড়ে যেতুম। ও বাড়িতে আমার অধিকার আছে। বাবা যখন বাইরে থেকে টাকা পাঠাতেন, তখন বাবা ছিলেন একজন সফল মানুষ। সেই মানুষটার শেষ কাজ হয়েছে আত্মীয়বন্ধুদের ছাড়া। ভাবা যায়? বাবার মতো মানুষ?'

বেণুগোপাল কৃষ্ণার মাথায় হাত রাখেন, 'বড্ড মাথা গরম করে ফেলিস তুই খুকু। এভাবে চললে শেষ হয়ে যাবি। দীপের পড়া শেষ হতে এখনও দু-বছর, তখনও তার কয়েক বছর লাগবে একটা কিছু করতে, আমারও শরীর ভালো যাচ্ছে না, বয়স হয়েছে -- আগের মতো দৌড়োদৌড়ি করতে পারি না। কণিকে দিল্লিতে নিতে পারলে খুব ভালো হত ...'

'এইম্স্-এ? কিন্তু সে তো অনেক খরচ মামা, তাছাড়া আমি এখানে থাকব, তুমিই বা ক'দিন থাকবে ওখানে? না না, তাছাড়া এইম্স্-এও তো কোনও চিকিৎসা নেই।'

'তা সত্যি। তবু তুই ভাব। সুব্রত একটা এক্স্রে করতে বলেছে। দেখিস যেন মা-র ঠাণ্ডা না লাগে।'

কণিকাকে শাড়ি পরিয়ে দেয় কৃষ্ণা। 'কী যে ফ্যাটফ্যাটে শাদা শাড়ি পরো।'

'তবে কি বেগুনি বেনারসি পরব?'

'এত শাড়ি থাকতে বেগুনি বেনারসি মাথায় এল কেন? বেশ হালকা ছাপা একটা ফুল ভয়েলের শাড়ি পরলে তোমায় দারুণ দেখাত। তা নয়, একটা ইঞ্চি পাড় শাদা তাঁতের শাড়ি। বুড়িদের মতো।'

কণিকা হেসে ফেলেন, 'হ্যাঁরে তোর মা তো বুড়োই।'

'কক্খনো না। নেভার।'

ট্যাক্সিতে উঠে বেণুগোপাল বলেন, 'খুকু তোর ক্লাস ক'টায়, ফার্স্ট পিরিয়ড আছে তো বল তোকে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

'না, আজ ওবেলা পড়া আছে। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। আজ প্র্যাকটিক্যাল নেই, দেরি হলে আর ক্লাস করব না, সোজা পড়তে যাব।'

কণিকাকে যত্ন করে দেখলেন সুব্রত মিত্র। কৃষ্ণার দিকে ভুরু তুলে বললেন, 'মেয়ে?'

'হ্যাঁ', কণিকা বলেন।

'তোমার কথা তোমার মামার মুখে শুনেছি। য়্যু আর আ ব্রেভ গার্ল। তোমাকেই বলি — এটা খুবই স্যাড, তোমার নাম কী?'

'কৃষ্ণা। কৃষ্ণা দাশগুপ্ত।'

'শোনো মা কৃষ্ণা, তুমি আধুনিক মেয়ে, জানো নিশ্চয় মেডিক্যাল সায়েন্স এক্ষেত্রে হেল্পলেস। এ রোগের প্রিভেনশান আছে, কিন্তু কোনও মেডিসিন, এখনও পর্যন্ত নেই। আমরা অন্য যে-সব অসুখ হয়, পেটের ট্রাবল, এনি টাইপ অফ ফিভার ইত্যাদির কমন ট্রিটমেন্ট করি। এনিওয়ে, এখুনি ওরিড হবার মতো অবস্থা হয়নি। তোমার মায়ের ইনিশিয়াল শরীর স্বাস্থ্য খুব ভালো — আন ইউজুয়ালি গুড, সুতরাং সাবধানে থাকলে উনি চট করে তেমন বিপদে পড়বেন না। যা ওষুধ খাচ্ছিলেন সেটাই খান, বমি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই - ওটা খাবারের গণ্ডগোলে হয়েছে। লাইট ফুড খাবেন মিসেস দাশগুপ্ত। হাসিখুশি থাকবেন.....।'

ডাক্তার মিত্র আরও যেন কী কী বলছিলেন কৃষ্ণার মনে নেই, কিংবা সে তেমন মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। আজ বছর কয়েক ধরে সে এই একই কথা শুনে আসছে। কেন এইড্‌স হয় ও এইড্‌স কী তা সে জানে। চাই কি এ বিষয়ের ওপর সে ঘণ্টাখানেক বক্তৃতাও দিতে পারে। কিন্তু তাতে কী হবে? তার মা তার চোখের সামনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে— প্রতিরোধহীন। কেউ কিছু করতে পারবে না। এ যেন পাহাড়ের ঢালু দিয়ে পাথর গড়িয়ে দেওয়া — গড়াতেই থাকবে, গড়াতেই থাকবে আর গতি বাড়বে, কোনও গর্ত কিংবা ঝোপেঝাড়ে আটকাবে না— উফ্‌ফ্‌! অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম — প্রতিরক্ষাবিহীন শরীরে একে একে অত্যন্ত সাধারণ রোগের ভাইরাস, জার্মস ঢুকবে, কেউ তাদের তাড়াবে না, শ্বেত কণিকারা মরে যায়, নষ্ট হয়ে যায় ক্রমে, কোনও বাইরের ওষুধ দিয়েও সেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় না। তার বাবার শরীরে এই ভাইরাস কী করে এল? বারদুয়েক বাবাকে রক্ত দেওয়া হয়েছিল। একবার স্কুটার অ্যাক্সিডেন্টে প্রচুর রক্তপাত হয় — বাঁচার আশা ছিল না, তখন তড়িঘড়ি কোথা থেকে রক্ত জোগাড় করা হয়েছিল। আর একবার কী যেন একটা অপারেশনের সময়। নিশ্চয় তখনই ইনফেকশান হয়। বেচারি মা। বেচারি খুকু। কৃষ্ণা জানে মা-র ইচ্ছে দাদা আসুক। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। আর মাত্র দু-বছর — দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কেটে যাবে? উফ্‌ফ্‌ এখনও দু ব.... ছ .... র? মানে টু ইনটু থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ইনটু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। ততদিন মা! নাহ্ খুকু এসব ভাববে না। হাসপাতালে দিলে যদি বেটার ট্রিটমেন্ট হত তাহলে ও কি এত ভাবত? কিন্তু একে দাদাকে না-দেখে মা ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছে, তার ওপরে যদি তাকেও না দ্যাখে, তাহলে মা আর বাঁচবে না। কিন্তু সেই বা কী করতে পারে? কী ঈ ঈ ঈ? সে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, তার গায়ে অনেক জোর, তার পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির মাকে সে কোলে নিয়ে দৌড়তে পারে, কিন্তু এক অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

কেউ পারে না। শুধু পারে না নয়, এই শত্রুর বিরুদ্ধে কোনও অস্ত্রই অস্ত্র নয়, কোনও লড়াই-ই লড়াই নয়। মা বলে এর চাইতে নাকি ক্যানসার হলে ভালো ছিল। তার মানে মা-র মনে মরণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। মা মরবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু এভাবে মরতে চায় না। ইচ্ছেমতো কেউ কি মরতে পারে? আত্মহত্যার ক্ষেত্রে অবশ্য পদ্ধতির একটা নির্বাচন বা নির্বাচনের স্বাধীনতা মানুষের থাকে। কিন্তু সেটাও অনেক সময় পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। ধরা যাক কেউ ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরতে চায়, তাহলে তো তাকে বিপুল পরিমাণে সে ওষুধ জোগাড় করতে হবে। যদি জোগাড় করার উপায় না থাকে তাহলে তাকে বাধ্য হয়ে অন্য উপায় দেখতে হয়। কারণ তার মরণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। মা-র জন্য তার টেনশনের এটাও একটা কারণ — মা যদি!

আজ কৃষ্ণার মনটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিকেলে এক্‌সরে রিপোর্ট পাওয়া যাবে। পড়া সেরে বাড়ি ফিরতে তার সাতটা সাড়ে সাতটা বাজবে। তারপর সে জানবে তার মাকে আরও নতুন নতুন ওষুধ খেতে হবে কি না। কলেজের সামনে ট্যাকসি থেকে নামার আগে সে তার লম্বা সরু মসৃণ আঙুলগুলো দিয়ে মা-র বাহু চেপে ধরল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বেণুগোপাল সামনের সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'চিন্তা করিস না। খেয়ে দেয়ে আমি একটু বেরোব। বিকেলে একেবারে রিপোর্ট নিয়ে, ডা: মিত্রর অ্যাডভাইস নিয়ে ফিরব। তুই না-আসা পর্যন্ত থাকব।'

কণিকা মৃদুস্বরে বলেন, 'তোর কাছে পয়সা আছে তো? টিফিন নিয়ে আসিসনি — কিছু খেয়ে নিস পড়তে যাবার আগে।'

ট্যাকসিটা চলতে শুরু করলে কৃষ্ণা হাত নাড়ে। আজ তার প্রথম দুটো ক্লাস নেই। তার দেরি হয়নি। তাই তাকে আর মিথ্যে কোনও কারণ বানাতে হবে না। আজ তার ক্লাস করতে ইচ্ছেও করছে না। তার মায়ের শরীর খারাপ বন্ধুদের কেউ কেউ জানে। কেউ কেউ তো তার বাড়িতে আসে। কতদিন সে এই ব্যাপারটা গোপন করে রাখবে? যে পর্যন্ত দাদা না-আসে? তাহলে কি কৃষ্ণা তুমি নির্ভর চাইছ? একা আর পারছ না? দাদা হলে কী করত? বন্ধুদের কাউকে সে বলতে পারছে না এটা বন্ধুদের দোষ নয়, দোষটা তার। সে যেন আগে থাকতেই ধরে নিয়েছে তারা এইড্‌স সম্পর্কে কিছু জানে না। এত প্রচার হচ্ছে, টিভিতে আলোচনা তবু মানুষের মন থেকে কুসংস্কার যায় না। আর কিছু নয়, শুধু সবাই যদি একটু স্বাভাবিক আচরণ করত তাহলে মা-ও এত কষ্ট পেত না আর কৃষ্ণার বুকের ভেতরে যেটা পাথর চাপা আছে তা থেকে ও মুক্তি পেত।

বন্দনা কৌশিকী ধীরা মিতুল যাবে সঙ্গে। ধীরা বলল, 'আমি চারটে স্যান্ডউইচ এনেছি তোরা শেয়ার কর।' কৌশিকী হাত নেড়ে বলল, 'নো থ্যাঙ্কস। আই ওয়ান্ট ফুচকা।' মিতুলও ওর সঙ্গে ফুচকাওলার কাছে গেল। বন্দনা বলল, 'আমি পরোটা আর পটল পোস্ত এনেছি।' কৃষ্ণা বলল, 'পরোটা আর পটল পোস্ত? বাপ্‌স্‌, অ্যালিটারেশান-এর বাংলা কী রে?'

কল্পনা আধখানা পরোটার মধ্যে একটা পটল দিয়ে মুড়ে ওর হাতে দেয়, 'অনুপ্রাস ম্যাডাম, নে ধর।'

মিতুল ফুচকা খেতে খেতে হাত তুলে চেঁচায়, 'ওরে আমি কিন্তু থ্যাঙ্ক ইউ দিইনি, আমার জন্য রাখিস।'

'হ্যাঁরে কেষ্টা, মাসিমাকে দেখলাম মনে হল। কোথাও গিয়েছিলি তোরা?' ধীরা জিগ্যেস করে। 'মাকে চেক আপ করাতে গিয়েছিলাম মামার সঙ্গে।'

'কী হয়েছে ওনার? সেই যে পেটের গোলমাল বলছিলি, তা সে তো বেশ কিছুদিন হল। ভালো করে দেখা, কাকে দেখাচ্ছিস?'

এইবার। এই তো সময় — এখুনি তো কৃষ্ণা বলে ফেলতে পারে তার মায়ের অসুখের কথা। তার বাবার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। তারা যদি একই খাবার ভাগ করে খেতে পারে তো অন্যের দুঃখ ভাগ করে নিতে পারবে না কেন? কিন্তু কৃষ্ণার ভয় করে, ভয় করে যদি এই বন্ধুত্বটুকুও হারিয়ে যায় এই ভেবে। সে তো বলতে চায়, বলতে চাইছে, 'দেখ তোদের সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে — খুব জরুরি। আমার বাবা ক্যানসারে মারা যাননি মারা গেছেন এইড্‌স-এ। আমার মা-রও রক্তে এইচ আই ভি পজিটিভ। তাঁর এইসব ছোটখাট রোগের সঙ্গেও যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই তাঁকে বাঁচায়। এক বেণুমামা ছাড়া সমস্ত আত্মীয়স্বজন আমাদের পরিত্যাগ করেছে। দে হ্যাভ ডেজার্টেট আস ব্রুটালি, মার্সিলেসলি, ইনহিউম্যানলি। আমরা কিছু চাই না, নো হেল্প, নাথিং। শুধু একটু সমবেদনা, ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব চাই — আর কিছু না। কৃষ্ণার ঠোঁট নড়ে। কিন্তু ও শোনে ও বলছে, 'ধীরা, তোর নোটটা জেরক্স্ করেছি কিন্তু আনতে ভুলে গেছি। সরি। আজকে কি লাইট পড়াবেন স্যার? তোর ওই অঙ্কটা হয়েছে — ওই যে আগের দিন দিলেন — সেই রেইনড্রপ রে।'

প্রেসক্রিপশানটার দিকে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণা — দুটো নতুন ওষুধ — বিফোর ব্রেকফাস্ট আরসিনেক্স্ একটা, রাত্রে শোয়ার আগে পাইরজিনামাইড একটা। আগের অন্য ওষুধের সঙ্গে একটা কিটোভিট। অনেকক্ষণ পরে ও বেণুগোপালের দিকে তাকায় — 'কী করে ইনফেকশান হল? বাড়িতেই তো আছে?'

বেণুগোপাল একটা বেতের চেয়ারে চোখ বুজে বসেছিলেন। চোখ বন্ধ করেই বলেন, 'রাস্তায়, এমনকি ডাক্তারের চেম্বারে অপেক্ষা করার সময়ও হতে পারে। ইটস এ কেস অফ ফ্ল্যাশ ইনফেকশান।'

কিন্তু জ্বর নেই, সেরকম কাশি নেই, দুর্বলতা আর ওয়েট কমে যাওয়ার তো অন্য কারণ ছিল।'

'খুকু, এটা উইশফুল থিংকিং দিয়ে সলভ্ করার মতো প্রবলেম নয়। শি মাস্ট অ্যান্ড শুড বি হসপিট্যালাইজড্। জেদ করিস না। আর্ত করিস না।'

'আজ আমি খুব ক্লান্ত বেণুমামা। আজকের রাতটা আমাকে ভাবতে দাও। কালকে বলব।'

'তুই কি লোক জানাজানির ভয় করছিস? হসপিটালে দিলে সবাই জানতে পারবে?'

'একসময় তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটাই সব নয়। তুমি জানো বেণুমামা এখন ভারতবর্ষে কতগুলো এইড্‌স-এর রোগী? সাতশো আঠারো। উনিশশো ছিয়াশিতে প্রথম কেসটা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এ হল গভর্মেন্টের স্ট্যাটিসটিক্‌স্। অনেকে তো বলে না। আমাদের মতো বাধ্য হয় গোপন করতে। সামাজিক বয়কটের ভয় আছে তো? সেই মেয়েটাকে থানায় রেখে দিয়েছিল — সুপ্রিম কোর্ট পারমিশান দিল না বলে ছেড়ে দিল। এখন অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। প্লিজ, তুমি আমাকে আজকের রাতটা ভাবতে দাও।'

কৃষ্ণা দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। লজ্জায় না দুঃখে বেণুগোপাল বুঝতে পারেন না। বলেন, 'আমি চলি রে। কালকে বিকেলে আসব। সকালে ফোন করব। ওষুধগুলো এনে দিয়েছি, ঠিকমতো খাওয়াস।'

'তুমি খেয়ে যাও।' কৃষ্ণা ওঠে।

'না রে। এত তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যাস নেই। তাছাড়া হানা লুচি তরকারি সন্দেশ আম একগাদা দিয়েছিল। পেট একদম ভরতি।'

'মা? মাগো?' কৃষ্ণা কণিকার পাশে বসে মায়ের যে-হাতখানি বিছানায় পড়েছিল সেটাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে। কণিকা চোখে হাত চাপা দিয়ে দু-পা আড়াআড়িভাবে রেখে চিত হয়ে শুয়েছিলেন। 'কেন, তুমি কিছু খাওনি মা? খেয়ে নাও, ওষুধ খেতে হবে তো?'

'কেন জ্বালাচ্ছিস খুকু? ওষুধে কিছু হচ্ছে, না হবে? মিছিমিছি পয়সা খরচ। আর তুই আবার আমার বিছানায় বসেছিস? মরেও শান্তি পাব না, তুই দীপকে খবর দে, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।' বলতে বলতে কণিকা কেঁদে ফেলেন।

কৃষ্ণা চুপ করে থাকে, মাকে কাঁদতে দেয়। কৃষ্ণা কথা বলে না, কথা বলতে গেলে যদি সেও কেঁদে ফেলে এই ভয়ে। তার হঠাৎ শ্বাসকষ্টের মতো হয়। সে উঠে পর্দা সরিয়ে দেয়। আজকে আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ — জানলা দিয়ে আধখানা চাঁদ একটু আবছা দেখা যায়, এই আকাশেরই নিচে সমুদ্র পেরিয়ে কত দূরে তার দাদা আছে, সে তো জানে না মা তাকে দেখতে চাইছে, খুকুকে যে মা এবেলা-ওবেলা সর্বক্ষণ দেখতে পায়, তাই বলছে না — খুকু তোকে দেখার জন্য আমি বাঁচতে চাই। কালকে মামাকে কী বলবে কৃষ্ণা ঠিক করে ফেলেছে। বলবে, 'মামা আমি ঠিক করেছি মা এখানেই থাকবে। এখানেই। হাসপাতালে নার্সিংহোমে কোথাও কি মা সেই জিনিসটা পাবে যা এখানে পাচ্ছে? সমবেদনা আর ভালোবাসাই তো এ রোগের ওষুধ। ওর মনে পড়ল আর্থার অ্যাশের কথা। কত ভালোবাসা পেয়েছিলেন উনি। তিনি আমেরিকায় থাকতেন আর বিখ্যাত লোক। আর তার মা? তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশের অখ্যাত নাগরিক। তাঁকে ভালোবাসার লোক বেশি নেই, কৃষ্ণা কি মাকে ভালোবাসাহীন মমতাশূন্য শুধু কর্তব্যসচেতন কতকগুলো মানুষের মাঝখানে রেখে ভালো থাকতে পারবে? তারা তো মার মরণ ঠেকাতে পারবে না। তাহলে কী লাভ?

'খুকু?' কণিকা ভাঙা গলায় ডাকেন, 'তুই রাগ করেছিস? সত্যি, এতটুকু মেয়ে তুই,

আমার বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে। হানাকে বল খেতে দিতে। এখানে আয়। খুকু।'

বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁটের ওপরের ঘাম মুছে ফেলে কৃষ্ণা। একটা ঢোক গেলে। চোখের জল উৎস মুখেই ফেরত পাঠায়। 'খুব দুষ্টু হয়েছ তুমি কণি।' (বোধহয় ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ও মাকে নাম ধরে ডাকত। 'তুই' বলত। শেষে বলত 'কণি-মা'। কণিকার মনে পড়ে যায় এ নিয়ে সুবিনয়কে কম বলেননি। 'তুমি দিনরাত 'কণি' 'কণি' বলো বলেই তো।' 'কই দীপ তো বলে না, ও কোত্থেকে শিখল?' সুবিনয় বলতেন, 'আসলে তুমিও তো বারণ করো না।') 'তোমার জন্য আমার সব মাথায় উঠেছে, দাঁড়াও একটা আর্চ দিয়ে নিই।' বলে কৃষ্ণা দু-হাত উঁচু করে পেছন দিকে শরীর বাঁকিয়ে দু-হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি দুটো ধরে। সেভাবেই বলে 'আজ একসঙ্গে খাব। হানাদি? হানাদি-ই-ই?'

হানা ঘরে ঢুকে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল। কৃষ্ণা উঠে বলে, 'টেবিল লাগাও মিস হানা।' কণিকা আস্তে আস্তে বলেন, 'নাচ তো ছেড়েছিস, গানের স্কুলেও যাস না, বাড়িতে একটু করলে পারিস।' কৃষ্ণা বাঁ হাতে কান চাপা দিয়ে গেয়ে ওঠে, 'তানা দেরে না দেরে না তানা না না।' কণিকা মেঝেতে নামেন। 'তুই আর বড় হলি না।'

কৃষ্ণা বলে, 'নো মোর টক — তিগ্‌ধা তিক্ তিক্ থেই তিগ্‌ধা তিক্ তিক্ থেই, তিক্ ধা তিক্ তিক্ ধা।' বলার সঙ্গে সঙ্গে তিন পাক ঘুরে যায় কথকের ভঙ্গিতে, মাকে জড়িয়ে নিয়ে চলে, 'চলো কণি তোমার হাত ধুয়ে দিই। দুঃখের বিষয়, তোমার এ রোগটাও মানে নবতম ইনফেকশানটাও ইনফেকশাস পর্যায়ে যায়নি। সুতরাং ভয় পেয়ো না। যে মানব আমি, সেই মানব তুমি কন্যা।' কণিকা হেসে ওঠেন ঝিরঝির করে — 'আজ আমাকে গান শোনাবি খুকু। কতদিন তোর গান শুনি না।'

খেতে বসে কৃষ্ণা বলে, 'কালকে ফুল নিয়ে আসব। এই বর্ষায় কী দারুণ সব ফুল। তোমার খোঁপায় পরিয়ে দেব। আমার চুলে তো ক্লিপ দিয়ে আটকাতে হবে, দেখেছ কেমন তসলিমা নাসরিনের মতো চুলটা হয়েছে।'

'চুল তো হয়েছে, কিন্তু সাহস?' কণিকা বলেন — 'আশ্চর্য সাহস মেয়েটার!'

'আমিও সাহসী মা, আ ব্রেভ গার্ল। মামা এবং ডাঃ মিত্র বলেছেন। সবার সাহস তো একরকম নয়। তবে তসলিমাকে আমি হান্ড্রেড টাইমস হ্যাটস অফ করি। শি ইজ মেকিং হিস্টরি। আজকে খবর শুনেছ? কিছু বলেছে?' কৃষ্ণা মা-র দিকে তাকিয়ে বলে।

'আমি শুনিনি।' কণিকা চামচ দিয়ে স্যুপ খান। কৃষ্ণা মা-র দিকে আড়চোখে দ্যাখে। মাথা নিচু করে খাচ্ছেন কণিকা, মা-র প্রোফাইল দেখতে পাচ্ছে ও, একটু কি গম্ভীর হয়ে গেলেন কণিকা? কষ্ট হচ্ছে? কষ্টের আঁকাবাঁকা রেখা কি ফুটে উঠছে ওঁর ম্লান মুখটিতে? কৃষ্ণাকে তো কথা চালিয়ে যেতেই হবে। জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন সব কথা। জ্যান্ত শরীরের মতো উষ্ণ শব্দ আনতে হবে এই কথোপকথনের মধ্যে, সেই সব জীবন্ত শব্দ যা মানুষকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা মানুষকে আয়ু দিয়ে এসেছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। কৃষ্ণা এখন থেকে সেই সব শব্দ, সেই সব অক্ষর তুলে আনবে। নতুন করে বিন্যস্ত করবে

তাদের, সব ধুলোময়লা খসে যাওয়া অক্ষর দিয়ে অঙ্কুরিত হবে। নতুন কোনও অর্থবহ শব্দ। কচি পাতার মতো সতেজ। প্রতিদিন এমনিতেই মানুষ মরে। বাঁচার সমান্তরালে মরে। শারীরিকভাবে মরে। কিন্তু মনে ক'জন বাঁচে? রোজ কৃষ্ণা তার নতুন শরীরে ভিড়ের মধ্যে সেই সব মৃত হাতের মৃত আঙুলের ক্লেদাক্ত স্পর্শ পায়। সেই সব মৃত মানুষেরা কেউ কেউ বহু ব্যবহৃত শব্দ ছুঁড়ে দেয় তার দিকে — সেসব শব্দ, সেসব বীভৎস সুর যেন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছে মানবসভ্যতার সংস্পর্শবিহীনভাবে। কৃষ্ণা সেইসব শব্দ ও অক্ষরকে নতুন করে সাজাবে। মায়ের জন্য। পৃথিবীর সমস্ত এইড্‌স রোগীদের জন্য এক ভালোবাসার বর্ণমালা।

'মা ব্রাজিল জিতল বিশ্বকাপ তো কলকাতার মানুষ কেমন ধেই ধেই করে নাচল জানো?' কণিকা হাসিমুখে তাকান। হানা বলে, 'হ্যাঁ গো এ পাড়াতেও মিছিল বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু তার চাইতে অনেক আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে জুপিটারে।'

'তুই শুমেকার লেভি নাইন কমেটের কথা বলছিস?'

'ও হো মা, ফ্যান্টা ফ্যান্টা! তুমি কী ফ্যান্টাসটিক। এদিকে 'মরে যাব' 'মরে যাব' করে কেঁদে আমাকে নার্ভাস করে দিচ্ছ, আবার এসব খবরও রাখো!'

'কেন, মরব বলে কিছু জানব না?' কণিকার স্বরে কৌতুক।

'ঠিক , ঠিক, ঠিক।' কৃষ্ণা 'হীরক রাজার দেশ'-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে নেড়ে থেমে থেমে বলে। 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি! শোনো, ছোটবেলায় আনন্দমেলায় একটা জোকস্‌ পড়েছিলাম — গাইড ট্যুরিস্টকে বলছে সাবধানে চলবেন স্যার, এখান থেকে পড়ে গেলে একদম অতল খাদে এবং নির্ঘাৎ মৃত্যু। আর যদি পড়েই যান, তাহলে পড়তে পড়তে সূর্যাস্তের দৃশ্যটা দেখতে ভুলবেন না। হিমালয়ের বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য অতি মনোরম।' বলে কৃষ্ণা অমল হেসে ওঠে। কণিকাও হাসতে থাকেন। হানাও।

ফোন বেজে ওঠে। 'নিশ্চয়ই বেণুমামা — তুমি যা গোমড়ামুখ করে ছিলে, বাড়ি গিয়ে শান্তি পাচ্ছে না। য়্যু নটি গার্ল।' বলে ও এঁটো হাতেই উঠে যায়। ওঘর থেকে ওর গলা শোনা যায়, 'হ্যালো কে? আমি খুকু। হ্যাঁ ভালো আছে, চিন্তার কিছু নেই, হ্যাঁ ধরো ডেকে দিচ্ছি।' 'মা। ওমা?' বলতে বলতে ও দ্রুত পায়ে মা-র কাছে আসে, 'ডোন্ট গেট এক্‌সাইটেড় — দাদার ফোন। কান্নাকাটি কোরো না আবার। ধরব তোমায়?' কণিকাকে বাঁ হাতে ধরতে যায় ও, কণিকা এরই মধ্যে চামচ নামিয়ে বাটির জলে আঙুল ধুয়ে নিয়েছেন। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ধীর কিন্তু দীর্ঘ পদক্ষেপে সমুদ্র পার থেকে ছুটে আসা ছেলের কণ্ঠস্বরের দিকে যান — তাঁর কথাগুলো কৃষ্ণা শুনতে পায় — 'আর বলব না, মরার কথা আর বলব না খুকু।'

কৃষ্ণা চেয়ারের পিঠে বাঁ হাত, মা-র চলে যাওয়া দ্যাখে, হানা এগোতে গেলে ডান হাত তুলে বাধা দেয় ওকে।

কোনদিকে গেলেন কণিকা? জীবনের দিকে না কি মরণের দিকে? আঠারো বছর বয়সের পক্ষে প্রশ্নটা বড্ড ভারি। জটিলও।

প্রতিক্ষণ ১৯৯৪

সুধাময়ীর পরিচয়পত্র

দুপুরবেলা গায়ের ছায়া পায়ের কাছে গুটিসুটি এই এতটুকু, টুকুশ টুকুশ হাঁটেন সুধাময়ী। শরীরটা এখনও চলে, ছেলেরা খেদিয়ে দিলেও চলে মেয়ে খেদিয়ে দিলেও চলে। চুল ছিল একদা, দাঁড়ালে, খুলে এলো করে দিলে, কোমর ছাপিয়ে হাঁটুর পেছনে দুলত, তিন ছেলেমেয়ে কোলেকাঁখে নিয়ে প্রিয় গোস্বামীর বাড়ি রাঁধতে এসেছিলেন সেই কবে, নাকি নদে জেলা থেকে, তখনও হাত ঘুরিয়ে অমনি এলো খোঁপা করলে লোকে তাকিয়ে দেখত। নদে জেলা শ্বশুরঘর,বাপের বাড়ি নাকি ঢাকা, পূর্ববঙ্গ, অধুনা প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল 'বাংলাদেশ'। সুধাময়ীর ঢাকা জেলা মনে পড়ে কি পড়ে না, বাপ-মায়ের সঙ্গে রাতের আঁধারে নদী পার হওয়া আবছা মনে পড়ে, এপারে ক্যাম্প মনে পড়ে, তাঁর বরাত ভালো তেমন ক্যাম্পের গল্প জমাট বাঁধার আগেই মামার বাড়ি মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জে চলে এলেন তাঁরা। রিফিউজি বলে, ভিটেমাটি ছাড়া বলে তাঁরা এখানে একটা করুণ গল্প হয়ে উঠতে পারতেন। তো সুধার বাপের বিচক্ষণতায় আর তাঁর মায়ের তো একটাই ভাই, তা তিনিও গল্পের মামার মতো তেমন স্বার্থপর বা কঠিন হৃদয় ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি ছিলেন না বলে জামাইবাবুর পাঠানো টাকাপয়সা ঠিকঠাক ফেরত দেওয়াতে সুধাময়ীর বিয়ে পর্যন্ত চলে যায় গল্পটা দানা বাঁধে না।

কখন যে গল্প শুরু হয় কে জানে।

পনেরো বছরে বিয়ে দিয়ে বাবা স্বর্গে গেলেন তো দুই নাতির পরে টুকটুকে নাতনি দেখে মা-র গল্পও ফুরল, তবু সুধাময়ীর কোনও গল্পই নেই। তাঁর সোনার খাটে গা তো রুপোর খাটে পা। নিজের বাড়ি, জমিজমা, শ্বশুরের টাকায় সুধাময়ীর বরের কাপড়ের দোকান, মাথার উপরে শ্বশুর তখনও বেঁচে, দুই ভাশুর আর জায়েরা, তাঁদের পাঁচটি একজনের, তো অন্যজনের ছয়, এই এগারোটি ছেলেপুলে তখনই যখন সুধাময়ী, পনেরো বছরের ক্লাস ফোর পাস খুকি বিয়ে হয়ে আসেন। এতগুলি লোকের রান্নার কাজ বউরাই করে— কুটনো বাটনা জোগাড় দেবার লোক থাকলেও বউদের হাতে রান্না ছাড়া খাবে না কেউ। সুধাময়ী মায়ের কাছে শেখা বাঙালে ঝালের তেজ কমিয়ে একটু মিঠে করে দিলেন তরকারির স্বাদ, সরষে ইলিশ আর তেল কইয়ের মাখো মাখো মশলায় তেল গড়ানো অল্প ঝোলে গরম ভাত মাখতেই স্বাদ পাওয়া যায় ঘ্রাণে আর দর্শনে, জিভে ঠেকানোর আগেই। তাঁর হাতের পিঠে পায়েস আর সিঙাড়া কচুরির খ্যাতি সুধাময়ীকে রান্নাঘরের দেবী বানিয়ে তুলেছিল। তাঁর অবশ্য ভালো লাগত— রাঁধতে, খাওয়াতে। অন্য কোনও শখও তো ছিল না— না

সাজপোশাক, না সিনেমা-থিয়েটার, না সেলাই বা বইপড়া। ঠাকুমা জেঠিমাদের কাছে ছেলেরা থাকলেও কোলের মেয়ে তারা ছিল মা-নেওটা। সারাদিন যেমন তেমন, এ-কোল সে-কোল, এঘর-ওঘর, এ-বারান্দা ও-উঠোন, দাদাদের দলে বা দিদিদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, ওঠাবসা, খেলাধুলা হলেও রাত্তিরে তারাময়ীর মায়ের গন্ধটি, মায়ের কোলটি চাই। তো সেই তারাময়ীই কিনা মাকে বাড়ি থেকে বার করে দিল! আঙুল তুলে বলল, 'যে-দরজা দিয়ে বেরোলে, ফের কোনওদিন সে-দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে না। লোকের কথা ভেবে এতদিন সহ্য করেছি, আর নয়, কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে, তোমারও হয়েছে তাই। সারা জীবনে তো অনেক খেলে, তবু হয়নি?' কী এত সহ্য করেছে তারাময়ী আর কীই-বা এত অসহ্য হয়ে উঠল তার যে নিজের মাকেই বাড়ি থেকে বের করে দিল সে? অতশত সুধাময়ী ভাবতে পারেন না, কেমন থতমত বিহুল, পোঁটলা এক কাঁখে, বগলে শতরঞ্চি জড়ানো কাঁথা চাদরের বিছানা আর হাতে ছোট বালতিতে দু-চারখানা থালাবাটি বাসনকোসন, অবিকল ইন্দির ঠাকুরনটি হয়ে গাছতলায় বসলে পাড়ার কেউ এসে ডেকে নিয়ে যায়।

অথচ তারার বিয়ের জন্যই, সুধীর তারাকে বিয়ে করল বলেই তিনি প্রিয় গোস্বামীর বাড়ি ছাড়তে চেয়েছিলেন। প্রিয় ছাড়েননি তাঁকে। প্রিয় গোস্বামীর মায়ের সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বাল্য বন্ধুত্ব ছিল। তা তিনিই,শ্বশুরবাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা সুধাময়ীর দুরবস্থা দেখে, আবার তাঁরও একটি বিশ্বাসী লোকের দরকার থাকাতে কেননা ছেলে বিপত্নীক, একটাই নাতি, ঘরদোর জমিজমা, এসব দেখাশুনা করার জন্য, তিনি একা পেরে উঠছিলেন না আর; সুধাময়ীকে নিয়ে এসেছিলেন। তখন সুধাময়ীর শ্বশুর মারা গেছেন, ভাশুররা আলাদা হয়েছেন, শাশুড়ি টেনিস বলের মতো এ-সংসার ও-সংসার করছেন, কাগজে দলিলে আঁকাবাঁকা হরফে নিজের নামটুকু লিখে ক্লাস ফোর পাস সুধাময়ী স্বামীর দোকানের মালিকানা বদলে দিয়েছেন, সম্পত্তির অংশের দাবিও তুলে দিয়েছেন না-জেনেই। তাঁর রান্নাঘরের সাম্রাজ্য তিনটুকরো হয়ে পূর্বগৌরব হারিয়েছে। এখন যার যার হেঁসেলের ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য। ফলে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুধাময়ীর এই নিরুপায় প্রস্থান বিচ্ছেদদৃশ্য হয়ে ওঠে শুধু তাঁরই কাছে— নতুন করে উদ্বাস্তু হলেন যেন তিনি।

টুকুশ টুকুশ হাঁটেন সুধাময়ী। কোমরের ব্যথায় সোজা হতে পারেন না চট করে, ডান পায়ের পাতা সামনে ফেললে গোটা শরীরটাই ডানদিকে ঝোঁকে তো বাঁ হাত কোমরে দিয়ে ভারসাম্য রাখেন, আর তাতে তাঁর চলায় এক দোলা আসে,ডান পা ফেলা, কোমরে হাত, ডাইনে ঝোঁকা, বাঁ পা টানা। এ নাকি 'সায়টিকা'— নলিন ডাক্তার বললেন, 'মাসিমা, ছেলের বাড়ি গিয়ে থাকেন। না-হয় ছোটছেলের ওখানেই যান। একেবারে শুয়ে পড়লে কে দেখবে আপনাকে?' তা ছোটছেলে মঙ্গল হল একেবারে উলটো। বড়ছেলের জল, পাউডার মিল্ক মিশিয়ে দুধ বেচা ব্যবসা। লাল টালির ছাদ, পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির দেয়ালের দু-কামরার বাড়ি, উঠোনে লাউমাচা, তুলসী মঞ্চ এসব পরিপাটি সাজানো সংসারে তার বউ ও দুটি বাচ্চা

ছাড়া তিনটি মইষানী আর একটি জার্সি গাই— তো সে সংসারে বুড়ো বয়সে সুধাময়ীর একটু দুধ জোটে না। প্রিয়র মা বেঁচে থাকতে বা প্রিয়র বাড়িতে থাকতে তাঁকে কাপড়চোপড়ের ভাবনা ভাবতে হয়নি, টাকাপয়সাও হাতে থাকত মাইনে বাবদ। খরচের তো উপলক্ষ ছিল না তেমন, ছেলেদের পড়ার খরচও প্রিয় দিতেন তা তারা লেখাপড়া না-করলে কী আর করা যাবে। দুলাল ক্লাস টেন-এ আর মঙ্গল এইট-এ উঠে পড়া ছেড়ে দিল। দুলালকে গরু আর একটা মোষ কিনে দিয়েছিল প্রিয়ই। মঙ্গল মা-র সঙ্গে ঝগড়া করত। তখনই। লোকে প্রিয় আর সুধাময়ীকে নিয়ে নানা কথা বলত। প্রিয়র মা ততদিনে মারা গেছেন আর প্রিয়র ছেলে সুধীর কলকাতার কলেজে পড়ছে, ছুটিতে বাড়ি এলে তারাই তার দেখভাল করে, বকুনি খায়, আবার সুধীরের কাছে পড়েও। তারা মায়ের মতো অত সুন্দরী না হলেও তার হালকা ছিপছিপে শরীরের গড়নে রূপলাবণ্য ছিল। সুধাময়ী যখন প্রিয়কে তারার বিয়ের কথা বলেছেন আর প্রিয়ও ছেলে খুঁজছেন তখন সুধীর বি এস সি পাশ করে এক নার্সারি বানিয়ে ফেলেছে চাকরির পরোয়া না করেই। সেই তারাকে বিয়ে করে আলাদা হয়। প্রিয় মারা গেলে সুধীর ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে আসে। দুলাল সুধাময়ীকে নিয়ে যায়। তখন সুধাময়ীর হাতে টাকা ছিল, গয়নাও ছিল কিছু। ক'বছর ভালোই ছিলেন। একাদশীর ফল দুধ মিষ্টি। পূর্ণিমা অমাবস্যায় লুচি মোহনভোগ যেমনটি অভ্যাস হয়েছিল প্রিয়র বাড়িতে বা যেমনটি আবাল্য দেখে এসেছে দুলাল, প্রিয়র মা-ই তো এসব ব্যবস্থা করেছিলেন— 'আহা অল্প বয়সের বিধবা, কোনও সাধ আহ্লাদই নেই তো একটু ঘি দুধ ছানাই খাক। এত বড় বাড়ি সামলানো, নিজের ছেলেপুলে মুনিষ-কামিন-এর খাওয়া জলপান দেওয়া, গরু-বাছুর সামলানো। গায়ে জোর না হলে পারবে?' তো তখন থেকেই সুধাময়ী জানলেন একটু ঘি না হলে তাঁর আতপান্ন রোচে না, রাত্তিরে একবাটি দুধ হলে খই বা রুটি কেমন আরামে খাওয়া যায়, হালকা রঙের শাড়িতে তাঁকে দেখায় ভালো এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাধারণ ব্যাপারই, তো দুলাল তেমনটিই করতে বলে তার বউকে। তখন সুধাময়ী পুজোয়-পার্বণে নাতিদের জামা, মিষ্টি এটা সেটা দিতেন। হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে ছেলেকে বলেছিলেন গামছা আনতে, ছেলে টাকা চাইলে বলেন, 'তুই দিয়ে দে,আমার কাছে টাকা নেই।' দুলাল একটা গামছা এনে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এরপর সুধাময়ীর ঘি দুধে টান পড়ল। সেখান থেকে ছোটছেলের বাড়ি না-বলে আস্তানায় বলাই ভালো। মঙ্গল বিয়ে-থা করেনি তখনও, একটু উলুক-সুলুক স্বভাব তার বয়ঃসন্ধি থেকেই। কোনও মেয়েতেই তার মন থিতু হয় না। তো সুধাময়ী ছেলের একচিলতে ঘর-বারান্দা জুড়ে সংসার পাতেন। নিজেই এক-দু-খানা গয়না বেচলে ছেলে সে খবর পায় নির্ঘাৎ। 'করেছ কী মা? আমাকে দাও আমি বেচে দেব। ও শালা যদু স্যাকরাই তোমায় ঠকিয়েছে।' দেননি সুধাময়ী কারণ গয়নাগুলো যদু স্যাকরাই বানিয়েছিল তার তরুণ বয়সে। মঙ্গল দিন দুয়েক বাজার করল না তো সুধাময়ী অস্থির, শেষে একখানা কানপাশা দিয়ে বলেন, 'এ দিয়ে ক'দিন হবে? কিছু কর?' একখানা কানপাশা বিক্রি করে মঙ্গল তো আরেকখানা খোয়া যায়। দু-দিন পরে

পোঁটলা নিয়ে সুধাময়ী ফের বড়ছেলের বাড়িতে। কানপাশার সঙ্গে শেষ দু-চারখানা কুচো সোনাও গেছে কথাটা তিনি অনেকদিন বলেননি। কিন্তু ইচ্ছে না-থাকলেও অনেক গোপন কথা, গোপন রাখার ইচ্ছে থাকলেও মানুষ বলে ফেলে তেমনি রেশনের আতপ চালের ভাত আলু কুমড়োর তরকারি দিয়ে খেতে খেতে সুধাময়ী বলে ফেলেন, তাঁর গয়না চুরির কথাটা। শোকপ্রকাশের মতো কেঁদে কেঁদে। আজকাল তাঁর খালি খিদে পায়, পেচ্ছাব পায় ঘন ঘন, বেশি পেলে ধরেও রাখতে পারেন না তা কাপড় ভিজে যায়। একটা কাপড়কাচা সাবান, ছেলের সংসারের না-বলে নিলে যে চুরি করা হয় না এটা তার আজন্মের অন্য কোনও বিশ্বাস বা সংস্কারের মতো ধারণা, তবু নেবার সময় তিনি চোরের মতোই নেন, আর জিগ্যেস করলে চোরের মতোই মিথ্যে বলেন যে তাঁর কাছে পয়সা ছিল, তিনি কিনেছেন। ফলে সাবান চুরির সঙ্গে সঙ্গে পয়সা চুরির অপবাদও তাঁর জোটে।

গল্প যে কখন শুরু হয়ে যায়।

পনেরো বছরের লাজুক কিশোরী সুধাময়ী। পাঁচজনের সংসারে আলাদা করে ভালো-মন্দ খাওয়াতে পারতেন না বলে স্বামী লুকিয়ে রাত্তিরে সরভাজা, সরপুরিয়া খাইয়েছিলেন। সেই একদিনই। কোনও মতে জল খেয়ে বুক ধড়ফড় পেট আইঢাই ওমা কী লজ্জা! কী লজ্জা! 'আর কোনওদিন এনো না গো, বাড়িতে এত ছেলেপুলে, তো আমি ধুমসি বিয়েঅলা মেয়ে লুকিয়ে মিষ্টি খাব?' তখন কি তিনি জানতেন আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পরে মেয়ের বাড়ির ফ্রিজ খুলে আম আর সন্দেশ সরিয়েছিলেন বলে মেয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে? অতবড় সংসারে উদয়াস্ত খেটে গেছেন, মাসে বে-চারদিন রান্নাঘরে ঢুকতে পেতেন না তখন যে রান্না করতেন তার অন্য কাজ সামলাতেন তিনি। কাজের থেকে তার ছুটি মেলেনি প্রিয় মারা যাওয়া পর্যন্ত। প্রিয়র শেষ কাজে তাঁকে হাত দিতে দেয়নি প্রিয়র আত্মীয়স্বজন। প্রিয়ও বোধহয় ভাবেননি এমন আচমকা অপ্রস্তুতভাবে তাঁকে চলে যেতে হবে। নইলে তিনি বলেছিলেন কিছু জমি আর এ-বাড়ির একটা অংশ তিনি সুধাময়ীর নামে লিখে দেবেন। লোকে যাই বলুক প্রিয়কে তিনি কোনও কষ্ট দেননি, অসুখেবিসুখে, কাজেকর্মে প্রিয়র তাঁকে ছাড়া চলত না। এ এক অন্য ধরনের নির্ভরতা। অন্য এক মানসিক অবলম্বন। সুধাময়ী লেখাপড়া তেমন না জানলেও বুঝতেন। ঘোমটা ছাড়া মুখ দেখেননি প্রিয় সুধাময়ীর, তবু মাসে তেল সাবান এক কৌটো পাউডার আর স্নো আনতে ভুলতেন না। অসুখেবিসুখে ছাড়া প্রিয়র গায়ে মাথায় হাত দেননি সুধাময়ী, কিন্তু চুল আঁচড়িয়ে বা বেঁধে মুখে আলতো স্নো মেখে, গায়ে পাউডার দিয়ে খেতে দিতে গেলে প্রিয়র তৃপ্তি টের পেতেন। বিশ্ব সংসার কি জানে তাঁদের কথা! মা বেঁচে থাকতে সুধাময়ীকে তেমন খেয়াল করেননি প্রিয়। কিন্তু ভালো ফসল উঠলে, ঠিকমতো দর পেলে বা জমিটা বেচবেন কি না এসব কথা শুনবারও তো একটা লোক চাই। তো তাঁর নীরব সেবা আর মৃদু আনাগোনার মধ্যে দিয়ে সুধাময়ী হয়ে ওঠেন প্রিয়র প্রান্তবয়সের সেই সঙ্গিনী।

সুধীরও পছন্দ করত না তার শাশুড়িমাকে, ফলে বারকয়েক এ-ছেলের কাছে ও-

ছেলের কাছে কাটিয়ে সুধাময়ী মেয়ে-জামাই-এর বাড়ি এলে সে তারাকে বলে দেয়, 'এসেছেন যখন থাকুন কিছুদিন, কিন্তু বরাবর নয়।' তারা তবু বছর খানেক রেখেছিল মাকে, পুজোয় সায়া ব্লাউজ শাড়ি গামছা, একবেলা দুধ, একাদশীর ফল মিষ্টি সবই জোগাচ্ছিল সে স্বামীর সঙ্গে একরকম ঝগড়া করেই, কিন্তু তারও খেয়াল হয়নি সুধাময়ীর হাতে পয়সা নেই। তিনি একটু গুড়াকু দেন দাঁতে, খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট, একজোড়া হাওয়াই চটি হলে ভালো, হয়তো পাড়ারই কে যেন দেয়, তারাকে ঠেস দিয়ে দু-কথা শুনিয়ে 'আহা বুড়ো মানুষ অমন খালি পায়ে বেড়ান তো কী করি, নতুনই ছিল এক-দু-বার পরেছি' বলে পুরনো একজোড়া স্যান্ডেল, গুড়াকুও আসে একইভাবে। বকে-ঝকে সেটা বন্ধ হল তো মেয়ে বলে, 'মা আমার পেনসিল বক্স-এ দুটো টাকা ছিল দেখছি না' ছেলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে 'দিদা কেমন হজমোলা খাচ্ছে' বলে। শেষে ফ্রিজ থেকে আম আর সন্দেশ নিয়ে বাটিতে ঢেকে রেখেছিলেন, নাতিই সেটা আবিষ্কার করে পিঁপড়ের সারি দেখে।

গল্পটা তাহলে শুরু হয়ে গেছে।

টুকুশ টুকুশ হাঁটছেন সুধাময়ী, বিছানাটা কমল ভট্টাচার্যের বাড়ির সিঁড়ির নিচে, থালা আর ঘটি বাদে বাকি বাসন অ্যালুমিনিয়ামের বাটি, কয়েকটা হাতা, চামচ। ঘটিটা আর থালাটা ফুল কাঁসার— বালতিটা আছে অবিশ্যি, আর একটা পুরনো থানে গেরো দিয়ে ছোট ছোট পুঁটলিতে ছাতু, চিনি, মুড়ি, খই, চিঁড়ে, চা যখন যেমন। গরমে অসুবিধে নেই, কারও উঠোনে বা বারান্দায় ঘুমিয়ে রাত কেটে যায়, তখন দুপুরে কষ্ট। গাছগুলোও যেন হাঁপায়, গরম নিশ্বাসে শরীর পোড়ে যেন, এমন হাওয়া বয়। ধুলো ওড়ে। কে দেবে এই গ্রীষ্মের আগুনঝরা দুপুরে ঠান্ডা মেঝে শীতলপাটি, ডাবের জল, আমপোড়া সরবৎ কি বেলের পানা? এ ঠাকুমার কোলের কাছে 'গল্প বলো ঠাকুমা' বলা কোনও উত্তরপুরুষ নেই। এ ঠাকুমা শুধু নিজেই এক গল্প হয়ে ওঠে।

টুকুশ টুকুশ হাঁটেন সুধাময়ী—শীতের দুপুর তবু ভালো—রোদের তাতে গা ঘামে না, পায়ের তলায় মাটি তাতে না, গাছের ছায়া ঝিরিঝিরি সুধাময়ী জলভরা ঘটি নামিয়ে দু-হাতে কাপড় সায়া আলগা করে খানিকটা তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাটি ভেজান। একেবারে ব্যস্ত রাস্তার ধারে ডাক্তারের বাড়ির পাঁচিলের গোড়ায়, কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে। লোকে বলে লাজলজ্জা নেই। তাও কি হয় মা, বয়স হয়েছে বলে কি লজ্জা নেই? কদমফুলের মতো ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুলে ঢাকা মাথার কাপড় তো সরে না তাঁর। আর পেচ্ছাপ পেলে তা সামলে রাখতে পারেন না বেশিক্ষণ। তাঁকে তো মাঠেই যেতে হয়, তো মাঠ তো সবসময় কাছাকাছি থাকে না, এভাবে কাপড়চোপড় না সামলালে গোটাটাই ভিজত যে! বসে বসে পেচ্ছাপ করলেও উঠতে কষ্ট হয় তাঁর, কেউ যেন ধরলে ভালো হত, দাঁড়ালে সে সমস্যা নেই। এখনও তো লাঠি ছাড়াই হাঁটেন তিনি। সারাটা দিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতেন আগে। লোকে শুনতও তাঁর কথা। চা পাতি, চিনি, চাল-ডাল-আলু, একটু তেল-নুন-মশলা দিত এ-ও-সে। খেতেও দিত কেউ কেউ। 'আহা বামুনের বিধবা, ছেলেমেয়ে

দ্যাখে না' এইরকম করুণা মাখানো কয়েক গরাস ভাতই তো। তা দিনকাল বদলেছে, প্রায়ই চা-চিনি দিত মাস্টারের বউটা। গ্যাট ম্যাট হেঁটে যায় ব্যাগ নিয়ে, তাঁর দিকে ফিরেও চায় না। 'ও দিদিমা আজ কিছু নেই গো, ডিউটির ভাত দিতে হবে, কথা বলার সময় নেই, তুমি এখন এসো।' তো সুধাময়ীকে হাঁটতেই হয় বেশি। আজকাল বাড়ির বাইরে রোয়াক থাকে না। এই এতটুকু এতটুকু জায়গা নিয়ে বাড়ি, তো সুধাময়ী জিরোবেন কোথায়? এই ছোট শহরের স্টেশনটা খুব পছন্দ হয় ওঁর। সিমেন্টের কাঠের বেঞ্চি আছে লম্বা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে গাছের নিচে নিচে, একটাই ওয়েটিং রুম ফার্স্ট ক্লাসের জন্য তালাবন্ধ থাকে 'কি উইথ দ্য স্টেশন মাস্টার' এই বিজ্ঞপ্তি দরজায় লাগিয়ে। তা বাদেও পাকা ছাদের নিচে তিন দিক ঘেরা লম্বা সিমেন্টের বেঞ্চি ও মেঝেতে একটা অস্থায়ী একক সংসার পেতে ফেলেন সুধাময়ী। একটা ছোট তোলা উনুনে মাঠ থেকে কুড়ানো গোবর, শুকনো ডালপালার ওপরে পোড়া কয়লা, কাছেই চায়ের দোকান থেকে পাওয়া যায়, ছোট বাটিতে খুব চিনি দেওয়া লাল চা, কাপড়ে ছেঁকে অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে, সঙ্গে দুটো লেড়ো বিস্কুট দিয়ে এক ঝমঝম বৃষ্টির সকালে খেতে খেতে স্বামীর কথা মনে পড়ে তাঁর। কতদূর—যেন জন্মান্তরের পার থেকে তাঁর হাসিভরা মুখখানা আবছা মনে পড়ে। পুজোর সময় তাঁকে গাঢ় রঙের শাড়ি দিতেন। হালখাতায় শাদা খোলের চওড়া পাড় শান্তিপুরী। বৃষ্টির মধ্যেই একটা মালগাড়ি অনেকক্ষণ ধরে ভিজতে ভিজতে গেল। এই মালগাড়ি করে যাচ্ছে গরু মোষ, দড়িতে ঝুলছে তাদের দেখভাল করার লোকেদের বা মালিকদের গামছা, লুঙ্গি। বৃষ্টির জন্য এক একটা কামরার সামনে ত্রিপল ঝোলানো। দুপুরে এক অনবদ্য খিচুড়ি রান্না করেন সুধাময়ী। শিশিতে এক ফোঁটা তেল নেই, ফুটন্ত জলে প্রথমে ডাল পরে চাল ছাড়েন, আধসেদ্ধ হলে হলুদ নুন মিষ্টি দেন। কাঠ খোলায় শুকনো লঙ্কা জিরে তেজপাতা ভেজে গুঁড়িয়ে নেন ছোট হামানদিস্তায়। খিচুড়িতে আলু পটল ছিল একটি করে। ভাজা মশলাটুকু ছড়িয়ে দিলে গন্ধে ভিজে বাতাস ম-ম করে। তাঁর মনে পড়ে কত তরিবত করে তিনি ভুনি খিচুড়ি রাঁধতেন। ঘি ছাড়া খিচুড়ি রাঁধছেন তিনি? তবু খেতে বসে তিনি নিজেই চমৎকৃত। তিনি অবশ্য জানেন না এমন আতেলা চালে-ডালে সেদ্ধ তাও বিনা মশলায় এই ভারতবর্ষে কত শহরের ফুটপাতে বা কত গাঁয়েগঞ্জের ঘরের এক পুরনো বাধ্যতামূলকভাবে বা প্রয়োজনে উদ্ভাবিত রেসিপি। এ রন্ধন প্রণালী কোনও বইতে বা ম্যাগাজিনের পাতায় লেখা থাকে না, সেখানে বাসি রুটি বাঁচাতে তা ডিম দিয়ে সূর্যমুখী তেলে ভাজার নির্দেশ থাকে।

প্রিয় তাঁর রান্না খেতে ভালোবাসতেন। পেটের গোলমালে ভুগতেন বলে, শুক্তো, পাতলা মাছের ঝোল, গাঁদাল পাতার বড়া, ঘরে পাতা দই খাওয়াতেন। প্রিয় তাঁকে মাছ খেতে বলতেন। তিনি বলতেন, 'ছি, বিধবার মাছ খেতে নেই।' প্রিয় বলতেন তিনিও খাবেন না, তো সুধাময়ী মুনিসকে দিয়ে টাটকা মাছ আনিয়ে রাঁধতেন। সেই প্রিয় মারা গেলেন হাসপাতালে। তিনি দেখতেও পাননি। পাড়া প্রতিবেশী আর খবর পেয়ে আসা আত্মীয় বন্ধুরাই প্রিয়কে শেষবারের মতো সাজিয়েছিল। মৃত প্রিয়র মুখ তিনি দেখেননি তাই

প্রিয়র শাস্ত্রী মুখ স্মরণে আসে। খিচুড়ির গরাসে টপটপ করে সেই নিরুপায় স্মরণ ঝরে পড়ে। আজ প্রিয় বেঁচে থাকলে দুলাল, কি মঙ্গল কি তারা-সুধীরের কাছে তিনি যেতেন?

তো সুধাময়ী হাঁটেন টুকুশ টুকুশ—বেশ ছিলেন মাথার ওপর পাকা ছাদ, পাকা মেঝে, বেঞ্চিতে শোয়া, ইলেকট্রিক আলোয়। স্টেশনের লোক এসে একদিন ধমকায়, 'এ বুড়ি, এত নোংরা করেছিস কেন?' কী করে কী করে খবর যায় সুধীরের শাশুড়ি স্টেশনে জ্বরে গোঙান, তো বাগানের লোক পাঠিয়ে রিকশা করে তুলে আনে সুধীর। তারাকে বলে, পেছনে বাগানের কাছের ঘরটা সাফসুতরো করে দাও। থাকুক। এ মরেও না, লোকের কাছে মুখ দেখাতেও পারি না। খানিকটা চিকিৎসায় আর যত্নে-অযত্নে সুধাময়ী সেরে উঠে হেসে-কেঁদে একশা হন। ওমা এই তো তাঁর প্রিয়র বাড়ি। এটা মালির ঘর, প্রিয়ই বানিয়েছিল সুধীরের নার্সারির জন্য। এখন একটা লাঠি লাগে সুধাময়ীর, তো সেই লাঠি ঠুকঠুকিয়ে চলে আসেন রান্নাঘরে। 'আজ, একটু দুধ দিস তারা কতদিন খাই না। আর পোস্তবড়া।'

'তুমি কী গো?' 'মা' আর বলে না তারা, বোধহয় বলতে পারে না সে। বস্তুত পাশাপাশি হেঁটে গেলে মা-মেয়ে বলবে না কেউ, স্বাস্থ্যে প্রাচুর্যে অলংকারে তারার মধ্যযৌবন দীপ্তশ্রী, সুধাময়ী কোমর বেঁকিয়ে চলা কোনও এক হা-ঘরে কেউ, এমনটিই দেখায় তাঁকে। মাস কয়েক পরে সুধাময়ীই আর থাকতে পারেন না। গোটা কয়েক ফরসা কাপড়, সায়া ব্লাউজ আর মস্ত কালো এক গোলা সাবান তাকে জোগায় তারা, কিন্তু খিদেতে সুধাময়ী ছটফট করেন। তাঁর নিজে রাঁধার কোনও ব্যবস্থা নেই, রান্নাঘর থেকে তাঁর বরাদ্দ ভাত-ডাল-তরকারি যখন আসে তখন তাঁর সকালের চা-রুটি হজম হয়ে নাড়িভূড়ি হজম হবার জোগাড়। অথচ একাদশীর হিসেবটা তারার ঠিক থাকে। 'সারাদিন অত খাই খাই না করে ঠাকুরের নাম করলে তো পারো।' গজগজ করে তারা। 'স্টেশনে কত অজাত কুজাত ভিখিরিরা থাকে, মাগো কী করে সেখানে ছিলে? রান্না করে খেলে? ছি!' সুধাময়ী বোঝেন এরা তাঁকে যেতে দেবে না, তাড়ানো তো দূরের কথা। এ ঘরটা সাবেক বাড়ি থেকে দূরে। রাত্তিরে তাঁর কিছু হলে কেউ টের পাবে না। অমনি মরে পড়ে থাকবেন ভেবে সুধাময়ীর বড় ভয় করে। ঠিক ছেলেবেলার মতো ভয় করে তার, অথচ ছেলেবেলা মনে পড়ে না। যদি মনে পড়ত তাহলে দেখতেন অন্ধকারে চোখ বুজে বুজে উঠোন পেরিয়ে আসছেন রান্নাঘর থেকে। ওঘর থেকে ঠাকুমা হেঁকে বলছেন, 'কারে বাত্তি দেহাও বউমা, ওকি কিসু দ্যাহে? চক্ষু দুইডা বেবাক বুজা!' ছেলেবেলা মনে পড়ে না, যৌবন আবছা, ছেলেবেলার ভয় কোথা থেকে ঢুকে পড়ে সুধাময়ীর মনে, শরীরে, গলা কাঠ, ডাকতে চান, 'ও তারা? অ সুধীর?' তো স্বর ফোটে না। বাগানে ঝিঁঝি ডাকে, কত রকম সড়সড়, খড়খড় আওয়াজ হয়, সুধাময়ী বিছানা ভিজিয়ে ফেলেন। সকালে বাগানে জল দেয়ার পাইপ দিয়ে গাছের বদলে কাঁথা চাদরে জল দেন ঘরের মেঝেতে ডাঁই করে রেখে। সন্ধেবেলা পোঁটলা আর বালতি নিয়ে ফের একজনের বাড়ির সিঁড়ির নিচে রাখেন।

তারা বলে 'মা-র রাস্তায় ঘোরা হ্যাবিট হয়ে গেছে।' আবার সুধাময়ী হাঁটেন টুকুশ টুকুশ। এবারে তাঁর হাতে একটা লাঠি। চলতে ফিরতে সুবিধা, কুকুর, বেড়াল, কাক, শালিখ তাড়াতেও

সুবিধা। ঘি দুধ ছাড়া দিব্যি একবেলা চলে তার, দোকানে চা খান মাঝে মাঝে পয়সা দিয়ে, দোকানি বাসি কচুরি, ভাঙা মিষ্টি থাকলে দিয়ে বলে, 'খাও দিদিমা।' তো একদিন অমনি হাঁটছেন, দুটি চা-পাতা আর চিনি দিয়েছে কে যেন, কাঁকালে এক বোঝা শুকনো কাঠ, ছানু মণ্ডল ধরল তাঁকে, 'ও দিদিমা কোথায় যাচ্ছ?'

ছানু পঞ্চায়েতের সদস্য, সুধাময়ী জানেন, কষ্ট হলেও দাঁড়ান, 'ওই সত্যদের বাড়ি।'

ছানুর কপালে ভাঁজ পড়ে, সত্যশঙ্কর দাশ হেরে যাওয়া পঞ্চায়েত সদস্য। ওরই সিটটা ছানু জিতেছে, আর ওদের কাছ থেকেই এবার পঞ্চায়েত কেড়ে নিয়েছে ছানুদের পার্টি। 'কেন, সত্যদের বাড়িতে কেন? সুধীরদার সাথে ঝগড়া করেছ?'

'ঝগড়া কেন করব বাবা, ওখানে ভালো লাগছিল না।'

'সত্য তোমায় থাকতে দিচ্ছে?'

কাঠের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা কষ্টকর আর এতসব কথাই-বা ছানু জিগ্যেস করছে কেন সুধাময়ী বোঝেন না। সকাল থেকে চা খাননি, শরীরটা তাই ঝিম মেরে আছে, কতকটা দরকারে, কতকটা ছানুকে এড়াবার জন্য তিনি বলেন, 'এট্টা টাকা হবে বাবা? গুড়াকু কিনব।'

একটা নয় দুটো টাকাই দেয় ছানু। বলে, 'শোনো দিদিমা, সামনের লক্ষ্মীবার তেরো তারিখ বিডিয়ো আপিসে ভোটের ফটো তোলা, সকাল সকাল আসবে। তোমার কাছে কাগজ আছে তো? ম্যহঁহ তোমার কাছে থাকার কথা নয়, সুধীরদার কাছেও নয়, দুলালদার কাছে পাওয়া যাবে। পঞ্চেতে ভোট দিয়েছিলে দিদ্মা?'

কে জানে কবে শেষ ভোট দিয়েছিলেন সুধাময়ী। এক একবার ভোট দিতে যান, ভোট দেওয়া হয়ে যায় কেউ ধরে নিয়ে গেলে। ইন্দিরা গান্ধী যেবার খুন হল সেবার ভোট দিয়েছিলেন 'হাত' ছাপে। দুলালের বউয়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভোটের লাইনে। রাজীব গান্ধী খুন হবার পরের ভোটে দুলাল কিছু বলেনি বলে সকালে যাননি। দুপুরে তিনি কাকে যেন জিগ্যেস করেছিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, আজ কি ভোট?' তো সে জবাব দেয়, 'যাও ঠাকুমা, নইলে ছাপ্পা হয়ে যাবে।' তখনও বেশ লম্বা লাইন। তো ভোটের আপিসে গিয়ে জানেন তাঁর ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। আর সেটা জেনে তাঁর খারাপ লাগে না। একজনের ভোট অন্যজন দিয়ে দিলে বরং খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম বাঁচে, এই যে রোদের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেয় না কেউ, বুড়ো মানুষ বলে জায়গা ছেড়ে দেয় না, মেয়েরা কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে গল্প-টল্প করে ছাতা মাথায় দিয়ে, তাঁকে কেউ জিগ্যেস পর্যন্ত করে না তিনি কেমন আছেন। কোমরে ব্যথা নিয়ে দাঁড়াতে তাঁর খুব কষ্ট হয়। ভোটের ছেলেরা অবশ্য তার আগে ক'দিন খুব আসে 'দিদ্মা, দিদ্মা' করে। দুলালের বাড়ি থাকলে ভোট দিতে হয় 'হাত' ছাপে আর তারার ওখানে থাকলে 'কাস্তে হাতুড়ি'তে। মঙ্গলের ওখানে ভোটের সময় থাকেননি কোনওবার তো জানেন না ওখানে থাকলে কিসে ভোট দিতে হবে। প্রিয় বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে যেতেন রিকশা করে। প্রিয় অবশ্য নিজে যেতেন সাইকেলে। অতশত এখন মনেও পড়ে

না। তা ভালোই হল, কেউ একজন তাঁর ভোটটা দিয়ে দিয়েছিল। একটা অসুবিধে অবশ্য আছে যে তিনি কোন চিহ্নে ছাপ দেবেন সেটা সে জানবে কী করে? হয়তো সে দাঁড়িপাল্লায় দিল বা তীরধনুকে দিল বা পদ্মফুলে দিল—কিন্তু তাতেই-বা কী? কোন চিহ্নে ভোট দিলে কী হয় তাই তো তিনি জেনে উঠতে পারেননি এই তিনকুড়ি পার করে দেওয়া বয়সেও। 'কাস্তে হাতুড়ি' চিহ্নে ভোট দিলেও তার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, 'হাত' চিহ্নে ভোট দিলেও তাঁকে রাস্তায় হাঁটতে হয় টুকুশ টুকুশ। পঞ্চেত ভোটের সময় খুনোখুনি হয়েছিল, তাতে মিলিটারি পুলিশ এসে ভরে গিয়েছিল জায়গাটা। সন্ধে রাতে দু-দুটো ছেলেকে নাকি কুপিয়ে মেরেছে একদল। একজন নাকি ভোটে জিতেছিল। তা ভোটে জিতেও যদি কেউ নিজেকে বাঁচাতে না পারে তেমন ভোটের দরকার কী? তেমন লোককে ভোট দিয়েও-বা কী হবে? যে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন বলে তার ছেলেমেয়েরা বেঁচেছে। একমাত্র তাঁর ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে করলে তাঁকে বাঁচাতে পারে। একটা স্থায়ী ঠিকানা দিতে পারে। ভোটের কাগজে অবশ্য তাঁর একটা ঠিকানা আছে। দুলালের ঠিকানা। তো সেই ঠিকানাটা একসময় সত্যি ছিল; এখন মিথ্যে হয়ে গেছে। সে বাড়িতে গেলে দুলাল, দুলালের বউ তাঁকে ঢুকতে দেবে না। তারা-সুধীর বের করে দিয়েও তাঁকে তুলে এনেছিল। আটকে রেখেছিল, সেখানেও তাঁর কোনও ঠিকানা ছিল না। সেখানে তিনি যদি মরে যেতেন কোনও এক রাতে, এক ফোঁটা জল পেতেন না। হয়তো ঘটা করে তাঁর শ্রাদ্ধ হত। যেমনটি হয়েছিল প্রিয়র। কিন্তু তাঁর চাইতে আর কে বেশি জানত প্রিয়র ভালোলাগা মন্দলাগা, প্রিয়র অসুখ-বিসুখ, সুখ-দুঃখের কথা? প্রিয়র বউকে তিনি দেখেননি, ফটো দেখেননি। প্রিয় তাঁর বউকে ভালোবাসতেন, নইলে ছেলে মানুষ করার ছুতোয় আর একটা বিয়ে করতে পারতেন। প্রিয়র মা-ও নাকি অনেক বলেছিলেন। একদিনে নয়, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে দুটো চারটে শব্দ কি বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রিয়র বউকেও তাঁর একরকম করে জানা হয়ে গিয়েছিল। চেনা হয়ে গিয়েছিল। হয়তো সেই চেনা বা জানাটা প্রিয়র চোখ দিয়ে, প্রিয়র মন দিয়ে, তবু সেই মৃতের সঙ্গে জানাশোনায় জীবিতের সঙ্গেও চেনাজানা হয়, বউদিদির স্মরণের ভেতর দিয়ে তিনি আর প্রিয় কাছাকাছি হয়েছেন। তবে প্রিয়কে তিনি স্বামীর কথা বলেননি। প্রিয়ও জানতে চাননি। পাঁচজনের সংসারে স্বামীকে খুব একটা বেশি আলাদা করে পাননি, সংসার ভাগাভাগি হল তো তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর। তাঁর স্বামী লোকজন ভালোবাসতেন। সুধাময়ীরও আলাদা কোনও ভালোলাগা ছিল না। ছেলেপুলে রান্না খাওয়ানো এসব নিয়ে ভালোই ছিলেন। সেভাবেই তাঁর সংসারে থাকার কথা। সেভাবেই তাঁর সংসার থেকে যাবার কথা।

কিন্তু তাহলে তো কোনও গল্পই হত না।

ভোটের ফটোর ব্যাপারটা সত্য তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে। 'বুঝলে ঠাকুমা, এই হল তোমার আইডেন্টিটি কার্ড, মানে পরিচয়পত্র। এই-ই হল তোমার রেশন কার্ড —' সত্য কথা শেষ করার আগেই সুধাময়ী বলে ওঠেন, 'দুলালের কাছে যে র‍্যাশন কার্ড সেটি থাকবে না?' 'না, এটাই আসল।' 'নে এবার তোল, আমার নামে চাল তোল, চিনি তোল, গম তোল, কেরোসিন

তোল, রেপসিড তেল তোল, সাবান তোল।' খুব আনন্দ হয় ওঁর। যেন এবারে তিনিই এসব কিনে আনবেন রেশন দোকান থেকে। আহা, ভোটের ছবি থাকলে যদি পয়সা দিত কেউ! 'আর একটা কথা, আর সেটাই হল আসল কথা তোমার ভোট তুমি ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না।' 'সে তো একশোবার।' তাহলে এই একটা জিনিস তাঁর? শুধু তাঁর? এবারে সত্য একটু রসিকতা করে, 'বুঝলে ঠাকুমা এ কার্ডের মানে হল তুমি ভারতবর্ষের নাগরিক মানে সিটিজেন মানে .....' সত্য ঠিক বোঝাতে পারে না।

'মানে কী বাবা? কী বলছ বুজতে পাচ্ছি না।' সুধাময়ী বলেন।

'মানে তুমি যে এই দেশের লোক, আমাদের ঠাকুমা এটা তার প্রমাণ, কেউ তোমাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।'

তাই? তাই। আহ্ তাই! তাহলে তো সুধাময়ী ভোটের ছবি তুলতে যাবেন। ক'দিন উত্তেজনায় ঘুম হয় না তাঁর। বারে বারে বাইরে যান। ছবিটা তোলা হয়ে যাক। সেই কার্ড নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে যাবেন। থাকবেন। দুলালের বউকে ঠেলে ঢুকে যাবেন ভেতরে, সেখানে তাঁর বেশিদিন ভালো লাগবে না জানেন। মঙ্গলের ওখানেও যাবেন। শত হোক পেটের ছেলে। বাপের বড় আদরের ছিল। তাঁর ছেলেমেয়েদের সকলেরই চেহারা ভালো; তার মধ্যে মঙ্গলই সবচেয়ে সুন্দর। নেশা করে বোধহয়, ভালো করে খায় না, শরীরটা শুকিয়ে গেছে ছেলেটার। তিনি মরে গেলে পরিচয়ের কার্ডটা ওকেই দিয়ে যাবেন। তিনি দিয়ে গেলে মঙ্গল নিশ্চয় ওটা দেখিয়ে র‍্যাশন তুলতে পারবে। ছোট থেকেই বড্ড জেদি আর একবগ্‌গা ছেলেটা। পড়াশুনায় ওই-ই সবচাইতে ভালো ছিল। কী যে সব শুনেছিল কার কাছে, বলে কিনা, ওই এতটুকু বয়সেই বলে কিনা, 'প্রিয়কাকুর টাকায় পড়ব না। প্রিয়কাকুর ঘরে থাকব না। তুমিও থাকবে না।' চলেই গেল শেষ পর্যন্ত গ্যারেজের কাজে। এখন মনে হয় তিনিও চলে গেলে পারতেন। ছেলেটা তাহলে তাঁর গয়না চুরি করার মতো নষ্টদুষ্টু হয়ে যেত না।

সত্যশঙ্করের বাড়িতে একটা ঘর আছে। উঠোনের একপাশে। ছোট একটা ঘর। বোধ হয় চাকরদের থাকার ঘর। তো সুধাময়ী সেখানেই আছেন। একটা দড়ির চারপাই-এর ওপর কাঁথা চাদরের বিছানা। একটা লোহার ভাঙা কড়াইতে নিজেই উনুন পেতে নিয়েছেন। সত্যর বউ তাঁকে চেনে। কত নাড়ু মোয়া খেয়েছে ছেলেবেলায় সেসব গল্প করে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে। তো তাঁর একবেলার চাল ডাল আনাজপাতি সে-ই দেয়। সুধাময়ীর ইচ্ছে করে যে বলেন, 'ও নমি, রোজ রোজ না দিয়ে একদিন দুটি বেশি করে দে মা, আমি কি বোস্টুমি না ভিকিরি?' তো ভয়ে বলেন না, কে জানে যদি বলে, 'বসতে পেলে শুতে চায়। যাও ঠাকুমা আর দেব না।' তাছাড়া অনেকখানি দিলে তিনি রাখবেন কীসে? তাঁর রান্নাঘর আর ভাঁড়ার সাজানোর প্রশংসা করত সবাই। স্বামী বলতেন 'অন্নপূর্ণা', প্রিয় বলতেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। হায় এখনও যে তাঁর ইচ্ছে করে তেমন সারি সারি ঝকঝকে বয়ামে তেল মশলা ডাল বড়ি নাড়ু মোয়া আচার রাখেন। বড় বড় টিনে চাল গম আটা ছোট টিনে বাসমতী গোবিন্দভোগ। পরিচয় কার্ড পেলে তিনি কৌটো চেয়ে নেবেন সত্যর বউয়ের কাছ থেকে। চাল গম তেল চিনি রাখবেন তাতে। সত্যর বাড়িতে থাকেন তাই ওর কাছে

পয়সা চাইতে লজ্জা করে তো সত্য এসে একদিন বলে, 'ঠাকুমা তুমি ছানুর কাছে পয়সা চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ বাবা, গুড়াকু ছিল না।' সুধাময়ী ভয় পান।

'আমাকে বললে না কেন?'

'না তুই কত কচ্ছিস বাবা, তো সেও তো দিদমা বলে।'

'ও হল সব ভোটের নাতি। না না, আমাকেই বোলো।'

গল্প কেমন স্বাধীনভাবে চলে।

আজ সেই তেরোই এপ্রিল। আগে কয়েকদিন ধরে মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে কোথায় কোথায় ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত ছবি তোলা হবে। সুধাময়ীকে যেতে হবে বিডিয়ো অফিসে। সত্য বলে গেছে, 'সকাল সকাল যেয়ো ঠাকুমা, তাহলে রোদ লাগবে না। একদিনে করেছে সব, আমার মরবারও সময় নেই', বলে সে হিরো হোন্ডা হাঁকিয়ে বউ নিয়ে বেরিয়ে যায়। আধঘন্টা বাদে তার বউ ফেরে অন্য কার একটা স্কুটারে চেপে। হলুদ সিল্কের শাড়িটা ছাড়তে ছাড়তে ভেতর থেকেই বলে, 'ওমা! ঠাকুমা, এখনও যাওনি? কী করছ এতক্ষণ?'

কালকে মনে ছিল না -- আজ সকালে উঠেই কম ছেঁড়া ধুতিটা কেচে মেলে দিয়েছেন সুধাময়ী। চান করে কাঠকুটো জ্বেলে চা বানিয়ে খাচ্ছিলেন শুকনো চিঁড়ে দিয়ে। সত্যদের বাগানটা মাঝারি, তাঁর ঘরটা একপাশে হলেও হাঁক পাড়া দূরত্বে। ঘরের ওপরে কৃষ্ণচূড়ার ছায়া দোলে। এখনও ফুল ফোটেনি তবু পাতাগুলি নবীন।

ছানু সুধাময়ীকে দেখে দৌড়ে আসে, 'এসো দিদিমা, দেখি তোমার কাগজটা? এদিকে এই লাইনে দাঁড়াও।' বলতে বলতে পেছন থেকে সত্যশঙ্কর উঁকি মারে, 'এত দেরি করলে ঠাকুমা? এদিকে এসো, ছায়ায় দাঁড়াও, বুড়ো মানুষ, 'অ্যাই নীলা তোর পিছনে ঠাকুমা রইল ডেকে নিস। ঠাকুমা, নীলা তোমায় ডেকে নেবে।' বলে সত্য আবার গেটের দিকে যায়।

সাতজন সাতজন করে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে ডানদিকের দ্বিতীয় ঘরে, যেখানে ফটো তোলা হচ্ছে, ঢোকে। পুরনো বাড়ি বলে ভিত উঁচু-- পাঁচ-ছ-টা সিঁড়ির ধাপ। এক ভদ্রমহিলা, বয়স্কা, দু-জনের কাঁধে ভর রেখে নেমে আসেন, নিচে স্বামী, তাঁরও লাঠির ভর বাঁ হাতে, তবু কে জানে কত বছরের অভ্যাসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দেন স্ত্রীর দিকে। 'সরুন দাদু' বলে লাইন ভেঙে এক মিঠুন ছাঁট দু-হাতে ধরে একাই নামিয়ে দেয় মহিলাকে। পেছন থেকে কেউ একজন বলে, 'ছবির পরে সন্দেশ খাওয়াবে গুরু, বাক্স এসে গেছে।' সত্যি বড় ব্যাগে অনেকগুলো প্যাকেট আসে। নামানো হয়। বারান্দা দিয়ে তা ভিতরে চলেও যায়। 'অ্যাই, অ্যাই আজই কিন্তু কাকে ভোট দিবি ঠিক হয়ে যাবে।' 'সে কী রে। ক্যান্ডিডেট কই?' 'ছাড় ওসব ক্যান্ডিডেট-ফ্যান্ডিডেট বাজে কথা, আসল হল পার্টি -- তুমি কোন পার্টিকে ভোট দেবে আজই ঠিক হবে।' 'এ শালা কী সেজেছিস? সেন্টু মাখিসনি? ফটো দিয়ে গন্ধ বেরোবে।' 'আরে মিলন, দাড়ি ফাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিস যে! চুল ছেঁটেছিস, ক্ কী ব্যাপার?' 'আরে না না, বাবা বলল একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক তা এরকম কাপালিকের মতো চেহারায় ফটো তুলবি? তাই।'

'মেয়েগুলোর সাজ দ্যাখ, যেন বিয়েবাড়ি। চুলে ফুলটাই দেয়নি।' 'ফুল দিলে তো ভালোই হত রে। গরম কমত। কী সব দিয়েছে সারা মাথায় চকচক করছে।' 'ক্লিপ হেয়ারব্যান্ড হবে হয়তো।'

'ও দিদিমা এসো এসো।' কী যেন ভাবছিলেন সুধাময়ী। নীলার ডাকে চমকে ওঠেন। পেছনের মেয়েটি ওঁকে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। কোমরে হাত, সিঁড়িতে পা, সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো দু-জন টেনে তোলে ওঁকে। 'এইদিকে', চেয়ারে বসা লোকটি 'দেখি' বলে ওঁর কাগজটা দেখে বলে 'ওইদিকে'। ডানদিকে, করিডর ধরে এগিয়ে যান তিনি নীলার পেছন পেছন। পেচ্ছাব পাচ্ছে তাঁর। একটা লম্বা টেবিলের একধারে বারান্দার গ্রিলে পিঠ দেওয়া চেয়ারে বসা দুটি লোক। 'নাম বলুন আপনার, নম্বর কত?' 'সুধাময়ী দেবী, নম্বর জানি না বাবা।' 'ঠিক আছে, নম্বর বলতে হবে না। টাইটেল বলুন, সুধাময়ী কী?'

কয়েক সেকেন্ড মনে পড়ে না সুধাময়ীর শ্বশুরবাড়ির পদবি, যেন কত যুগ আগের কথা, তারপর মনে পড়ে, মনে পড়ে, বিবাহ মনে পড়ে, মন্ত্রোচ্চারণ মনে পড়ে, সপ্তপদী মনে পড়ে, কনকাঞ্জলি মনে পড়ে, কড়ি খেলা মনে পড়ে, কী লজ্জা, কী লজ্জা, ফুলশয্যা মনে পড়ে। 'কী হল দেরি করছেন কেন, বলুন?' এ পাশের লোকটি ধমকায়।

'ভট্টাচাজ্জি। সুধাময়ী ভট্টাচাজ্জি, বাবা।'

'পেয়েছি। একুশ নম্বর, যান।' সামনের দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখায় লোকটি আর সুধাময়ী খানিকটা বিহ্বল হয়ে ঢুকে পড়েন প্রায় টুলে বসে একটা লোকের গায়ের কাছে। 'এদিকে নয়, এপাশে দাঁড়ান।' সুধাময়ী টিভি চেনেন, তো সেইরকমই একটা কিছু দ্যাখেন টেবিলের ওপর তো তাতে কোনও শব্দ নেই, ছবি নেই, একটা লোক হাতে কি একটা কালো মতন মেশিন, ছোট ওটার থেকে, নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার পেছনে আর দু-পাশে উঁকি দেওয়া আরও কয়েকজন। 'হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, যান যান' বলে তাঁকেপাশের ঘরের দিকে ঠেলে দেয় কেউ। ঠেলা খেতে খেতে সুধাময়ী কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'ছবি হয়ে গেছে বাবা? কখন হল?'

বেরিয়ে এসে সুধাময়ী ছানুকে খোঁজেন, দ্যাখেন ভিড়ের মধ্যে। 'ও বাবা ছানু, কাড্ কখন দেবে?' তিন চারবার বলার পর ছানু বরাভয় দেবার মতো হাত তোলে, 'সময় হলেই পাবে। বুঝলে, এ হল শেষন সাহেবের গুঁতো, শালা সুড় সুড় করে ফটো তোলাচ্ছে', শেষ বাক্যটা অ ন্য একজনকে। 'দেখ দাদা, ঠিক লোকের ভুল ফটো যেন না তোলে।' একটা সমবেত হাসির হাওয়া পাক খেয়ে চলে যায় সুধাময়ীর মাথার ওপর দিয়ে। তিনি হাঁটেন টুকুশ টুকুশ। সত্যকে খোঁজেন। দেখতে পান না। হয়তো তার হিরো হোন্ডা অন্য কোনও বুথের সামনে। খুব পেচ্ছাব পেয়েছে সুধাময়ীর। জল তেষ্টাও পেয়েছে। খিদেতে পেটের ভেতর মোচড়াচ্ছে। বিডিয়ো অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি রাস্তা পেরিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় অফিসের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ান। সায়া কাপড় একটু তুলে ছড়িয়ে ধরেন। মাটি ভেজাতে ভেজাতে ভাবেন বাড়ি গিয়ে সত্যকে জিজ্ঞেস করবেন কবে তাঁর পরিচয় কার্ড পাবেন।

প্রতিক্ষণ ১৯৯৫

মারী

১৯৯৫ সালের এপ্রিলের এক খটখটে দুপুরে সুরেশ কুনুই-এর ছোটছেলে তিনু, ছাগলছানা কোলে বাড়ি ফিরছিল। কালো কুচকুচে ছানাটা, কপালে শাদা চাঁদের তিলক, গলায় জড়ানো লাল পাড়ে কয়েকটা ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছে তিনুই — 'ওস্তাদ' বলে ডাকলে শব্দ হয় — টিং টিং, টিং টিং। তিনুর হাতের তেলো সুড়সুড় করে ছানাটা ওর হাত থেকে কালচে সবুজ কাঁঠাল পাতাগুলো কচমচ শব্দে চিবিয়ে খেলো। আবার বাঘা যদি মিছিমিছি ভয় দেখায়, ছানাটার তখন তিড়িং বিড়িং লাফ — ঝিনিনিনি -ঝিনিনিনি!

কালীপুজোর মানসিকের ছাগল বলে খুব সাবধানে রাখতে হয় ছানাটাকে যাতে খুঁতো না হয়, মা বলেছে, 'যেন চোট না পায় — মায়ের থানে মানসিক আছে।' তিনুর মায়া লাগে, বুকের ভেতর চেপে ধরে ছানাটাকে, কেমন গরম গরম পরশ ছানাটার, তিনুর গা শিরশির করে আরামে। পারলে সে ওটাকে লুকিয়ে রাখত কোথাও --- এমন জায়গায় যে, পুজোর দিন কেউ ওটাকে খুঁজেই পেত না। ওস্তাদকে হাড়িকাঠে ফেলে বলি দেবে ভাবতেই তিনুর চোখে জল আসে। আবার সেই বলির মাংসে। ওস্তাদের মাংসে? হোক না 'প্রসাদ', তিনুর গা গুলিয়ে ওঠে সেকথা ভাবলে। বলি দেয়া-টেয়া তিনু দেখেছে, মাংস খেতে ও এত ভালোবাসে, বেশির ভাগ ছোট ছেলের মতোই যে, বাড়িতে অবরেসবরে মাংস রান্না হলে সে সেদিন অন্য কিছু মুখেই তুলবে না, মাংসের টুকরো গোনাগুনতি বলে ঝোল আর আলু দিয়ে একথালা ভাত সাপটেসুপটে খেয়ে উঠবে। কিন্তু তা বলে ওস্তাদের মাংস?

রাত্তিরে শোবার ঘরেই থাকে ছানাটা, ভারি ভালো অভ্যাস ওটার যে, ঘরে নাদে না, পেচ্ছাবও করে না। তিনুর ছোড়দিদি মানু বলে, 'আহা হা, দু-দিন বাদে হাড়কাটে গলা তো রোজ রোজ ভাঁড়ে চা! মরণ আমার, রাতদুপুরে দুয়ার খুলো, কী না, ওস্তাদ পিসাপ কইরবে। হেসে বাঁচিনে, মাগো মা।'

কিন্তু মানু হেসে না-বাঁচলেও সকালবেলা তিনু একটা রসগোল্লার ভাঁড়ে চায়ের তলানি সংগ্রহ করে। বাড়িতে লোকসংখ্যা নেহাত কম নয় — তিনুরা ভাইবোন ছ-জন, বাবা মা আর ঠাকুমা মিলে ন-কাপ চায়ের তলানি জড়ো করলে ওস্তাদের এক ভাঁড় চা হয়।

তিনুদের সকালে ইসকুল, তাই দুপুরবেলা মাঠে মাঠে ঘুরতে ওর কোনও অসুবিধে হয় না। শনিবার বলে তিনু বাড়ি আসে আরও আগে, চান করে খেয়ে একমুঠো ডালমাখা ভাত নিয়ে কুকুরটাকে খুঁজল, — 'আয় আয় বাঘা, আ তু তু তু ?' তো রোজকার মতো কুকুরটা দৌড়ে এল না। এসময় কুকুরটার উঠোনের কোণের কাঁঠালগাছটার তলায় থাকার কথা

নয়, কেননা এখন গাছটার নিচে গাছটারই ছায়া কুঁকড়ে মুকড়ে গুটিয়ে এই এতটুকু, ভরদুপুরে তাতে একটা কাক কি শালিখও বসে নেই; গাছের পাতাগুলো নড়ে না, চড়ে না—যে যেমনটি তেমনটিই স্থির – গাছ নয় যেন গাছের ছবি – তিনু হাতের ভাত জামের ভেতর রাখে; মাকে হাঁকায়, 'বাঘার ভাতটো দিয়ো মা, জামে রাইখলুম।'

'মায়ের ঢের সারি কাজ, তুই রাখ তিনু আমিই দিব', বলতে বলতে গোবরন্যাতা নিয়ে মানু আসে এঁটো তুলতে। পেছন পেছন আসে ছোট আম্মা ছোট এক থালায় ভাত নিয়ে, সেও ইসকুল থেকে এল।

তো তিনু যায় ছানাটাকে খুঁজতে – মাঠে মাঠে, আলে আলে। নামেই ছানা, আসলে ছটফটে ছোট্ট ওস্তাদ আর মায়ের দুধ খায় না। ওস্তাদের মা লালী হল তিনুর ছোটপিসির ছাগল। ছোটপিসি আর পিসেমশায় থাকে অজয়ের ওপারে। গাঁয়ে। সেখান থেকে গাঁয়ের লোকেরা এপারে আসে বাগান সাফ করতে, ধান রুইতে, ইঁটা নামাতে, আরও কত কী কাজ করে তারা। পিসেমশায় এসব করেন না, কেননা তিনি হলেন গে কারিগর। বাঁশ দিয়ে ফুলের সাজি ঝুড়ি কুলো মাছধরার শুকুট মাটি বইবার হাফ ঝোড়া এসব বানিয়ে হাটে বেচতে আসেন। মাঝে মাঝে ফেরার পথে তিনুদের বাড়িতে চা মুড়ি খেয়ে যান। এমনিই একদিন ওস্তাদকে এনে দেন পিসে, 'লাও গঁ বোদি তুমার মানসিকের পাঁটা। সুরো পাঁঠাই দিলেক।'

ওস্তাদ ভারি দুষ্টু। এই উঁচু পাঁচিলে উঠে সার্কাসের ম্যাজিক -মেয়েদের মতো হেঁটে যায়। লাফ দিয়ে নামে, কচরমচর পাতা চিবোয় জবা টগর পাতাবাহারের। গেরস্ত পাথর ছুঁড়লে, ঢিল মারলে, হ্যাঁচোড় প্যাচোড় করে পাঁচিল ডিঙিয়ে দেবে ছুট; তিনুকে ডেকে ডেকে গাল পাড়ে লোকে। ছানাটাকে বেঁধে রাখতে বলে। কিন্তু ওস্তাদকে কী দিয়ে বাঁধবে তিনু? নাইলনের দড়ি পর্যন্ত চিবিয়ে দু-খণ্ড করে ফেলে ওস্তাদ, নেহাত গলার পাড়টা ঘাড় ঘুরিয়ে চিবোতে পারে না তাই ঘন্টা বাজে 'টিং টং, টিং টং'।

অনেকখানি হেঁটে, দৌড়ে ছানাটাকে ডেকে ডেকে তিনুর গলা শুকিয়ে কাঠ। শুকনো, উঁচু নিচু আলে আলে এসেছে ও, ফেটে ফুটে আছে মাটি, এখনও লাঙল পড়েনি, খালি পায়ে এ মাটি বড় ব্যথা জানায়-- তিনুর পা দুটি এখনও নরম কচি। ছায়া পড়ে না – এতটি উঁচুতে পাতলা ছাড়া ছাড়া মেঘ আকাশে, তিনুর ডাইনে, সূর্য ঢলে পড়েছে দূরের গাছগাছালির মাথায় আর তার থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা লম্বা কালি রোদ্দুর সেইসব গাছের ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে, পাতা লতা ফুল ফল ছুঁয়ে, ধূলোর ভেতর দিয়ে তিনুর ডান কপালে চমকায়, শরীর ছোঁয় উষ্ণতায়, ক্রমে আকাশের মেঘগুলি রক্তিমবর্ণ, তাদের প্রান্তভাগগুলি নববধূর বেনারসির পাড়ের মতো স্বর্ণাভ হলুদ হয়ে ওঠে।

অনেক অনেক অকর্ষিত খেত পেরিয়ে তিনু দ্যাখে ছানাটা বসে আছে বটগাছের তলায়। একেবারেই একা গাছটা, ঘন ছায়ার ছেয়ে আছে তলাটা, ঝুরির পরে ঝুরি নামিয়ে মাটির কত গভীর থেকে রস তুলে আনছে দিনরাত্রি। বাগাল ছেলেরা এইখানে বসে মাঝে মাঝে ,

আজ তিনু কাউকে দেখতে পেল না। তিনুকে দেখে ছানাটা মুখ তুলে ডেকে উঠল তীব্র ছোট ছোট কম্পন তোলা স্বরে, সেভাবে ডাকতে ডাকতেই উঠে এসে ছোট মাথাটা গুঁজে দিল তিনুর কোলে, নিচু হয়ে তিনু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। গাছতলায় একটু থির হয়ে বসলে শুকনো হাওয়াটাকেও ঝিরিঝিরি নরম লাগে। হাওয়া এত শুকনো যে, এই গরমেও গায়ে ঘাম ফোটে না। আঙুল বোলালে চামড়ার ওপরে নুন কির কির করে —গলা বুক শুকিয়ে হা হা। দুটো ঢোক গেলে তিনু জিভটা দু-গালে, মাড়িতে বুলিয়ে, লালাটা চটচটে আর মোটা লাগে, তবু গলাটা যেন ভেজে।

'ওস্তাদ, আমার ওস্তাদ।' মাটিতে শুয়ে ছানাটাকে পেটের ওপর চেপে ধরে আদর করে তিনু। 'পেট ভরেচ্যে? ঘর চল, পাতা খাবি। বাঘা কুথা ওস্তাদ?' তিনু না থাকলে বাঘাকুকুর ছানাটার সঙ্গে খেলা করে। কখনও এই মাঠেও চলে আসে। ছানাটাকে কেউ ধরতে গেলে বাঘা তেড়ে যায়। আজ ছানাটা এতদূরে চলে এসেছে আর তার পাতের ভাত খেতে কুকুরটা এল না দেখে তিনু ভাবে বাঘা এখানেই। 'বাঘা কুথা ওস্তাদ?' বললে ছানাটার কান লটপট করে মাথা ঝাঁকালে আর তক্ষুনি তিনুর চোখে পড়ে লটপটে কানের একটাতে রক্ত শুকিয়ে আছে।

'ইশ্‌শ্‌ কে কামড় দিলেক তোকে?' তিনু ওখানে সন্তর্পণে হাত দেয়।

'ম্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।'

'আরে, কে ব্যাটেরে ওস্তাদকে কামড়ায়?'

'ম্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।'

'বাঘা? হ্যাঁ?' তিনু গর্জে ওঠে — 'শালা, মানসিকের পাঁঠা .... কী হবেক?'

মা-র কথা মনে হয় ওর, সুরেশ কুনুই, ওর বাপের কথা মনে হয়। 'বাবু পিটবেক, মা গালি দিবেক ..... ' বলতে বলতে ছানাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে, বেশ আরাম লাগে ওর, ছানাটার তেল চকচকে মোলায়েম চামড়ার রেশম কোমল স্পর্শ তিনুর রোগাটে হাতের ঈষৎ খসখসে ফরসা চামড়ায় ঘুমের মতো জড়িয়ে থাকে। এদিক-ওদিক সন্ধানী চোখে তাকিয়ে কুকুরটাকে দেখতে পেল না ও। ঘুরে বটগাছের ওদিকে গেল — সেখানেও নেই। বটগাছটার পেছন দিকে খানিকটা গেলে একটা ছোট বাঁধ মতো। লালচে মাটির ঢিবি ঘেরা খানিকটা ঘোলাটে জল। বর্ষায় এক গলা জলে সুষনি শাক হয়। বাঘা যদি এতটি ধূপে জোড়ের ধারে শুয়ে থাকে ভেবে ও পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া সরু পথ বেয়ে বাঁধের ওপরে ওঠে। বেলা পড়ে এসেছে, বাতাস তবু ঠাণ্ডা হয়নি, টুকরো টুকরো জমির ওপরে কোথাও কোথাও এখনও কাটা ধানের গোড়া শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। তবু আল ঘেঁষে কিছু ঝোপ আর মাটিতে লেপ্টে থাকা ঘাস খায় গরু-মোষ, ভেড়া আর ছাগল। মাঠের মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একটা একলা গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে সারা দুপুরের তাপ সয়। তারই নিচে ফুটিফাটা রংজ্বলা বাঁকা বাঁটের মস্ত কালো ছাতা নিয়ে রাখাল ছেলেদের জটলা। ওরা এবার ঘরে

ফিরবে। বাঘাকে কোথাও দেখতে পেল না তিনু ঘাড় ঘুরিয়ে দিগন্ত পর্যন্ত দেখল চারিধার তবু।

বাড়ি এসেও কুকুরটাকে দেখতে পেল না তিনু, উলটে মা-র কাছে বকুনি খেল দেরি করার জন্য। ছানাটার কানে দুব্বো ঘাস ছেঁচে রস লাগাতে হল, এই রুখাশুখার দিনে দুব্বো পাওয়া মুশকিল। ভাগ্যিস, কানের জখমটা মা দেখতে পায়নি। জখমটাও তেমন বেশি নয়, হয়তো খেলতে খেলতে আলতো করে কামড়াতে গিয়ে, তিনু বাঘার মুখে হাত ঢুকিয়ে দিলে বাঘা তো তেমনি করে, গরর করতে করতে আলতো ছোঁয় দাঁত দিয়ে, তো হঠাৎই হয়তো লেগে গেছে। ছানাটাকে ঘরে ঢুকিয়ে শেকল তুলে দিলে মা বলে, 'রেতে উঠবি তো?'

তো তিনু, 'হ্যাঁগো মা।' বলে তাড়াতাড়ি উঠোনে চট পেতে পড়তে বসে যায় ভাইবোনদের সঙ্গে। গরম বলে রাত্তিরে সবাই উঠোনে শোয়। রাতে খাবার সময় কুকুরটা আসে। তিনু রুটি ছিঁড়ে দেয় আধখানা— 'আয় আয়, তু তু বাঘা, কুথাকে ছিলি বেটা?' কুকুর অন্য দিনের মতো দৌড়ে আসে না, রুটির টুকরো নিয়ে কেমন এলোমেলো পায়ে চলে যায় কাঁঠাল গাছের নিচে। তিনুর এত ঘুম পায় যে দেখতে পায় না। কুকুরটা ওই অতটুকু রুটির টুকরো অন্যদিনের মতো পুরোটা দাঁত আর জিভ দিয়ে মুখের ভেতরে পুরে দেয় না, বরং প: দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছোট ছোট টুকরো করে অকেটা সময় নিয়ে কষ্টে গেলে আর ঘুরে দ্বিতীয় টুকরো নিতে আসে না তিনুর দাদা পানু ডাকলেও।

তিনুকে কুকুরটা কামড়াল পরের দিন রাতে খাবার সময়। সেদিন কুকুরটা সারাদিন কিছু খায়নি। সারা সকাল, বিকেল, দুপুর কাঁঠালতলায় শুয়ে বসে ঝিমোল। তিনুর ঠাকুমা বলল, পেটের গোলমাল হলে নাকি কুকুর বিড়াল উপাস করে। তিনু ঠাকুমার কথা মানে খুব—তার 'ঠাগমা' কত জানে অক্ষর চেনে না তো কী, কত গপ্‌পো বলে তাদের পাশে শুইয়ে —রামের গল্প, সীতাহরণ, হনুমানের লঙ্কাদহন, ঠাকুরের গল্প, ডাইন আর ভূতের গল্প। ঠাকুমা এও বলে যে, বেড়াল কুকুর ঘাস খায় শরীর খারাপ হলে—বমি করার জন্য—তো বাঘা ওঠেওনি, ঘাসও খায়নি, সারাদিন শুধু জিভ বার করে লালা ফেলেছে কাঁঠালতলায়।

একদিনেই ওস্তাদের কান বেশ শুকিয়ে ওঠে, তিনু বাদে কেউ লক্ষ করে না ছানাটার কানের চামড়ায় ওপর কালচে রক্তের ছোপ। রাত্তিরে খেতে বসে তিনু রুটি ছিঁড়ে দু-চারবার ডাকে, 'আয় বাঘা আয়', বলে। কুকুরটা গোল পাকিয়ে শুয়েছিল ওই একই জায়গায়, কোনওক্রমে মাথা তুলে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আবার ঝিমোয়। তিনু রুটি নিয়ে ওর মুখের সামনে ধরে। হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরলে কুকুরটা রুটি সমেতই ওর হাত এমন কামড়ে দেয় যে ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়ে। সুরেশ খাওয়া ফেলে উঠে আসে, ছেলেমেয়েরাও দৌড়ে আসে, তিনুর মা তাড়াতাড়ি খাবারগুলো, হাতের কাছে যা পায়, কুলো ডালা থালা, চাপা দিয়ে 'ওমা কী হল গো?' বলে দৌড়ে আসে; ঠাকুমা খানিক ঝিমোনো অবস্থায় আচমকা এত চেঁচামেচি শুনে 'কী হচ্যে?' বলে চারপাই থেকে নামার চেষ্টা করে। কুকুরটা উঠে

দাঁড়িয়ে গরগর করতে করতে তাড়া খাওয়া বেপাড়ার কুকুরের মতো পেছনের দুই পায়ের ফাঁকে ল্যাজ গুটিয়ে দাঁত দেখালে সুরেশ 'শালো কুত্তার বাচ্চা কুত্তা, হারামি কুথাকার, মর তুই....' বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কয়লা ভাঙার পাথরের পাশ থেকে মস্ত হাতুড়িটা তুলে কুকুরটার মাথায় বসিয়ে দেয় আর একটা ভাঙা আওয়াজ তুলে কুকুরটা থরথর পায়ে একটু কাঁপে তারপর ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায় নিঃশব্দে।

সুরেশ রাগী মানুষ, তায় ইদানীং তার রোজগার কমে গেছে, বাড়িতে খাওয়ার লোক তো কম নয়, কুকুরটাকে রোজ রোজ ভাত রুটি দেয়া সে পছন্দ করে না, রুটি নষ্ট হওয়াতে তার মাথায় রক্ত উঠে যায়। তার উপরে ছেলের হাত দিয়ে রক্ত পড়তে দেখে সে রাগের মাথায় কুকুরটাকে মারে। কিন্তু সে ভাবেনি ওই এক আঘাতেই কুকুরটা মরে যাবে। ঘটনার আকস্মিকতায় বাকি সবাই কেমন হতভম্ব হয়ে যায়, এমনকি তিনু পর্যন্ত কাঁদতে ভুলে যায়।

হাতুড়ির ঘা মেরে মেরেই সুরেশের রাগ পড়ে গিয়েছিল, ছেলেমেয়ে আর তাদের মায়ের ছবি হয়ে যাওয়া দেখে সে নিচু হয়ে কুকুরটাকে দ্যাখে, পা দিয়ে ঠেলা দেয় একটু, তাতে কুকুরটার রক্তমাখা মুখটা নড়ে ওঠে, মৃতই নড়ে ওঠে যে কোনও জড়বস্তুর মতোই। ইতিমধ্যে মানু মায়ের পানের বাটা থেকে এক খাবলা চুন নিয়ে তিনুর হাতে লাগিয়ে দেয়। তিনু আবার কেঁদে উঠলে সুরেশ হাতুড়িটা কয়লার স্তূপের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'চু উ উ প।'

তিনুদের মা সন্ধ্যাবাতি দেবার খানিক পরে শাশুড়িকে খাইয়ে চারপাইতে কাঁথাবালিশ পেতে দেয়। বুড়ি খানিক ঘুমোয়, খানিক ঝিমোয়, খানিক জাগে। এভাবেই রাত পোহালে কুঁকড়ো ডাকে, পাখপাখালি জাগে, বুড়িও ডাকে, 'বউ ওঠ্, মাদুলি দে।' কুকুরটা মরে গেছে জেনে সে ছেলেকে বলে ওটাকে বস্তায় ভরে দূরের মাঠে ফেলে আসতে। সুরেশ গোঁজ হয়ে থাকে এত রাতে দূরের মাঠে যাবে না বলে। সুরেশের বউ বলে মরা কুকুর নিয়ে কেউ উঠোনে শোবে না। সুরেশের বড়মেয়ে নমিতা— বিয়ের কনেই এখন বলতে গেলে — আষাঢ়েই শ্বশুরঘর যাবে বলে সাজগোজেই থাকে অষ্টপ্রহর, বলে, 'অ্যাদ্দিন কুকুরটাকে পালপোষ কর‍্যা বড় কইরলেক তিনু, অমনি মরণ হল উটোর, বাবার খারাপ লাগে ঠাগমা, ডাঁড়াও এট্টা আলো আনি।' বলতে কেমন হু হু হাওয়া আসে গোল হয়ে — উঠোনে পড়ে থাকা খুচরো ঝরাপাতাগুলো ছোট ছোট পাক খেয়ে কুকুরটার মৃত শরীরটার ওপর পড়ে, দেখতে দেখতে হাওয়া আরও আসে, আরও, গাছ থেকে পাতা ঝরে আরও, অবিরল, বুঝিবা মড়ক লেগেছে, মানুষের জীবন যেমন, প্রতিদিন জীবন যেমন, খসে যায়, মাটিতে পড়ে, খসে যায়। ঝরাপাতাগুলি গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে আবার ওঠে একের পর এক প্রাণহীন দেহটাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে যেন হাতে হাত ধরে কোনও আদিম রীতকরণের প্রক্রিয়ায় গা ছমছম একটানা কিছু দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণের স্বরে। আলো আনা হয় না নমিতার, উলটে বারান্দায় আধ-খাওয়া খাবারের সামনে রাখা লণ্ঠনটাই বারতিনেক দপ দপ করে নিবে যায়। পাতলা চাদরের মতো মেঘের তলা ফেঁড়ে কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ উঠলে তারা ঘরে যায়।

সকাল ভালো করে ফোটার আগেই তেরো বছরের জোড়া ছেলে কানু-পানুকে নিয়ে সুরেশ কুনুই ঝরাপাতার স্তূপ সরিয়ে বাঘা কুকুরের শক্ত হতে থাকা শরীরটা একটা বস্তায় পোরে, খুবই জ্যালজেলে বস্তা, আলুর বস্তা যেমন হয়, তবু কয়েকটা টাকা নষ্ট ভেবে ওর মনটা খচখচ করে, কুকুরটার থ্যাঁতলানো মাথায় জমে থাকা কালচে রক্ত দেখেও করে। ফেরবার সময় সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম না-হওয়া রাতের কথা বেমালুম ভুলে যায় ও। বেশ হালকা লাগে নিজেকে। শুধু কানু-পানু জোড়া ছেলে ফিসফাস করে — 'আহা, তিনুটারই কষ্ট। এইটুকুনি বাচ্চা আন্যেছিল না।'

রবিবার কুকুরে কামড়ায় তো বুধবার তিনুর কেমন জানি লাগে। এ ক'দিন সে খালি কেঁদেছে, ওস্তাদকেও চরাতে নিয়ে যায়নি। কানু-পানুর যদিও ইসকুলের ছয় কেলাসের খাতায় নাম লেখানো আছে, তবু তারা ওখানে আর যায় না। কখনও 'গ' কখনও 'ঘ' কখনও 'ঙ' পেয়ে তারা পাঁচ ক্লাস পাস করে হাই ইসকুলে ভর্তি হয়। বাংলা ক্লাসে কয়েকদিন গিয়েও তারা 'পদচিহ্ন গ্রামে মন্বন্তরের পদচিহ্ন' বাক্যটিতে হোঁচট খায়, মানে বোঝে না; অঙ্কের ক্লাসে মিলি-সেন্টি-ডেকা-হেক্টো-কিলোর ভেতরে ক্রমাগত ঘুরপাক খায় আর এ বি সি ডি লিখতে তাদের খাতা ছিঁড়ে যায়। সুরেশ বউকে বলে, 'লিখাপড়া উয়াদের হব্যাক নাই। তিনুটার হবেক। মানুটার বুদ্ধি ঢের, কিন্তু বিটিছিল্যার কী হব্যেক পড়ালিখ্যা কর্যা?' ফলে কানু-পানু বাপের সঙ্গে ট্রাক থেকে আলুর বোরা নামাতে যায়, নয় তো ভ্যানে মাল ওঠাতে বাপকে সাহায্য করে। তো মানুই চরিয়ে আনে ওস্তাদকে —সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র...।

শুক্রবার বেলা গড়িয়ে যায়, তিনু ওঠে না। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা, গলাতেও ব্যথা — ঢোক গিলতে কষ্ট। ঠাকুমা আদা-রসুন-কালোজিরে দিয়ে সর্ষের তেল ফুটিয়ে তিনুর গলায় বুকে-পিঠে মালিশ করে দেয়, গজগজ করে নিজের মনে, 'দুপর রোদে অমন মাঠে মাঠে ঘুইরখ্যে মানা করি নাই? নাকি? ভালো কতা সাতবাসী না হল্যা মিঠা লাগে না।' তিনু উত্তর দেয় না। তার গলার কষ্টটা যে অন্যরকম তা সে বলতে পারে না। দুপুরে তাকে ভাত দেওয়া হয় না — ডাল আর আলুসেদ্ধ দিয়ে মুড়িসানা দেওয়া হয়। তিনুরা সবাই মুড়ি খেতে ভালোবাসে। ভাতের সঙ্গে মুড়ি মিশিয়ে খাওয়া তো হয়ই, ভাতের বদলেও মুড়ি তারা খুশি মনে খায়। শুধু তারা নয়, ওদের মতো গাঁয়ের অনেক লোকই খায়। কিন্তু ছোট তিনু আজ আর মুড়ি খেতে পারে না। জল দিয়েও পারে না বরং জল দেখে তার কেমন গা শিউরে ওঠে। মুড়ির দলা মুখের ভেতর আটকে যায়, সে থু থু করে ফেলে দেয়। মা গায়ে মাথায় হাত বোলালে তার প্রচণ্ড রাগ হয়। তীব্র কষ্ট হয়। তার গলায় কেমন কষ্ট আর মাথায় কেমন ছায়া ছায়া ছবি। কেউ সে কষ্ট বোঝে না। কেউ সে ছবি দেখে না। মা গায়ে হাত দিয়ে দেখে ধুম জ্বর। নিঃশ্বাস যেন আগুন। তিনুর সর্বশরীরে ধিতাং ধিতাং মাদল বাজে, লাল পাড়ে ঘুঙুর বাঁধা ছাগলছানা ওস্তাদ নাচে, বাঘা তাকে মিছিমিছি ভয় দেখায়। সবে চোখ ফোটা শাদা চামড়ার খয়েরি ফুটি কুকুরের বাচ্চাটাকে তিনু রোজ নিয়ে আসত আর

সন্ধেরাতে দিয়ে আসত ওর মায়ের কাছে। বাঘা বাদে আরও তিনটে ছানা ছিল কুকুরটার। মাসখানেক এমনি যাওয়া-আসায় ছানাটা বেশ পোষ মানে, কুতুর কুতুর দৌড়য় তিনুর পেছন পেছন, লেড়ো বিস্কুটের টুকরো দিলে ছোট ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খায়। যেদিন ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাত্তিরে ছানাটিকে বাড়ি রাখল; সন্ধেবেলা ডালে ভেজানো রুটি খেয়ে ঘন্টাতিনেক ঘুমুল। সুরেশ এসে হাত পা মুখ ধুয়ে খানিক জিরোল, চা মুড়ি খেল, বিড়ি খেল একটা। কী একটা কাজে হারাণ কুম্ভকারের বাড়ি গেল, এসে খেয়েদেয়ে নিজের বিছানায় ঘুমোতে চলে গেলে, তিনু এতক্ষণ যেন দমবন্ধ করে ছিল, ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে যেই চোখ বুজেছে অমনি ঝুড়ির তলায় কী যেন নড়েচড়ে আর শব্দ হয় কুঁই কুঁই। সুরেশের ঘুম গাঢ় তাই ভাঙে না, কিন্তু আধঘন্টার মধ্যে ছানাটার পরিত্রাহি চিৎকারে ঝুড়ি উলটিয়ে শব্দের উৎস আবিষ্কার করে ছেলেকে কান ধরে তুলে আনে বিছানা থেকে। তিনু কুকুরছানা নিয়ে সারারাত বারান্দায় বসে ঢোলে। সেই ছানা বড় হল তিনুর পায়ে পায়ে। ওস্তাদকেও যে কোনওদিন আঁচড়টি কাটেনি সে কেন কামড়াল তিনুকে?

মাটির মেঝে, গোবর মাটি নিকোনো কেমন ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা। আলকাতরা মাখানো কালো কাঠের গরাদের জানলা দুটো বন্ধ বলে এই দুপুরেও আবছায়া ঘনিয়ে থাকে তিনুর ঘন ছায়ার মতো ছোট্ট শরীরের চারপাশে। সেই আবছা ছায়ার মধ্যে কুকুরটা আসে — থ্যাঁতলানো ঘিলু গড়ানো মাথা নিচু করে, হা হা জিভ বার করে। তিনুর মাথার কাছে থাবা গেড়ে বসে অবিকল যেমনটি বসত। তিনুর নাকে কুকুরটার লালার দুর্গন্ধ লাগে বুকের ওপর টপটপ লালা পড়ে তো তিনু দু-হাত বাড়িয়ে দেয় কুকুরটাকে ধরবে বলে তো কুকুর সরে যায়, গোঙানো স্বরে বলে, 'তিনু তিনু আমাকে আনলি কেন? মারবি বলে?'

'নারে বাঘা, না।'

'তিনু, তিনু, পাতের ভাত, ভাগের রুটি দিতিস কেন? মারবি বলে?'

'নারে বাঘা, না।'

'তিনু, তিনু, মায়ের থেকে আনলি কেন?'

'নইলে গাড়ি চাপা পইড়তিস, আর দুট্যার পারা।'

'তাহলে মারলি কেন?'

'আমারে কামড়ালি কেনে? তাথেই তো বাবু ... ।' তিনু ফোঁপায়।

'গলায় কষ্ট নারে তিনু? খিদেয় পেট জ্বলে তবু খেতে না পারার কষ্ট? খেতে মন চায় না তিনু?'

'মন চায়রে বাঘা, খিদায় সব্ব অঙ্গ জ্বলে যায়...।'

থ্যাঁতলানো মাথা নড়ে — 'পারবি না, তিনু পারবি না, খিদে নিয়ে, তেষ্টা নিয়ে তুইও মরবি তিনু।'

আঁ আঁ করে গোঙায় তিনু, রক্তবর্ণ চোখে কাকে যেন দেখে, দু-হাত তুলে কাকে যেন তাড়ায়, ভাঙা গলায়, গুঙিয়ে ওঠে, 'যাহ্, ভাগ।'

কুকুরটা একটু দূরে বসে থাকে, তেমনি ঝিলু থ্যাঁতলানো মাথা নিয়ে — 'বড় কষ্ট তিনু ভেতরের কষ্ট, খাইয়ে বড় করে এমনভাবে মারলি? তার চেয়ে মরে যেতাম রাস্তায়, গাড়ি চাপা পড়ে — কেন আনলি তিনু যদি কষ্ট না বুঝিস?'

তিনু আবার গোঙায় — কথা বলতে চায়, বাধা বলে ডেকে উঠতে চায় তো কথা ফোটে না, আঁ আঁ জড়ানো আর্তিতে কেবল লালা পড়ে।

তিনুর মা শব্দ শুনে ছুটে আসে, ঘরময় অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ানো ছেলেকে জড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। নমিতা, আম্না আর মানু দৌড়ে আসে মা-র চিৎকারে। মানু দাদার কপালে হাত দিয়ে বলে, 'খুম জ্বর গঁ মা, বাবুকে বইলব ডাকতর ডাইকথে?'

'ধুর ছুঁড়ি, ইটো ডাকতরের কমমো লয়। দুপুরবেলিতে একা পেয়্যে ডাইনে খাচ্যে উয়াকে।' কে বলে এমন কথা? ঠাকুমা? বটের মতো শিকড় চারিয়ে ডালপালা ছড়িয়ে, ঝুরির পরে ঝুরি নামিয়ে আদ্যিকালের প্রাচীন এই বৃদ্ধা? কিন্তু 'ডাইনে খাচ্যে' বাক্যটি অন্যের শ্রুতিগোচর হবার আগেই ভিড়-জমা উঠোনের মধ্যিখানে কেউ বলে ওঠে — 'ওগো আঁধারে ঠাকুর। মানতের ছাগল লিয়ে মাঠে ছিল না দুপুরবেলিতে? হঁ গো, মায়ের থানে পূজা দাও। আর বিলম্ব কোরো না। বহুৎ দিনের মানসিক তুমার। কালই দাও। বারের দিন— তায় অমাবস্যা কাল।'

তিনু লাফিয়ে ওঠে, 'বড় খিদাগঁ মা, পেটটো জ্বলে যায়। মাংস খাব। ওস্তাদের মাংস। আন আন পাঁটাটো আন, উয়ার কানে রক্ত। উটো খাব।'

'আহা মায়ের কী লীলে গঁ। জয় মা। অ তিনুর মা, উয়ার ভর হইনছে। দাও গঁ, মানসিকের পাঁঠাটো দিয়্যা মায়ের পূজা দাও।'

মানু বলতে চায়— 'তিনু ঘোরের মধ্যি বইলচ্যে, উয়ার জ্ঞান নাই গঁ মা। উস্তাদকে কাট্যো না। তিনু মর‍্যা যাবেক তালে।' তো সেই অক্ষরগুলি, ভালোবাসা বানানোর অক্ষরগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় সমবেত জয়ধ্বনিতে। মানু সেইগুলি জড়ো করতে চায় তো সবার পায়ে পায়ে সেগুলি থেঁতলে যায়। অক্ষরগুলি তাদের প্রকৃত ছাঁদ হারায়, শ্রীহীন ছেঁড়াপাতার মতো উড়ে যায় মানুর নাগালের বাইরে। মানু এর কাছে যায়, 'দুর ছুঁড়ি, রাত পোয়ালেই পুজো, কী বকিস পাগলের পারা?' মানু তার কাছে যায়, 'তিনুর জ্বর গঁ, ডাকতর আনা করাও, অসুদ দাও। তিনু মর‍্যা যাবেক।' বালিকার কথা সাবানের ফেনার বুদবুদের মতো আকাশে ওড়ে ফেটে যায় পরমুহূর্তেই, তিনুর মা ছেলেকে জড়িয়ে বড়মেয়েকে বলে , 'নমি, আমি রইলুম তিনুর কাছকে, তুই উয়াদের দ্যাখ।' নমিতা আছাড়িপিছাড়ি খাওয়া মানুকে তোলে প্রথমেই, 'কাল পূজা দিলেই ভাই ভালো হয়্যা যাবেক — যা কাপড় ছেড়্যা ঠাগমাকে শোওয়াইন দে।'

গরিব মানুষজনের বসত এই ছোট গ্রামটিতে। বাড়িগুলো ছিরিছাঁদহীন, চলতে চলতে তৈরি হওয়া ধুলোকাঁকর ভরা কাঁচা রাস্তা। গ্রামে ঢোকার একমুখে কারখানা শ্রমিকদের এ টাইপ কোয়ার্টার্সের শেষ ক'টি, দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটে দেয়া আর ঘেরা বারান্দায় ঝোলানো

ভিজে আধভিজে জামাকাপড়। গ্রামে ঢোকবার অন্যমুখে বিহার থেকে আসা গোয়ালাদের ভঁইস আর জার্সি গাই-এর খাটাল। স্তূপীকৃত গোবরের ওপরে ভনভন করছে মাছি, রাস্তার ওপারে নিচু নালার ঘোলাটে জলে থিকথিক করছে মশার বাচ্চা। নালার জল এত ধীরে সরে যে মনে হয় স্থির। মোষগুলো কখনও নেমে পড়লে জল আর কাদায় পাঁক তৈরি হয়, মোষগুলো তাতেই যেন আরাম পায়। মালিক এসে হ্যাট হ্যাট না-করলে তারা ওঠে না। ডোমপাড়ার শুয়োর কয়েকটা এরই আশেপাশে থাকে নালার ধার ঘেঁষে জংলা কচুর বনে তাদের নিত্য আনাগোনা। এ গাঁয়ে মুসলমান মোটে কয়েকঘর -- তারা দিনমজুরি করে। তাদের মোরগাগুলোই পূবদিক ফরসা হয়েছে কি হয়নি ফজরের নামাজের কথা বলে তাদের মালিকদের, কারখানার ভোঁ বাজার আগেই অন্য মানুষজনেরা উঠে মগ গামছা নিয়ে মাঠে যায়। তিনুর ঠাকুমা ডাকে, 'ও বউ, ওঠ, মাদুলি দে, আজ যে পূজা।'

ছোট্ট ছাগলছানা ওস্তাদকে আজ শেষবারের মতো চরিয়ে এনেছে মানু। গলায় দড়ি দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে গেছে ভালো ভালো দুব্বো ঘাসের জায়গায়, কচি কচি কাঁঠাল পাতা সামনে দিয়েছে কিন্তু ওস্তাদ খায়নি। হাঁ করিয়ে খাওয়াতে যেতে ওস্তাদের লালা এসে লাগে মানুর হাতের উলটোপিঠে মশার কামড়ে ফোলা লাল জায়গাটায়, চুলকে সেখানে ঘা করে দিয়েছে মানু নিজেই। মা বারণ করেছিল তবু মানু ছাগলটাকে মাঠে নিয়ে যায়। অবিশ্যি নিজের ছায়া নিজের পায়ের কাছে গুটিয়ে যাবার আগেই সে ওটাকে কোলে করে বাড়ি ফিরে আসে। আসবার সময় ছানাটার গায়ে হাত দিয়ে চেপে ধরে, চুমো খায় চোখের জলে আর লালাসিক্ত ঠোঁট দিয়ে, ছাগলটা অভ্যস্ত সুরে ডেকে ওঠে না, কেমন গুঙিয়ে ওঠে এক না-বোঝা স্বরে। মাঠের ওপর ওদের ছায়া ওদের পাশে পাশে চলে। ছায়াবালিকার কোলে ছাগশিশু কখনও গলাটা লম্বা করে দিলে সরু লম্বা গলাটাকে বোতলের মতো লাগে, জলশূন্য একটা ছায়াবোতলের ওপর ছিপির মতো আটকানো ছোট্ট মাথাটা — 'তোকে বলি দিবেক তবে তিনু ভালো হ্যাবে! মিছা কথা ওস্তাদ, তর বলিতে তিনুর ভালো হবেক নাই। এ গাঁয়ের বুঢ়া বুঢ়ি সবারই খাওয়ার লালচ, তিনুরও লালচ হইনচ্যে তর মাস খাবার লেগে, তো উয়ার মাথার ঠিক নাই, জ্বরে জ্বরে উ পাগল হয়্যা গিইচ্যে।' মানু আবার বকে যায়,— 'হঁরে উস্তাদ আজ উপোস দিলি ক্যানে? জন্মের খাওয়াটো খেঁইয়্য লিথিস। রাগ হঁইনচ্যে? পলাই যাবি? যদি মা কালীর কোধ হয়? হা ভগমান!'

'অরে হারামজাদি, পাঁঠাটো লিয়ে কুথাকে যেছিস? চল, উয়াকে সিনান করাতে হব্যেক।' মানু দ্যাখে সুরেশ কুনুই: ছাগলছানাটাকে একরকম ছিনিয়ে নেয় মেয়ের কোল থেকে। মানু বাপের পিছন পিছন চলে 'ঘরকে চল' হুঙ্কার শুনে।

ঢাকে কাঠি পড়ে সাঁঝের বেলা। কাঁসর বাজে ঢং ঢং, চামর দোলে, শাঁখে ফুঁ পড়ে, নতুন করে গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে মায়ের থান তৈরি হয়। টলোমলো পা তিনুকে ধরে বসানো হয় পশমের আসন পেতে তিন-চারটে বালিশ দিয়ে। গলায় জবার মালা, ধুনুচি

থেকে কুয়াশার মতো ধোঁয়া উঠে তিনুর মূর্তি আবছা করে দেয়, যেন ও সুরেশ কুনুই-এর আটবছরের রাজেশ কুনুই ওরফে তিনু নয়, এক ভিনগ্রহের অধিবাসী।

প্রসাদ রান্না হতে হতে রাত শেষ হয়ে আসে। তিনুর সামনে প্রসাদী মাংস আর লুচি দিলে সে ব্যগ্র দুই হাতে খেতে যায়, পরক্ষণেই, 'খা শালারা তোরাই খা' বলে উচ্ছিষ্ট মাংস থালার ওপর ফেলে দু-হাত দিয়ে তোলে। তিনুর মা ছেলের পাশেই বসে, এবারে থালা নিয়ে উঠে প্রসাদ বিতরণ করে। তিনু টলোমলো পায়ে উর্ধ্ববাহু স্খলিত নাচে, মুখে বলে, 'বাবা সকল মায়ের পেসাদ খাও-' সারি সারি প্রসারিত হাত জয়ধ্বনি দিতে দিতে কাড়াকাড়ি করে জ্যান্ত ঠাকুরের প্রসাদ খায়।

হঠাৎ তিনু বিকট চিৎকার করে ওঠে — 'সব মরবি, গোটা গাঁটো শেষ হয়্যা যাবেক।' বলতে বলতে সে আঁ আঁ করে মূর্ছা যায় আর হাওয়া ওঠে উথালপাথাল। কোথায় জড়ো হয়েছিল চৈত্রের এত বাতাস? ঈশান কোণে? সারি সারি মেঘ ধুলোবালি খড়কুটো-পাতা উড়িয়ে এক অশুভ ইঙ্গিতের মতো হা হা ছুটে আসে, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে, বিদ্যুতের আলোয় পুজোর সমস্ত আয়োজন কেমন লণ্ডভণ্ড দেখা যায়। মেয়ে বউদের কাপড় উড়ে যায় শ্বশুর ভাশুরের সামনে, ছোট ছেলেমেয়েরা মায়েদের জড়িয়ে ধরে। ভোরের আলো যেন ভয়ে পিছিয়ে যায়। পাখপাখালি ডেকে ওঠার আগেই বাসাসমেত নিচে পড়ে যায়। অন্ধকার ঘন নেমে আসে। এরই মধ্যে জোড়া ছেলে কানু-পানুকে নিয়ে সুরেশ কুনুই তিনুকে খোঁজে। বউকে খোঁজে।

ছেলেকে কোলে নিতে তিনুর মা সাবিত্রীর এমনিতে অত কষ্ট হচ্ছিল না। ছেলে তার এমনিতেই হালকা পলকা, তায় এ-কদিন ভুগে, না-খেয়ে আরও হালকা হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছিল আট বছরের নয়, সদ্য জন্মানো তিনুকে নিয়ে সে হাঁটছে। কিন্তু তিনু সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের কোলে চুপ করে ছিল না। দুমড়ে মুচড়ে মায়ের বাহু খামচে, আঁচড়ে কামড়ে সে কেবলই কোল থেকে পড়ে যেতে চাইছিল। এক সময় পড়েও যায় মায়ের হাতে এক মরণকামড় বসিয়ে — সাবিত্রী আর্তনাদ করে ছেলেকে প্রায় ফেলেই দেয় মাটিতে আর তিনু গড়িয়ে যায় রাস্তার ধারে। সাবিত্রী উম্মাদিনীবৎ নিশ্চিন্দার ঝোপের পাশে পড়ে থাকা তিনুকে ধরতে যায় তো তিনু গররর গর্জে ওঠে, সুরেশ এসময় এসে পৌঁছয় লোকজন সমেত — 'তিনু বাপ আমার আয়' বলে ছেলেকে দু-হাতে পাঁজাকোলা করে ওঠালে তিনু বাবার মমতামাখা হাতখানিতে এক কামড় বসিয়ে দেয়। আর্তনাদ করে সুরেশ হাত আলগা করলে তিনু চার হাত পায়ে জন্তুর মতো ঢালুতে নেমে গড়িয়ে যায় ফুটিফাটা মাঠের ওপর খোঁচা খোঁচা জেগে থাকা কাটাধানের গোড়ার ওপর। সবাই হুড়মুড় করে নেমে যায় সুরেশ আর ওর বউয়ের পেছন পেছন। 'তিনু, অ তিনু? বেটা ইদিক পানে ভাল্ বেটা, ওগো টুকুন জল দাও গঁ তিনুকে—' সাবিত্রী ধরতে যায় ছেলেকে তো ছেলে উপুড় হয়ে আলের ধারে ঘাস আর বুনো ঝোপের পাতা দাঁতে ছেঁড়ে, হাঁটু আর দু-হাতে ভর রেখে সদ্যপ্রসূত বাছুরের মতো থরথরায় আর আহত, ক্রুদ্ধ জন্তুর মরণ আর্তনাদের মতো অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ করে।

নিতাই, সুনীল আর সুরেশ ওকে ধরে রাখতে পারে না শুধু ওর আঁচড় কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়। আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসে তিনু, চোখদুটি ভয়ার্ত, রক্তবর্ণ ও বিস্ফারিত; শুকনো ঠোঁটদুটিতে আর কষে ঘন চটচটে লালা শুকিয়ে শাদা হয়ে ওঠে, সাবিত্রী ছেলের নিষ্প্রাণ ঠোঁটে গালে কপালে পাগলের মতো হাত বুলায়, চুমু খায় — 'একবারটি ভাল্ বেটা, তিনু উ উ....?' কানু-পানু জোড়া ছেলে দ্যাখে, জলের ঘটি নিয়ে মানু দৌড়ে আসছে।

দুই

পেছন ফিরে মশলা বাটছিল সাবিত্রী। নমিতা চিরুনি ফিতে নিয়ে মায়ের পাশে বসে একটু আদুরে গলায় বলে, 'আজ খোঁপা কয়্যা দাও।' সাবিত্রী উত্তর দেয় না ঘসর ঘসর জিরা গোলকি বাটে। নমিতার রাগ হয় তার চুল খুব — যেমন গোছ, তেমনি লম্বা — একবেণী করে গলা বেড় দিলেও কোমর ছাপায়। 'অতটি চুল আপুনি বাঁইধতে লারি। মা? ওমা?' মায়ের গায়ে হাত দিতেই সাবিত্রী উপুড় হয়ে শিলের ওপর পড়ে যায়। কোনও রকমে মাকে চিত করে দিলে রক্তবর্ণ চোখে সাবিত্রী তাকায়, কষ বেয়ে লালা পড়ে আর হাত দিয়ে গলার ব্যথা জানায়। নমিতা দৌড়ে পাশের বাড়ি, 'কাকিমা গঁ, মায়ের জ্ঞান নাই, তুমরা বাবুকে খবর কর।' নিতাই-এর বউ চেঁচিয়ে উত্তর দেয়, তার স্বর ভাঙা ভাঙা, 'নমিরে, তর কাকারও জ্বর, জল পজ্জন্ত খাত্যে লারেরে মা, ঘরে কেউ নাই।'

তো নমিতা ছোটে ওবাড়ি, 'পরেশ জেঠু গঁ, — বাবু ঘরকে নাই, মানু ইসকুলে, কানুপানু কাজে, মায়ের বড় অসুক গঁ — একবারটি আসো।' পরেশ কুনুই বেরিয়ে আসে শুধু এইটুকু বলতে —'মারে বাড়ি শুদধু জ্বর, বমি আর ভুল বইকচ্যে — আমারো গলা ফুইলচে, ডাকতরবাবুকে কল দিথ্যে হবেক।' নমিতা মায়ের কাছে ফিরে আসে। পাথর চাপা স্বরে বলে, 'মা।'

মাহিন্দর-এর একটা জার্সি গাই আর তিনটে ভঁইষ খেপে যায় তিনু মারা যাবার ক'দিন বাদে। তার আগের দিন থেকে চারটে প্রাণীই কেমন ঝিম মেরে থাকে, কিছু খায় না। মাহিন্দর তবু দুধ দোয়ায়, সাইকেলে ক্যান ভর্তি দুধ নিয়ে কারখানা সংলগ্ন কোয়ার্টারসগুলোয় দিয়েও আসে। পরের দিন সকালবেলাও কোনওরকমে দুধ দোয়ায় ও দেয়। দুপুর থেকেই জন্তুগুলোর আচরণ বদলে যায়। তারা হাঁ করে লালা ফেলে — সে লালা এত ঘন আর আঠালো যে, সেগুলো মোটা সুতোর মতো ওদের মুখ থেকে লম্বা হয়ে ঝুলে থাকে। মাহিন্দরের বউ চুনিভূবিমাৎগুড়ের জাবনা মেখে দিলে চারজনেই গুঁতিয়ে ডাবা উলটিয়ে ভেঙে দেয় আর অত বড়সড় বাঁকা শিং থাকা সত্ত্বেও ওকে কামড়ে দেয় দু-পাটি দাঁত না থাকলেও। ফুলমতিয়া তবু ওঠে, তার মরদ আর অন্য গোয়ালাদের ডাকে, 'পাকড়ো পাকড়ো, হমরা গাই অউর ভঁইষ ভাগলবা রে, হায় রামজি কা করতানি তু হমরা সাথ?' হই হই শব্দে গোয়ালারা মেয়েমরদ ছুটে যায় মাঠের দিকে।

সুরেশ কুনুই কানু-পানুকে নিয়ে ফিরছিল, আজ তার কাজ হয়নি। এ গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকই ভ্যান চালায়। কারোর নিজের ভ্যান, কেউ-বা অন্যের ভ্যান হপ্তা হিসেবে চালায়। সুরেশের ভ্যানটা নিজের বলে ভাড়া না-পেলেও মালিককে পকেট থেকে টাকা দিতে হয় না, তবু মনটা খিঁচড়ে থাকে, কানু-পানু চুপ করে ভ্যানের ওপর বসে থাকে। সুরেশ ফিরে আসতে আসতে ছেলেদের বলে, 'মানু আর আন্নাকে ডেক্যে লিয়ে আয়।'

দুই ছেলেরই খিদেয় পেট মোচড়াচ্ছিল, সেই কোন সকালে মাড় ভাতে আলুসেনে খেয়ে বেরিয়েছে, এখন এই অবেলায় ঘরে গিয়েই বা কী খাবে? বাপকে তারা ভয় পায় — ফলে দু-জনেই একসঙ্গে নেমে উলটো দিকে হাঁটে। বোঝা কমে গেলে সুরেশ দ্রুত প্যাডেল করে। তারও খিদে পেয়েছে, বাড়ির সামনে প্রায় এসে গেছে তখুনি ঘটনাটি, অপ্রত্যাশিতই বলা যায়, ঘটে। একটা জার্সি গাই আর তিনটে মোষ দিশাহারার মতো ছুটে তার ভ্যানের ওপর এসে পড়ে। ভ্যান আর মোষ তিনটে গড়িয়ে পাশের ঢালু জমিতে চলে যায়, সুরেশ ছিটকে পড়ে গরুটার শিং-এ গেঁথে যায় সে অবস্থায় গরুটা মাথা ঝাঁকি দিয়ে ওকে ফেলে দিলে সুরেশের পেট থেকে জড়ানো অন্ত্রের খানিকটা ফেটে বেরিয়ে আসে রক্ত ও বিষ্ঠা সমেত। গোয়ালারা গরু-মোষ ছেড়ে ওকে ধরে তোলে।

গোটা গ্রামই যেন ওদের বাড়ির সামনে জড়ো হয়। তারই মধ্যে গোটা গ্রামটা দুটো শিবিরে, যুযুধান দুই শিবিরে আলাদা হয়ে যায়। যারা ঘরের ভেতর ধুঁকছিল আর লালা ফেলছিল, কখনও যন্ত্রণায় খামচে ধরছিল বিছানা, মেঝে, দেয়াল অথবা পরস্পরকে, মানুষের ভাবা যখন সমস্ত সঞ্চিত ও নিহিত অর্থ হারিয়ে ফিরে যাচ্ছিল আদিম ভাষাহীনতার অমানুবিক আর্তস্বরে, তখন বাকি যারা খাড়া দাঁড়িয়ে তখনও মাটির ওপর, সমস্ত মানুষী ভাষাকে একটিমাত্র অর্থের সীমানায় বেঁধে রাখার জন্য শারীরিক ভাষার আদিমতায় ফিরে যাচ্ছিল।

'শালো বিহারি ভূত, মানুষটাকে গাই দিয়্যা মারা কর্য্যালি?'

'হামরা কোই কসুর নেহি আছে, সুরেশোবাকা যো কুত্তা মর গিয়া ও হামারা গাই অউর ভঁইসকো কাট দিয়া না?'

'হাঁ ভাইয়া দেখো কিতনা জখম কর দিয়া থা।'

আরও নানা শব্দ ছোটে এদিক থেকে ওদিক তার মধ্যে কয়েকটি ভ্যান ফিরে আসে ও তারা সুরেশকে তোলে, অন্য ভ্যানগুলিতে যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষগুলিকে তোলা হয়, তাদের ধরে থাকে তাদের চেনাজানা আত্মীয় বা পড়শি।

এমন একটি অভিনব মিছিল এই শহরে কেউ দেখেনি। রাস্তার দু-ধারে দীর্ঘ সারি মানুষজনের, বাড়ির দরজায়, জানলায়, রেলিং ধরে ঝুঁকে শহরের মানুষরা দ্যাখে এই গ্রামীণ মিছিল—কাতরানি, গোঙানি আর আর্তনাদে যেন গ্রাম থেকে নয় মানুষের জীবন থেকেই উৎপাটিত হয়ে এরা বিলাপ করতে করতে মৃত্যুর দিকে চলেছে। দু-চারজন অতি কৌতূহলী নাগরিক এগিয়ে আসে। কিন্তু দূরের মিছিলের দৃশ্যময়তার অবাস্তব কুয়াশা কেটে গেলে তারা দৌড়ে উলটোদিকে ছোটে, তাতে এই মরণযাত্রার ভয়াবহতা প্রকট হয়ে উঠলে

বহুদূর পর্যন্ত ঘরবাড়ির দরজা জানলা নিশ্ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে মানুষ থাকে না। দোকানবাজারও বন্ধ হয়ে যায়।

অবশেষে তারা পৌঁছয় স্থানীয় ছোট হাসপাতালে। হাসপাতালের গেটে তালা—ওপাশ থেকে ওয়ার্ডবয় জাতীয় কেউ একজন বলে—'ডাকতর বাবুরা কেউ নাই।'

'সিসটার? নার্স আছে তো?' ভ্যানঅলাদের কেউ একজন আকুলতায় এমন আর্দ্রতা থাকে যে সে নিজেই কেঁদে ফেলে—'গেটটো খুলো গো—মোদের আপনজন হঁসপিটালের দুয়োরে মইরবেক?'

'এ হসপিটালে ই রোগের দাওয়াই নাই। আমরা পাইরব না। তুমাদিগকে কইলকাতা যাতে হবেক। ইখেনে ইয়ার টিটমেন নাই।'

'হায় হায়, কী হব্যাক তবে? খুলো গো গেটটো খুলো, ডাকতরবাবুকে ডাকো, উনি ঋদি বলেন, তবে তো যেথেই হবেক।'

এর পরে ওয়ার্ডবয়টি হাত নেড়ে ইশারায় ওদের ফিরে যেতে বলে ভেতরে ঢুকে যায়। আবার এরই মধ্যে হেঁচকি তুলে সুরেশ মরে যায় খুব তাড়াতাড়ি। মরবার আগে সে বলেছিল 'জল, একটুকুন জল।' তো জল তাকে দেয়া হয়েছিল লোকের মুখে মুখে 'হসপিটাল' বনে যাওয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনের 'হ্যাঁচকা কল' বা ডিপ টিউবওয়েল থেকে। তবু সুরেশই তো পরবর্তী দিনগুলির মধ্যে একমাত্র মৃত ব্যক্তি যে মরণকালে তৃষ্ণার জলে গলা বুক ও শূন্য জঠর ভিজিয়ে নিতে পেরেছিল রক্তে বিষ্ঠায় মাখামাখি হয়ে।

ভ্যানগুলি গ্রামে ফিরে আসে। সুরেশকে তার অল্প, বিঘাখানেক ধানজমির একপাশে নালার ধারেই পোড়াতে হয় কেননা এ গাঁয়ের লাগোয়া কোনও শ্মশান নেই, আর শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যাবার উপায় ওদের থাকে না, শহর কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করলে। নিষেধাজ্ঞাটি এইরকম : কোনও অবস্থাতেই এ গ্রামের কেউ গ্রামের পাশ দিয়ে দুই কারখানা শহরের সংযোগকারী রাস্তার ওপরে উঠতে পারবে না বা গ্রামের সীমানার বাইরে যেতে পারবে না।

এখন মুশকিল হল বেশির ভাগ গ্রামেরই তেমন করে পাঁচিল ঘেরা সীমানা থাকে না। বসতি শেষ হলে মাঠ থাকে, নয় ধানখেত থাকে বিস্তৃত, নয় তো অরণ্য থাকে দুই গ্রামের মধ্যবর্তী জায়গাটুকু, নদীও থাকতে পারে কখনও কখনও, কিন্তু সেই দূরত্ব কিংবা বিভাজন ক্ষেত্র তো তেমন মাপজোক করে চিহ্নিত কোনও লক্ষণরেখা নয় যে,গাঁয়ের মানুষজন সেই নিষেধাজ্ঞার নির্দিষ্টতা বুঝে নিতে পারে, তাই দুই শহরের কর্তৃপক্ষ গোটা গ্রামটিকে 'বিপজ্জনক' আখ্যা দিয়ে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেয়। বৃষ্টিপাত সদৃশ বুলেট বর্ষণের ক্ষমতা রাখে এমন আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে দিবারাত্র টহল দেয় শান্তিরক্ষী বাহিনী। তাদের গুলিতে মারা পড়ে যুদ্ধরত দুইপক্ষ ছাড়াও হঠাৎ গজিয়ে ওঠা তৃতীয় পক্ষের এক অতি সাহসী সদস্য।

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই তৃতীয় দলটির মাত্র কয়েকজনই জোট বাঁধে খিদের মতো অতি তুচ্ছ এক জৈবিক তাড়নায়। গ্রামটি 'বিপজ্জনক' হয়ে ওঠায় তারাও বেরোতে পারে না। অথচ

শারীরিক মূলধন খাটানো ছাড়া তাদের অন্য কোনও জীবিকা নেই। এমনকি রমজানের মাসেও শরীর নিংড়ে শ্রম বেচে তাদের ইফতারের আয়োজন করতে হয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তাদের অনেকখানিই ফিকে হয়ে এসেছে। তবু কিছু কিছু অবশেষ অভ্যাসের অন্তর্গত হয়ে যায়, ফলে তাদের বসতিটা গ্রামের একটা ছোট এলাকা জুড়ে — আলাদা। দারিদ্র্য মানুষকে অনেক সহনশীল করে তোলে, প্রত্যহের খিদে অপমান সম্পর্কে একেবারে সত্যিকারের নির্বিকারত্ব এনে দেয়, কিন্তু সন্তানের কষ্ট, নিতান্ত খিদের কষ্টে খেপে যাবার হক সব সম্প্রদায়েরই বাবা মা-র শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবেই থাকে তাই আস্ত গ্রামটাই যখন এমন এক কয়েদখানা হয়ে ওঠে যেখানে অনাবশ্যক ও অসময়ের মৃত্যু এক অনিবার্যতা, তাহলে সেটাই এক প্রত্যক্ষ উপলক্ষ হয়ে ওঠে — নিরাপত্তাহীনতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও কোণঠাসা নিরুপায়তার বিরুদ্ধে অসহায়ের শেষ অস্ত্র পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও হানাহানির।

এই নিষ্করুণ, বোধহীন অদ্ভুত যুদ্ধ চলতেই থাকে।

তিন

দুই শহরের কর্তৃপক্ষই অবিবেচক এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। এক-আধজন মানুষ খেপলে তার চিকিৎসা করানো যেতে পারে অন্তত মরণতক সে আয়ত্তে থাকে। বিচ্ছিন্ন একটি-দুটি মানুষ যত ভয়ংকরই হোক না কেন তাকে সভ্য সমাজের ভয় পাবার কিছু নেই। কলকারখানার উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, বাজার সব ঠিকঠাক চলে। মুশকিল হল যে, গোটা গ্রামটাই খেপেছে এবং এমন খেপেছে যে ওরা নিজেরা তো মরবেই এমনকি পাহারা তুলে নিলে এই দুই শহরও আক্রান্ত হবে। ইতিমধ্যে মাহিন্দর যাদবের গরু-মোষের দুধ যেসব পরিবার নিয়েছিল তাদেরও আলাদা, নিজেদের বাড়িতেই প্রায় অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। সদরে ডাক্তারদের একটা আলোচনা সভা হয়েছে তাতে সব ডাক্তারবাবুরা একমত হননি যে, সেসব পরিবারের সবাইকেই ভ্যাকসিন নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত ভ্যাকসিন নেয়াই সাব্যস্ত হয় — যারা দুধ বা ওই দুধের তৈরি খাবার খেয়েছে তারা তো বটেই যারা খায়নি তারাও এই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হয়। কারণ এতগুলো মানুষকে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করাও যাবে না — তাদের মধ্যে কার কার মুখ থেকে পেট পর্যন্ত বা অন্ত্রে কোথাও ক্ষত আছে কি না। কে কবে দুধ বা দুগ্ধজাত কিছু খেয়েছে কি না সেটাও এখন আর জানা সম্ভব নয়। শহরের হাসপাতালেও এত ভ্যাকসিন নেই, তাই কর্তৃপক্ষের খরচে বাইরে থেকে বুস্টার ডোজ এনে দেয়া হয় একশো সাঁইত্রিশ জনকে কারণ ওই দুধে সত্যনারায়ণের সিন্নিও নাকি মাখা হয়েছিল কবে। হিসেব করে দেখা গেল সেটা হয়েছিল গ্রামে কালীপুজোর পনেরো দিন আগে পূর্ণিমাতে — কিন্তু গ্রামে কীভাবে এই মড়কের মতো খ্যাপামি ও মৃত্যু শুরু হয় তা তো শহরের কেউ জানে না। এমনকি সেখানে কোনও সাংবাদিককেও পাঠানো সম্ভব নয়। অবিশ্যি তা সত্ত্বেও খবরের কাগজে খবর তৈরি হতে কোনও অসুবিধে হয় না, আর সেইসব তৈরি খবরের গন্ধ আতঙ্ক ছড়ায়। এইসব খবরের দু-একটির নমুনা এইরকম:

'জলাতঙ্কগ্রস্ত গ্রামটি থেকে কয়েকটি কুকুর বেড়া টপকে বাইরে এলে তৎক্ষণাৎ রক্ষীবাহিনীর হাতে তাদের মৃত্যু হয়।'

'দুটি রোগগ্রস্ত উন্মাদপ্রায় ব্যক্তি গ্রামের প্রান্তে তালগাছ ও পলাশগাছে উঠে শাদা কাপড় নাড়ায় — রক্ষীবাহিনীর গুলিতে তারা নিহত হয়। কেননা এভাবে তারা বাইরে বেরোবার চেষ্টা করছিল।'

প্রথম খবরটি নিছক বানানো, কেননা গাঁয়ে কুকুর নেই, বলতে গেলে কোনও পশুই নেই। হয় তারা এই মহামারীর কবলে পড়েছে অথবা খাদ্যে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়টি আংশিক সত্য খবর। বসিরুদ্দি তালগাছে নয়, কাঁঠালগাছে উঠেছিল কাঁঠাল পাবার আশায়, তার বাড়িতে গর্ভবতী বিবি কোনও গোস্তই খেতে চায় না বলে সে অনুপায়ে কোমরে কাটারি গুঁজে গাছে উঠেছিল। গুলি খেয়ে তৎক্ষণাৎ সে পড়ে যায় আর সেখানেই পড়ে থাকে সন্ধে অব্দি। পলাশ গাছে উঠেছিল কানু, নিশান উড়িয়েছিল সেই, গুলি লাগে তার নিশান ধরা হাতে, নিশান মানে তিনুর ইসকুলের শাদা শার্টটাই উড়ছিল বৈকালী হাওয়ায়। গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল নমিতা। আন্না ঠাকুমার কাছে। বুড়ি আজকাল হাঁটাচলা করতে পারে না, চোখেও দ্যাখে না। আন্নাই তাকে সঙ্গ দেয়। বাড়িতে ন-জনের মধ্যে বেঁচে আছে তারা চারজন। মানু আর সাবিত্রী মারা যায় তিনুর মতোই খিদে তেষ্টা নিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় পাগল হয়ে। পানু মরে বসিরুদ্দির ধারালো কাস্তের কোপে। যেমনভাবে ঘাসের গোছা বাঁ হাতে মুঠো করে ধরে ডান হাতে পোঁচ দেয় আর ঘাসগুলো গোড়া ঘেঁষে অমনি গোছাসমেত কাটা পড়ে বসিরুদ্দি তেমনি দক্ষতায় জীবনের প্রথমতম হত্যাটি সুসম্পন্ন করে — ফলে কালীঠাকুরের হাতে ধরা নরমুণ্ডের মতো পানুর কিশোর-মস্তক চুলের গোছা সমেত বসিরুদ্দির বাঁ হাতে ঝুলতে থাকে হত্যাকারীর অপার্থিব নারকীয় উল্লাস ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে। এ দৃশ্য আড়াল থেকে নমিতা দ্যাখে। কারণ সে তখন প্রতিশোধ-স্পৃহায় মরিয়া কানুকে ঠেকায়। আজ বসিরুদ্দির পতন ও মৃত্যু দেখেও তারা সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে মাত্র। আহত পানুকে নিয়ে বসিরুদ্দির মৃতদেহের পাশ দিয়ে সে চলে যায় বিকারহীন।

বসিরুদ্দির মড়াটা আবিষ্কার করে ওর বিবি ফিরদৌসি — গরিবের ঘরের বিবির এমন চমৎকার নাম দিয়েছিলেন ওর আব্বাজান ওর বিয়ের আগেই তো, তখন ফিরদৌসি বাপের নন্দনকাননেই বড় হচ্ছিল, বসিরুদ্দির সাথে তার বিয়ের গল্প একেবারে আলাদা কাহিনী, ফিরদৌসি খিদেয় কাতর, পেটে বাচ্চা নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে স্বামীকে দ্যাখে এমন, আর দেখে কাঁদতেও ভুলে যায়। তার ঘরে তো আর কেউ নেই, রিস্তেদার যারা এক ভিটেয় থাকত, তারা কেউ বেঁচে নেই। 'হায় আল্লা এ কী বিচের তুমার —' এ কথাগুলোই তার মনে আসে কিন্তু কোনও উচ্চারণ পায় না। সেখানেই সে বসে পড়ে আর জ্ঞান হারায়। পরদিন দুপুর নাগাদ জ্ঞান ফিরলে সে হামা দিয়ে বসিরুদ্দির পাড়া কাঁঠালটি ফেটে গিয়েছিল ওর থলি থেকে ছিটকে পড়ে, একটু একটু করে খায়। বেশ রসালো কোয়াগুলো, ফিরদৌসি সারা মুখে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো খায়। খেতে খেতে চোখের কুয়াশা কেটে যায়, শরীর

চনমন করে ওঠে, বুক দুটি ভার হয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে, পেটের ভেতর সন্তানের নড়াচড়া টের পায়। সে আঁচল দিয়ে মুখ মোছে, উঠে দাঁড়ালে তার কোমর চিনচিন করে। ধীর অথচ দৃঢ়পায়ে হেঁটে সে সুরেশ কুনুই-এর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে পাখির কাকলিতে ডেকে ওঠে, 'কানু ভাই, নমিতা বুন?'

কানু জ্বর গায়ে শুয়েছিল, তার হাতে বুলেটটি বেঁধাই রয়েছে। ঠাকুমা, আন্না মুখে খবরটি শুনে খাদের স্বরে বলে, 'ধিতরাষ্টের গপপো বল্যাছিলুম। ভগমান আমাকেই ক্যানে ধিতরাষ্ট করয়া দিলেক?'

ফিরদৌসি কেন ওদের বাড়িতেই আসে তা নমিতা বোঝে না; সারাটা রাত সে কানুর শিয়রেই জাগে জননীর মতো, কানুই এর-ওর বাড়িতে ঢুকে চাল, মুড়ি, চিঁড়ে কিছু জোগাড় করে রেখেছিল, সেসব বাড়ি তো সুনসান গোরস্তান যেন, তাই একমুঠো-দুমুঠো ফুটিয়ে নমিতা এদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ফিরদৌসিকে দিতে গেলে সে মাথা নাড়ায় ও নমিতার অজান্তে বমি করে আসে দুপুরের খাওয়া কাঁঠাল।

শেষরাতের দিকে হাওয়া বয় বড় চমৎকার, আকাশময় ছড়ানো জ্যোৎস্নায় চরাচর ভাসে, সদ্যোজাত শিশুর কান্নায় নমিতা ধড়ফড় করে ওঠে। কপাট খুলে উঠোনে যায়, দ্যাখে ফিরদৌসি সন্তানের জন্ম দিয়েছে ও দিচ্ছে। ছেলেটি তার আগমনবার্তা নিজেই জানাচ্ছে আর মেয়েটির গলায় জন্মনাড়ি পাক খেয়ে আছে দেখে নমিতা ছাড়িয়ে দেয়।

সন্তান প্রসবের তেরো দিন পরে ফিরদৌসি মারা যায়। কানুর হাতটি ইতিমধ্যে পচে উঠেছে। ঠাকুমা আর কানু একদিনেই মারা যায়। ইতিমধ্যে আন্না খবর আনে আকাশ থেকে বস্তা করে প্যাকেটে করে খাবার ফেলা হচ্ছে। নমিতা আন্নাকে বলে, 'খাবার খাবেক কে? বা তুই বেয়্যা লিয়ে আয়, ঘরকে খাস না। খুঁজ্যা দ্যাক যে ঘরকে মুর্দা লাই উখানকে বা।'

'দিদি তুমি খাবে নাই?' আন্না জিগ্যেস করে।

'খাব তবে এখুনি লয়। এগুতে তুই বা, আমি বাদে আসচি।'

'তুই কুথা যেছিস দিদি?'

'কুলিতে।'

'মিলিটারি আছে উখানকে। তোর ডর লাগে না?'

'লাইগথ। এখুন কুনো ডর নাই। আমি ঝাই , ডেরি হল্যা ভাবিস নে। আমি ঠিকেই আইসব।'

আন্না থলি নিয়ে যায়। অনতিপরে কাঁথায় দুই শিশু জড়িয়ে নমিতা বেরোয়। কাপড় তুলে দিয়েছে মাথায়, মুখ নাক জড়িয়ে নিয়েছে আঁচলের প্রান্তে তবু কটু গন্ধ আসে, মৃত্যুর গন্ধ, রক্তের গন্ধ আর নিহত মানুষের গন্ধ। বাচ্চাদুটো তার বুকের ভেতর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

কাঁটাতারের ঘেরার দিকে চলেছে নমিতা। সে মনস্থির করে নিয়েছে। এই বাচ্চাদুটোকে সে বাঁচাতে পারবে না এমন কয়েদখানার ভেতর। যেভাবেই হোক সে এদের এই মৃত্যুপুরীর

বাইরে পাঠাবে। বলবে -- 'এতদিন কোথায় ছিলে গঁ তুমরা? মানুষগুলান মানুষের মরণ মইরতে লারল, শিয়াল কুকুরের পায়া রোগের যন্ত্রণায় মইরল, টুকচেক অসুদ পালে নাই-- শেষ তক্কো নিজেরা কামড়াকামড়ি মারপিট কর‍্যা মইরল। পানু বসিরচাচার গালের মাংস তুলে লিছিল কামড়াই, তো চাচা ফিরে উয়ার মাথাটো কাট্যে আলেদা কর‍্যা দিলেক, চাচাকে মাইরলে তুমরা, এখুন খাবার দিছ কীসকে? মইরবার কতা লয় গঁ আমাদের বাপ ভায়ের এমুন মরণ হবার লয়। এখুন আমাদিগকে বাঁচাও। গেট খুলো গঁ — গেট খুলা করো গো মালিক .... গেট খুলা করো ....'

নমিতা একা একাই বকে যায়, সে তো জানে না কাকে বলতে হবে এসব কথা বা কাদের সামনে দাঁড়াতে হবে বাঁচা ও বাঁচাবার জন্য তবু এত কথা তার বুকে জমা ছিল যে সব কষ্ট পাহাড়প্রমাণ ভার ঠেলে ঝরনাধারার মতো বেরিয়ে আসে। বাতাসই তো বাহন একমাত্র, এই মানুষী ভাষার, এই মানুষীর ভাষার, বাতাসে সেই ভাষা ছড়িয়ে দিতে দিতে আঠারোর তরুণী কুমারী মায়ের দিব্য মহিমা পায়, যে এই দুই নবজাতককে মৃত্যুপুরীর বাইরে পাঠিয়ে এই শ্মশানভূমিতেই ফিরে আসবে। তার এখন অনেক কাজ — মৃতদেহগুলির সৎকার, আসন্ন বর্ষায় বীজতলাতে চারা তৈরি ও রোয়া--যে-ভূমিতে তার স্বজন ও আত্মীয়প্রতিমগণ শায়িত সেই ভূমিতে ফসল ফলানো, একাজ তো সে একা পারবে না -- ধ্বংসে যেমন একক শক্তিতে হয় না নির্মাণও তাই। যুদ্ধক্লান্ত অবশিষ্ট মানুষগুলোকে এভাবেই সে ফিরিয়ে দিতে পারে তাদের নষ্ট করা মানবজীবন। তার পেছনের দিগন্তে সূর্য অস্ত যাবার আগেই সে সামনের দিগন্তে যেতে চায় যাতে তার পরের দিনের সূর্যোদয় -- অরুণোদয় হয়ে উঠতে পারে।

বাচ্চাদুটো কেঁদে ওঠে তো নমিতা সেই পলাশ ও কাঁঠাল গাছের ছায়া মাখামাখি নবীন ঘাসের ওপর বসে। বসিরচাচার গোর না দেয়া হাড় ক'খানার দিকে তাকিয়ে তার চোখদুটো সজল হয়ে আসে। বিপুল কেশরাশি তার অনাবৃত পিঠ ও বুকে পড়ে, ছেঁড়া, ময়লা শাড়িটা উর্ধ্বাঙ্গ থেকে সরিয়ে নিলে। হঠাৎ খুব তাত লাগে তার, যেন শরীরের ভেতর থেকে উঠে আসে এক অগ্নিদহন ---সেই দহনে সে পুরো কাপড়টাই খুলে গায়ের ঘাম মুছে নেয় তাকে দেখায় অলক্ষিত কোনও বনদেবীর মতো। তার কুমারী বুকের মধ্যে কী যেন টনটনায় আর অকস্মাৎই তা থেকে প্রথমে এক-দু ফোঁটা তার বিস্মিত ও আনন্দিত মুখশ্রীকে নন্দিত করে অমৃতধারা উৎসারিত ও ক্রমে উচ্ছ্বি ত হয়। সে সেই দূর্বাদলের ওপরে শুয়ে পড়ে পৃথিবীর প্রথমতম মানবীর মতো আর শিশুদুটিকে স্থাপন করে তার দুই অমৃত কলসের ওপর -- তারা উপুড় হয়ে সেই মানবী সুধা পান করে।

এই দৃশ্য দ্যাখে এই 'বিপজ্জনক' গ্রামের সমস্ত মৃত আত্মারা, চক্ষুহীন বলে তাদের দেখায় কোনও কলুষ নেই এবং তা চরাচরব্যাপী। আর এ দৃশ্য দ্যাখে আকাশ ও পৃথিবী যেমনটি তারা সৃষ্টির আদি থেকে দেখে আসছে।

প্রতিক্ষণ ১৯৯৭

বেঁচে থাকার উপায় অনুপায়

বারোশো টাকা। একসঙ্গে এতগুলো টাকা পেলে না-জানি কেমন লাগবে, কিন্তু তার আগেই ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া। বছরে বারোশো মানে যে মাসে একশো, এ হিসেবটা চন্দনা জানে, তবু পুজোর ঠিক আগে টাকাটা পাওয়া যাবে আরও কিছু বখশিস সমেত — জেনে সে কথাটা চেপে রাখতে পারে না, এ বাড়ির বুড়িকে বলে ফেলে। আর তাতেই তাকে শেষমেষ ঘর বল ঘর, দেয়াল ঘেরা বারান্দা বল বারান্দা, তারই ভাড়া মাস গেলে দুশো, ছাড়তে হয়।

জে এল আর ও অফিসের কাজটা ওকে দিয়েছিল এই বুড়ি। সে নিজে এই কাজটা করত বছরখানেক আগেও। দুই মেয়ে নিয়ে এখানে চন্দনা এসে পড়লে বুড়ি তাকে কাজে লাগিয়ে দেয়। দুশো টাকা ভাড়ার ঘরখানাও ও-ই ঠিক করে দেয়। বাড়িটার পেছনের বারান্দায় দেয়াল তুলে দিব্যি টালির ছাদের গোটা তিনেক ঘর মাস গেলে দুশো টাকা জোগায় বাড়ির মালিক ঘনশ্যাম পালকে। বুড়ি গোটা বাড়িটার ভাড়া আদায় করে, ভাড়াটেদের ওপর নজর রাখে, বদলে উঠোনের ধারে একখানা ঘরে বিনা ভাড়ায় থাকে তার ছাগল, কুকুর আর টিয়াপাখির খাঁচাসমেত। পাল এখানে থাকে না। মাসে একবার আসে ভাড়া নিতে।

চারদিকে হাঁটা দূরত্বে কয়লা খাদান, তার মধ্যে কতগুলো পরিত্যক্ত। রেজিং বন্ধ হয়ে গেছে সরকার কয়লাখনি নেবার আগেই। হারা উদ্দেশে বেরিয়ে বাস থেকে চন্দনা হঠাৎই নেমে পড়েছিল ন-বছরের মেয়ে মুনমুন আর দু-বছরের গুল্লাকে নিয়ে। গাছতলায় ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হাওয়ায় উড়ে ওর গালের ওপর গড়িয়ে আসা চোখের জল ধুইয়ে দিচ্ছিল, তখন আপিসের ঝাঁটপাট দেয়া সেরে বুড়ি শাদা চুল ঝুঁটি বাঁধা, শাদা শাড়ি সবুজ পাড়, টুকটুক হাঁটে, আর ওদের দ্যাখে।

'ও মেয়ে বাড়ি কোথা? এখানে কেনে? কোথা থেকি আইসচ?' এইসব কথা জিগ্যেস করে বুড়ি। তো চন্দনা প্রথমে চুপ, কথা জোগায় না, বেলাও পড়ে এসেছে, ফুঁপিয়ে ওঠে তারপর এক নিঃশ্বাসে তার জীবনচরিত শুনিয়ে দেয় বুড়িকে।

চারবছর হয়েছে কি হয়নি মা মরেছে, বাপের ছিল ছোটখাটো ক্যাটারিং, তো তারই জোরে তেরো বছরেই সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করে দিল একই গাঁয়ের জোতজমি, খেতখামারওয়ালা চক্রবর্তী বাড়িতে। ষোলো বছরে পা দিয়ে চন্দনা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে জানল বড়লোকের ছেলেকে ঘরে আটকাবার জন্যই তাকে আনা হয়েছে। দুই জা বললে, 'কপালের

লেখা খগুবি কী করে। দ্যাখ বাচ্চা-টাচ্চা হলে যদি ঘরে ফেরে।' তো বাচ্চা হল — মেয়ে। সাতবছর বাদে আবার গা আইঢাই, হড়হড়িয়ে বমি, মাসিক বন্ধ, উনুনের পোড়ামাটি খামচিয়ে খাওয়া, টক খেতে মন করে তো চন্দনা ওষুধ খায় এলোপাথাড়ি, শিকড়বাকড়, জড়িবুটি শেষে হোমিওপ্যাথি গুলি, অ্যালোপ্যাথি ট্যাবলেট — তার বাচ্চা তবু গর্ভ আঁকড়ে রইল। মানুষটা বলল, 'থাক — যদি ছেলে হয়।' ডাক্তার বললেন, 'বাচ্চা ভালো হবে না। এত ওষুধ খেলে কেন?'

সেই বাচ্চা এখন না-বলে হেন কথা নেই, একটু রোগাভোগা তবু ওকে নিয়েই চন্দনার ভয়—এই বুঝি গাড়ি চাপা পড়ল। ওরই জন্য মুনমুনকে ইসকুলে দেয়নি ও, মাসে তিন কেজি চাল আর বিনা পয়সায় পড়তে পারবে জেনেও। সে নিজে রাত আড়াইটেয় উঠে তিনটেয় বেরোয় গামছা আর কয়লার ঝুড়ি নিয়ে। দোকানে দোকানে কয়েক ঝুড়ি কয়লা ঢেলে দিলেই নগদ টাকা অথবা সবজি বাজারটা মেলে। সেখান থেকে এক সি আই এস এফ অফিসারের বাড়ি কাজ সেরে আর এক বাড়ি ছোটে। ফিরে এসে উনুন ধরিয়ে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসে। ভাত চড়িয়ে সে বেড়িয়ে পড়ে — দু-কিলোমিটার হেঁটে অফিস ঝাঁটপাটি দিতে যায়, খাবার জল এনে রাখে, মেসের বাবুদের কাপড়জামা কাচে, দফায় দফায় চা বানায়, স্টোভ, লণ্ঠন সাফসুতরো করে বিকেলে নাইট গার্ডের হাতে চাবি দিয়ে আবার দু-বাড়ির কাজ সেরে ঘরে ফেরে। মেয়ে জামাকাপড় ভিজিয়ে রাখলে সন্ধে রাত্তিরে কাচে, রাঁধাবাড়া করতে করতে মুনমুনের পড়া দেখে, ছোটটা তখন তার কোলে পিঠে ঝুলে থাকে। দুপুরে মাঝে মাঝে বুড়ি মেয়ে দুটোকে ভাত দেয় থালা ভরে বুড়ির ছেলে-বউ-নাতি-নাতনি এ বাড়িরই একটা ঘরে ভাড়া থাকে দেড়শো টাকায়। এজমালি পায়খানাটা তালা দিয়ে রাখে ওই—ফলে অন্যান্য ভাড়াটেদের মাঠে যেতে হয় । মুনমুন বুড়ির কাজ করে দেয়, চন্দনাও কাপড়চোপড় কেচে দেয়, দু-থালা ভাত তো কম কথা নয়।

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। ঘুম জড়ানো চোখে মেয়ে-বউদের একটা দলের সঙ্গে সুঁদের ভেতরে নামা, কয়লা কুড়িয়ে ঝুড়ি ভর্তি করা আর ছ/আট টাকায় তা বেচা। এ কাজে গতরের জোর লাগে চন্দনা হাড়ে হাড়ে টের পায়। বাবা বলত কেটারিং বিজনেসে আছি। আসলে সে ছিল রাঁধুনি, মা-মরা মেয়েটাকে পার করে দিয়েও সে বাঁচেনি, জামাই আবার বিয়ে করেছে শুনে থানা পুলিশ কি মামলা মোকদ্দমা করার মতো শরীরে তাকত ছিল না তার, পয়সা যা ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে মেয়ের বিয়েতেই গেছে। তা জোতজমিঅলা ঘরের বউ হতে গেলে মেয়ের বাপকে তো খরচখরচা করতেই হয়। জামাই মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে শুনে সে বুকের ব্যথায় ধড়ফড় করে মরেই গেল। বসত বাড়িটুকু ছিল সেটা আগলে রইল চন্দনার জেঠার ছেলে ধীরেন আর তার বউ। সেটা নাকি কাকা তাকে দিয়ে গেছে। তা চন্দনা দু-চারদিন থাকতে পারে, যেমন ভায়ের বাড়ি বোন আসে তেমনি।

স্বামী অন্যত্র সংসার পাতার পরেও বছরখানেক চন্দনা শ্বশুরবাড়ি ছিল। শাশুড়ি মারা গেলে তাকে চলে যেতে বলা হল। বলা হল, না সে নিজেই চলে এল তার মনে পড়ে না,

মনে পড়ার সময়ও নেই। রাত তিনটে থেকে সে খালি ছুটছে আর ছুটছে।

দুই

বুড়ি বলে, 'পথ থেকে কুড়িয়ে এনে ঘর দিলুম, কাজ দিলুম, মেয়ে দুটিকে দুপুরে থালা ভরা ভাত দিই, বিস্কুট লজেনও দিই, ও টাকা তো আমারই পাবার কতা। এত লালচ তোর? ভাতারে ভাত দিল না কেনে তা বুঝি এবারে। তা আদ্দেক দে — দু-শো টাকা।' চন্দনা বলে, 'ও মাসি, চার মাসের ঘরভাড়াই তো আটশো টাকা বাকি, তা বাদে দোকানে ধার আছে, পুজো আসচে, কে দেবে বলো আমার মেয়ে দুটোকে নতুন জামা প্যান?'

'কেনে এক বাড়িতে নিজের কাপড় নিবিনে। বদলে মেয়েদের জন্যি নিস। ধম্মে সইবে না আমার টাকা মারলে। আমি বাবুদিগে বলব।'

'বলো গে যাও। আমি অসহায় মেয়েমানুষ, একা দুটি বাচ্চা নিয়ে রইচি। কেউ বলতে পারবে না চন্দনার কোনও দোষ আচে। সারাদিন খেটে মুখে রক্ত তুলচি কি তোমার জন্যি?'

একথা সেকথা, কথার পিঠে কথা, যেন শিলাবৃষ্টি। ভাড়াটেরা এ ও বলাবলি করে, একা মেয়েমানুষের এত তেজ ভালো নয়। এর মধ্যে বাড়িওয়ালা ঘনশ্যাম বুড়ির কাছে কী সব শুনে এসে বলে, 'এ মাস থেকে ঘরের ভাড়া তিনশো।'

'তিনশো।' চন্দনা বলে ওঠে, 'সে কী গো কাকু — আমি কোতায় পাব অত টাকা?'

'তাহলে ঘর ছেড়ে দাও। চার মাসের ভাড়া বাকি সেটা দিয়ে দাও।'

তা চন্দনা ছোটে এক বাড়ি — 'ও বৌদি, চারশো টাকা দাও — দু-শো আগাম মাইনে বাদে।' পায়। চন্দনা ছোটে ওবাড়ি — 'ও কাকিমা, দু-শো আগাম দাও মাইনে সমেত।' তাও পায়। বাড়িওয়ালাকে সবার সামনে টাকা দেয় — 'নাও কাকু তিনশো টাকায় ঘর ভাড়া দিয়ো।' আঁচলে কয়লা বেচা পয়সা, পোঁটলা পুঁটলি আর দুই বাচ্চা নিয়ে সেই নাইট গার্ডের ঘরের বারান্দায় সারারাত জলে ভেজে। মুনমুন বলে, 'পাঁউরুটি খাব না মা।' গুল্লার ডাক নাম চম্পা, বিহারি প্রতিবেশীদের মুখে সেটা 'চাম্পি' হয়ে গেছে — সে 'ভাত খাব' বলে এমন চিল-চিৎকার দেয় যে চন্দনা গুমগুম কিল মেরে ওর কান্নাকে ফোঁপানিতে নামায়। এমনিতে চাম্পির খাওয়ার বাছবিচার নেই — শুধু ভাতই। সাত বাসি হলেও নুন দিয়েই সে খেয়ে নিতে পারে। মুড়ি চিঁড়ে রুটি পাঁউরুটি তেলেভাজা পচা বাসি কোনও কিছুতেই তার আপত্তি নেই। বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতোই তার আহারে সন্ন্যাসীর নির্বিকারত্ব, তাকে যা দেওয়া হয় সে তাই হাসিমুখে চেটেপুটে খায়, আজ তার কী হল চন্দনা বুঝতে পারে না, বৃষ্টির ছাঁট তার ডান পাশটি ভিজিয়ে দিয়েছে, বাঁ কাঁধের আঁচল নামিয়ে সে চাম্পিকে ঢাকা দেয়। সে অবস্থাতেই গুমগুম কিল মারে ডান হাতে মেয়ের পিঠে। 'ভগবানের কি বিচার নেই?'

'কী হবে মা?' মুনমুন বলে।

'কী করি বল তো মুনমুন?' সে যেন বালিকা-স্বভাব পায়। পালটা প্রশ্নে যেন সে মুনমুনের মা নয়, মুনমুনই মস্ত এক জননী তার।

'কী আর হবে, এখানেই থাকি।' বলে মেয়ে গুটিসুটি মেরে মায়ের দিকে সরে আসে। 'এখানে ওইসব আছে মা?' মুনমুন ফিসফিসিয়ে বলে।

তো চাম্পি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'ভূ ভূ উ উত আচে এখেনে। তুই জানিস না।'

'রাতের বেলা নাম করলি কেন? আসে যদি?' মুনমুন মায়ের কোলে মুখ গুঁজে দেয়। শীতের রাত্রির মতো দীর্ঘ মনে হয় চন্দনার আজকের এই বৃষ্টিঝরা শ্রাবণ রজনীকে।

তিন

পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় একটা ঘর জোগাড় করল চন্দনা। আজ সে অফিস যায়নি। কয়লা আনতেও যায়নি। ঘরটা দেখে ওর মনে হল এখানেই হাত পা ছড়িয়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মুনমুন বড় বড় চোখ আরও বড় করে বলল, 'কী করে থাকব মা আমরা? কোথায় শোব? কোথায় রান্না করব?' আলু সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ, ভাত রাঁধতে দশ বছরের মুনমুন শিখে গেছে। 'ভূত আছে এখানে, হিঁই, তুমি বোঝ না।' চাম্পি বলে। ওই এক কথা শিখেছে মেয়ে -- কথায় কথায় 'তুমি বোঝ না' আর 'তুমি জানো না'। আর সে সর্বত্র ভূত দ্যাখে। একটা শিশির ঢাকা ফুটো করে কুপি বানিয়ে নিয়েছে চন্দনা, তার আঁকাবাঁকা দীর্ঘ ছায়া দেয়ালে কাঁপলে মায়ের পিঠে মুখ লুকিয়েও বলে, 'ভূত!' আর এই ঘরে চন্দনারই মনে হচ্ছে কোনও মানুষ থাকে না, গোবরমাটি দিয়ে লেপার পরেও মেঝে থেকে, প্লাস্টারবিহীন, জানলাহীন দেয়াল থেকে, টালির ছাদ থেকে কেমন বিচ্ছিরি গন্ধ, অজানা, সম্পূর্ণ অচেনা এক ভ্যাপসা গন্ধ বেরোতে থাকে।

বুড়ি এত আপনজনের মতো ছিল যে, চন্দনা কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল বুড়ি যখন তার দেয়া হাঁড়ি বাটি গেলাস ছেঁড়া মাদুর এমনকি তোলা উনুনটা পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। তিনখানা ইঁট দিয়ে একটা অস্থায়ী উনুন বানিয়ে কাঠকুটো জ্বেলে মাড়-ভাত ফুটিয়ে নেয় আলুকুমড়ো সেদ্ধ দিয়ে। কাল থেকে ভাতই খাওয়া হয়নি। দিনের বেলা চন্দনার ভাত না-খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু দুপুরে কাজের বাড়ির দেয়া বাসি রুটি তরকারি খেতে খেতে চাম্পি খালি জল খায় তবু 'ভাত খাব' বলে বায়না করে না দেখে চন্দনা নিজেই বলে, 'কালকে ঠিক ভাত রাঁধব, আজ আর পারছি না মুনমুন।' মুনমুনও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বালতি করে গোবর, মাটি নিয়ে এসেছে। ঢক ঢক করে জল খেয়ে সে নাক কুঁচকে বলে, 'কী গনদো গো মা, এই ঘরে খাওয়া যায়? কাল যদি রোদ হয়, ঘর শুকিয়ে খটখটে হলে ভাত খাব। নারে গুকলা?'

'বলে দিঁই মুনমুন? বলে দিঁই?' চাম্পি খিকখিক হাসে।

'মারব এক থাপ্পড়। কী বলবি তুই?' মুনমুন বলে।

'ফের মুনমুন বলছিস?' চন্দনা ভাবে ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে মেয়েটা কোনও

ভালো কথা শিখছে না। মুনমুনের পড়াশুনোয় মন নেই, কিন্তু বুদ্ধি আছে। সব কথা শুনবে কিন্তু বলবে ভেবে চিন্তে। 'হ্যাঁ বেটা কী বলবি?'

'দিদির কাছকে কুড়ি টাকা আচে। দাদু দিইচে।'

'মুনমুন!' চন্দনা মুনমুনের চুলের মুঠি ধরে — 'পাল কাকু দিয়েছে টাকা? কেন?'

'দিদি বুড়োর চুল তুলে দিইছিল যে। আমাকেও দিইচে পাঁচ টাকা। এই নাও।' বলে চাম্পি ওরফে শুক্লা তার প্যান্টের পকেট থেকে দোমড়ানো নোটটা বের করে দেয়।

'তোর টাকা?' মুনমুন উঠে ওর বইখাতা রাখার পলিথিনের প্যাকেট থেকে খুচরো নোটে মিলিয়ে বারো টাকা দেয়।

'আর টাকা কী করেছিস?' চন্দনা চাপা ক্রোধে বলে।

'আইচকিরিম আর চ্যানাচুর খেইচি।'

'মরিস না কেন তোরা? আমি মুখে রক্ত তুলে দিনরাত খাটচি, তোরা লোকের কাছে পয়সা নিচ্ছিস? ভিখমাঙানি হয়েচিস? বামুনঘরের মেয়ে হয়ে এ কী পবিত্তি হল মুনমুন?'

'আমি নিতে চাইনি মা, দাদু বলল, পাকাচুলে মাথা কটকট করচে, তাই তুলে দিলাম। বাতে আঙুল ব্যাতা করচিল তাই টেনে দিলাম। ফুটছিল পটপট করে। দাদু কত আদর করল, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল তোর ভালো হবে — আর, আর দুটো দশটাকার নোট দিয়ে বলল মাকে বলিস না — মিষ্টি কিনে খাস মুনমুন।'

'কবে দিল?'

'আমরা যেদিন চলে এলাম, তার ক'দিন আগে।'

মেয়েকে বকেঝকেও চন্দনার পুরো রাগ মেটে না, বাকি রাগটুকু যেন নিজের ওপরেই হয় ওর। কেন ও ছুঁড়ে ফেলতে পারল না টাকাগুলো? কেন মেয়েকে বলতে পারল না ফেলে দে নোটগুলো? নাহ্, কালকেই সে খাদানে যাবে। তারও হয়েছে এক দোষ — হাতে পয়সা এলেই দমে খরচ করা। একটু টেনেটুনে খরচ করলে সময় অসময়ে তারই কাজে লাগে — কিন্তু সে তো মাস গেলে পাঁচটা টাকাও জমাতে পারে না। ধারে ধারে ডুবে আছে সে। দোকানে ধার, কাজের বাড়িতে ধার, এখন এই বারোশো টাকা আর বকশিস বোনাস মিলে পাঁচশো টাকা, মানে — তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরোশো টাকা পেলে সে বাঁচে। তারপর সে কাকুদের আবার বলবে মাইনেটা মাসে মাসে দিতে। কাকুরা বলেছে গবরমেন্টের টাকা এরকম একবারেই আসে।

'তাহলে তোমাদের বেতনও কি বছরে একবার?'

'আমরা তো পার্মানেন্ট স্টাফ, তুইও পার্মানেন্ট হ, তখন মাসে মাসে বেতন পাবি।'

'কত?' চন্দনা জিগ্যেস করে।

'যেমন ঠিক হবে, চারশো/পাঁচশো হবে।'

চারশো! পাঁচশো! আহ্ তখন চন্দনা ঝুড়ি নিয়ে আর খাদানে নামবে না। রাত তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেলেও পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমোবে। মুনমুনকে চাম্পিকে ভালো

ইসকুলে দেবে। মাস্টার রাখবে ইংরেজি আর অঙ্কের। বাংলাটা সে পড়াতে পারবে। চন্দনা ক্লাস এইট পাস। নাইট গার্ড কাকু পায় বারোশো টাকা। তার বেলায় কেন চারশো পাঁচশো? হয়তো কাকুরা তাকে ঠাট্টা করছে। হাজার খানেক টাকা বেতন হলে সে লোকের বাড়িতেও কাজ করবে না। দেশে গাঁয়ে তার খানিকটা জমি নেই নেই করেও রয়ে গেছে। বছরে একবার সে যাবে, আসবার সময় বড় জা বলেছিল ভাশুর নাকি বলেছে নবান্নের সময় যেন বউমা এসে তার ভাগের ধান নিয়ে নেয়। ভাবতে ভাবতে রোগা চাঁদের মতো একচিলতে হাসিতে তার ঠোঁট বেঁকে যায়। ধান রোয়া আর কাটার মধ্যবর্তী সময়ে ভাদ্র মাসে নিড়েন দেওয়া ছাড়া গাঁয়ে ঘরে কোনও কাজ নেই। বউ ঝি-রা গেরস্তালি কাজকম্ম নিজে হাতেই সারে। মুনিব কামিন কি মাহিন্দর দু-চারখানা ঘরেই রাখে যাদের জমি আকাশ ছোঁয়। কাঁচা পয়সা গাঁয়ের লোকের হাতে বড় একটা থাকে না। ধান বাদে আলু চাষে লোকসান। ফলন দেদার কিন্তু তাতে দাম কম। অথচ শহর বাজারে সেই আলুই সাত-আট গুণ দামে বিকোয়। চাষি আর সবজিআলার মাঝখানের রাস্তাটুকু কারা যেন দখল করে নিয়েছে। তাদের গাঁয়ের মাসুদের মামু ছিল আলুচাষি, সেসব ছেড়ে তমিজ মিএগ আসানসোলে কয়লাখাদানের আঁধার পথে নেমেছে। ভালোই ছিল, দেশে যেত টাকা ঝমঝমিয়ে, দেশে এক বিবি চার বাচ্চা, এখানে আর এক বিবি তিন বাচ্চা। হাওয়ায় উড়ছিল তমিজ চাচা। ওর কাছেই তো শুনেছিল কয়লা চালানের গপপো। হাজার হাজার মানুষ শুধু কয়লা চুরি করেই সংসার চালাচ্ছে। শুধু তাকত চাই – খাটবার ক্ষমতা, আর চাট্টি সাহস। এ কাজে পয়সা যেমন, বিপদও তেমন। প্রাণের মায়া থাকলে খাদানে নেবো না। সিকিউরিটির গুলি খেতে পারো, ছাদ ধসে চাপা পড়তে পারো, নইলে কোনও গাড্ডায় পা ফসকে হারিয়ে যেতে পারো। কেউ তোমার তালাশ পাবে না। কিন্তু খাটলে পয়সার অভাব নাই। প্রথম দিন খাদানে নামতে হাত পা কাঁপছিল চন্দনার। বাপের জম্মে সে কয়লা খাদান চোকখে দেখেনি, নামা দূরের কথা, বুড়িই তাকে সুলুক-সন্ধান দিয়েছিল, কয়লা কুড়োনিদের সঙ্গে চেনা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'পেরথম পেরথম কষ্ট হবে, পরে সয়ে যাবে। মেয়ে দুটো আমার জিম্মায় রইল, তুই নিশ্চিন্তে চলে যা।'

যেন জন্মান্তর ঘটে গেল চন্দনার। এক্কা দোক্কা, রান্নাবাড়ি খেলা থেকে তেরো বছরেই ফ্রক ছেড়ে ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি। পড়ার ছুতোয় আরও তিন বছর বাবা আর পিসির কাছে। নাইনে উঠে আর পড়া হল না – দুই জায়েরই বাচ্চা হবে বলে শাশুড়ি তাকে নিতে এল। লাল মাটির রুখু দেশ হলেও পাড়াগাঁ সেটা। গাছপালার সবুজ আর পুকুর ভরা জল আছে। হেঁসেল ঠেলে, কাপড় কাচা কি বাসন মাজার ছলে তাল গাছের গুঁড়ি ফেলা ঘাটে একটু হাপুস নয়নে কেঁদে নেওয়া যায়, ঘড়া নিয়ে সাঁতার দেওয়া যায় সমবয়সি বউ ঝি-দের সঙ্গে। স্বামী তাকে ছেড়ে না দিলে সে এখানে আসত না। মেকানিক ছিল তার স্বামী। টিভি টেপ সারাই করতে জানত। গাঁয়ে ঘরে ইসকুল নতুন করে হয়নি কিন্তু টিভি টেপের চল হয়েছে খুব। টাকা পয়সা হাতে রইত না ওর। এমনকি নিজের বাপের জমিও খানিকটা, যা ওর ভাগে পড়ত, উড়িয়ে দিল মেয়েমানুষটার পিছনে। চন্দনা তাকে দেখেনি, এখন তার স্বামী তো ওর সঙ্গেই

ঘর করছে। কেমন মানুষ যে, মেয়ে দুটোর কথাও ভাবে না? বড় হয়ে মুনমুন-চাম্পি বাপকে চিনবে? মানবে?

এই তো ঘর— এরই ভাড়া পঞ্চাশ। মেঝেটা মাটির সঙ্গে সমান। বৃষ্টি হলে রাস্তা থেকে জল গড়িয়ে আসবে। ঘরটি হল রামু রজকের। সে এসে দাঁত বের করে দাঁড়ায়, 'ভাবীজির ঘর পসন্দ হল?'

'ঘর বলো এটাকে?' চন্দনা গোবর ন্যাতা হাতেই দাঁড়ায়—'গোয়াল ছিল বলো। কত ভাড়া নেবে তোমার এই ভাঙা গোয়ালের? এখনই কিন্তু পঞ্চাশ করে দিতে পারব না। দুটো বাচ্চা, ধার দেনা হয়ে গেছে বহুত, অসহায় মেয়েমানুষ...' চাম্পির 'তুমি বোকা না'-র মতো চন্দনারও কথায় কথায় 'অসহায় মেয়েমানুষ', শব্দ দুটো বারবার বলা। ও দেখেছে শব্দ দুটো কী মোক্ষম। যেন দুটো শব্দ নয়, দুটো অস্ত্র। সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে ও এ পর্যন্ত একের পর এক যুদ্ধ জয় করে চলেছে। অফিসের কাকুরা ওর জন্য নিজের হাতে দরখাস্ত লিখে, টাইপ করে আসানসোল অফিসে পাঠিয়েছে। 'চন্দনা চা বানা, মশলামুড়ি মাখ, বিস্কুট আন, জল দে, টেবিলটা ঝেড়ে দে, এই ফাইলগুলো ওই কোণের টেবিলের কাকুকে দিয়ে আয়।' চন্দনা তখন কয়লা কুড়োনি নয়, কারও ছেড়ে দেওয়া বউ নয়, বাসনমাজা ঝি নয়, সে যেন অফিসশুদ্ধ লোকের অপরিহার্য কেউ, বড়কাকু যখন বাড়ি যাবার আগে আলমারি, ড্রয়ারে তালা লাগিয়ে চাবির গোছা নিজের ফোলিও ব্যাগে ফেলে দু-আঙুলে একটা লাল সুতো বাঁধা সিঙ্গল চাবি বের করে আনে তখন সে যেন জমি থেকে আধহাত ওপরে উঠে যায়। রোজই বড়কাকু বলে,'চাবিটা ভালো করে রাখিস, রঞ্জিত এলে তালা দিয়ে চাবি ওকে দিয়ে যাবি।' রঞ্জিত হল নাইট গার্ড — সে হেলেদুলে একেবারে সন্ধের মুখে আসে। ততক্ষণ চন্দনা এ অফিসের মালিক। সে ঝাড়নের বদলে একটা গামছা দিয়ে শূন্য চেয়ার টেবিল মোছে। ইচ্ছে হয় চেয়ারে বসে, কিন্তু সাহস পায় না, এর থেকে সুঁদের ভেতর গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে, পিছল পথে নেমে যাওয়া যেন সহজ মনে হয়। মাঝে মাঝে ও তাড়াতাড়ি চলে আসে। দুপুরে এসে একচোট কয়লা এনে দোকানে ঢেলে দেয় নয় তো নিজের ঘরেই রাখে। নিজেরও লাগে, দরকারে বেচেও দেয়। পুজো পর্যন্ত অবিশ্যি অফিসে ডিউটিটা বেশি করতে হবে, বারোশো টাকা তো এখনও হাতে পায়নি।

চার

মাঝে মাঝে কী যে হয় ওর, মেজাজ চড়ে থাকে, যেন একেবারে শেষ ঘাটে বাঁধা আছে তার একটু বাতাসের ছোঁয়া লাগলেই ছিঁড়ে যাবে। সামান্য কারণেই মেয়েদের মারে, তারপর গুমগুমিয়ে ঝুড়ি গামছা নিয়ে বেরিয়ে যায়। এখানে পুকুরঘাট নেই , নদী স্রোতের চলা নেই, মাঝে মধ্যে ধানী জমি আছে কিন্তু তাদের থেকে ও যেন অনেক দূরে সরে এসেছে। কে যেন বলছিল খাদানের নেশা। চন্দনা ভাবে কয়লা খাদানের চোরা টান না নেশা, নাকি কাঁচা পয়সার নেশা? অসহায় মেয়েমানুষ হওয়ার খানিক খানিক সুবিধা ও নেয় ঠিকই কিন্তু

দাঁতে দাঁত দিয়ে কয়লা ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে পিছল রাস্তা বা বেরাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে তখন মেয়েমানুষ হওয়া আর অসহায় হওয়া তাকে ধ্বস্ত করে দেয়। শ-দুয়েক টাকা 'অসহায় মেয়েমানুষ' হয়ে ধারধোর করে জোগাড় করতে পারে সে। কিন্তু সে টাকা খাটিয়ে পাঁচ সাতশো টাকা ইনকাম করা তার পক্ষে 'অসহায় মেয়েমানুষ' বলেই সম্ভব নয়। নইলে শম্ভু, বাঁকা, রবিদের মতো জোয়ান মরদ হলে সে ডাম্পারের ড্রাইভারকে টাকাটা দিত আর সেও তাকে দিনক্ষণ বলে দিত। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় এক ডাম্পার কয়লা কিছু মাটি পাথর সমেত পড়ত। সেটা মণ্ডলবাবুর ডিপোতে ডাইরেক্ট ঢোকালে হাতে হাতে নগদ টাকা। কিন্তু এ কাজটা ওই শব্দ দুটো দিয়ে হয় না। কেননা শব্দদুটোর আঘাতে করুণা, দয়া এইসব নরম, কোমল অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাতে শক্তি বা পৌরুষ তৈরি হয় না। তাই সব বুঝেও সে দুই মেয়ের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া পাঁচ আর বারো, মোট সতেরো টাকা নিয়ে বাজারে যায়।

ঘরবদল করতে গিয়ে তার হাতের টাকা ফুরিয়ে বেশ কিছু দেনা হয়ে গেল। এর মধ্যে তেমন করে কয়লাও আনতে পারেনি। অফিসের কাকুরা আবার বলছে দুপুরে রান্না করে দিতে। হোটেলের খাবারে অরুচি ধরেছে কয়েকজনের যারা বর্ধমান দুর্গাপুর থেকে আসে। পেটেরও গোলমাল হচ্ছে তাই চন্দনাকে এই প্রস্তাব দেয়। স্টোভ তো ছিলই, হিটারও আছে, বাসনপত্রও কিনে এনেছে, শুধু চন্দনাই রাজি হচ্ছে না। অতটা সময় থাকলে দুপুরে বাড়ি আসতে পারবে না, তাছাড়া সপ্তাহে দু-তিনদিন ও যায়ও না, ওখানেই একটা ঘরে এক বুড়ি থাকে, কানে কম শোনে তাকে কিছু পয়সা দিয়ে দেয় কয়লা বেচা পয়সা থেকে, সেই ওই দিনগুলোতে ঝাঁটপাট দেয়, চৌবাচ্চায় জল ভরে দেয় আর খাবার জল এনে দেয়। চা-টা কাকুরা নিজেরাই বানিয়ে নেয়। 'এখন, পুজো পর্যন্ত কামাই করিস না চন্দনা, নইলে তোকে পার্মানেন্ট করা বড্ড মুশকিল হবে।' কাকুরা কেউ কেউ বলে। তক্ষুনি ও অসহায় মেয়েমানুষ হয়ে ওঠে — 'দুটো বাচ্চাকে রেখে আসি কাকু, বড্ড ভয় করে।' করুণার উৎপাদন হয়, সেই করুণার প্রাবল্যে ভেসে আসে ছোট ফ্রক, জামা, কাকুদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের বাতিল হওয়া জামাকাপড় নিয়ে চন্দনা ঘরে ফিরলে মুনমুন আর চাম্পি নাক ডুবিয়ে ঘ্রাণ নেয়। উৎসবের আয়োজন হয়ে ওঠে রমণীয় সন্ধ্যাটি।

কয়লা কুড়োয় চন্দনা, বেআইনিভাবে পরিত্যক্ত খাদানের ভেতর থেকে তুলে নিয়ে আসে ঝুড়ি ভর্তি কয়লা একথা সে কাকুদের বলে না। সে যে জে এল আর ও-তে কাজ করতে যায় ক্যাজুয়াল লেবার হিসেবে একথা তার কয়লা তোলার কিংবা কাটার সাথীরা জানে না। কয়লার কথা জানলে কাকুরা তার চাকরির জন্য দৌড়াদৌড়ি করবে না এটা সে বোঝে। অফিসে কাজ করছে বললে গাঁইতি বেলচা নেয়া ছেলের দল তাকে সন্দেহ করবে, বড় চাঙড় ছেলেরা নেয়--অনেক সময় তারা পৌঁছে দেয়--তখন ছোট টুকরোগুলো তাদের কুড়োতে দেয়, তা আর দেবে না। মেয়েরা জানলে খামচাখামচি করে ঝুড়ি ভর্তি করতে দেবে না। পেছন থেকে বলবে 'অফিসওয়ালি'। তাছাড়া বাণ মেরে দিতে পারে কেউ।

যেমন দিয়েছিল মাসুদ আর নাসিমের মামু তমিজ মিঞাকে। সাইকেল সুদ্ধ পড়ে গেল চাচা — তিনটে কয়লাভর্তি বোরা কে কোথায় নিয়ে গেল টেরও পেল না। তিনমাস হাসপাতালে ছিল। এখনও লাঠি ধরে হাঁটে। কোমরে বেদনা। সবাই জানে তালাচাবি বাণ মেরেছে কেউ। মেরে চাবি ফেলে দিয়েছে জলখাদে। পরিত্যক্ত খনি ভর্তি জল — সেখানে মানুষ পড়লেই হদিশ মেলে না কোন সুড়ঙ্গ দিয়ে কোথায় তলিয়ে যায়। কখনও কখনও পড়েও তো মানুষ--তখন সে হয় লাশ--কোনও দিন তার হাড় পর্যন্ত পাওয়া যায় না--তো বাণ মেরে চাবি যদি কেউ সেই গহীন জলে ছুঁড়ে ফেলে, সে চাবির হদিশ যে ফেলে, সেও দিতে পারে না। চাচার কোমর আর সোজা হবে না--ছ ফুট লম্বা জোয়ান এখন কোমরভাঙা অকালবৃদ্ধ--লাঠি নিয়ে হাঁটে।

তবে চন্দনার অত লোভ নেই। চাকরিটা হলে সে বড়মেয়েটাকে কোনও ভদ্রবাড়িতে সবসময়ের কাজে দিয়ে দেবে। ছোটটাকেও দিয়ে দেবে খানিকটা লেখাপড়া শিখে হাতে পায়ে বড় হলে। মুনমুনের পড়ায় মন নেই, যদিও বাজার-হাট নিখুঁতভাবে করে। চন্দনা নিজে কতদিন এভাবে চালাতে পারবে জানে না। সে বোধহয় তাড়াতাড়ি বুড়ি হয়ে যাবে। তার কোনও পুরুষ নেই। স্বামী আছে। দূরে থাকলেও সে তো চন্দনা চক্রবর্তী—বাপের নয়, স্বামীর পদবিই তো সে আর তার মেয়েরা ব্যবহার করছে। স্বামীটাও যে কতখানি পুরুষ ছিল কে জানে। যে শুধু বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, পালপোষ করেনি, বউকে ভোগ করেছে ভার নেয়নি সে কেমন পুরুষ? সে যদি এ সময় তার পাশে থাকত। সারাদিন সাইকেল ঠেললে দিনে একশো দেড়শো টাকা হেসে খেলে...। পরক্ষণেই চন্দনার মুখ বিষণ্ণ হয়ে যায়। সে মানুষ যদি এত রোজগার করত তাহলে এতটাই খরচ করত সেই মেয়েমানুষটার পেছনে, তার চেয়ে এই ভালো, অন্ধকারে ছায়ামূর্তির দলে এক ছায়ামূর্তি হয়ে গামছার বিড়ে মাথায় ঝুড়ি কাঁকালে উঁচু নিচু পাথর ভরা রাস্তা দিয়ে আঁধার সুঁদের পেটের ভেতর ক্রমে সেঁদিয়ে যাওয়া। টর্চের আলোয় পথচলা। এবারে বৃষ্টিও হচ্ছে দেদার। খাদানের ভেতরে জল ঢুকেছে, না ভেতর থেকে উঠেছে নিজের অনভিজ্ঞতায় ও বোঝে না। কাউকে জিগ্যেস করলে বলে দিত, কিন্তু এসময় এখানে কথা বিশেষ হয় না। শব্দ যা কিছু সবই অপ্রাকৃত মনে হয়। ছোট মেয়ের কথা মনে আসে। 'হুঁ উ উ, তুমি জানো না, খাদানে ভূত আছে।' একদিন খুব হাওয়া, ঝড়বৃষ্টির দিন চন্দনা আর জনা পাঁচেক গিয়েছিল খাদান। খুব দেরি হয়েছিল তবু পঞ্চাশ টাকার কয়লা বেচেছিল ও। ঘরে ফিরে দ্যাখে মুনমুন মাকে খুঁজতে বেরিয়েছে আর চাম্পি কেঁদে কেঁদে বলছে, 'আমার মা মরে গেছে। ভূত খেয়ে ফেলেছে মাকে।' সেদিন বুড়ি ছিল মেয়েটাকে দেখবার জন্য, আজকে তো কেউ নেই। মুনমুন দরজা বন্ধ করে হয়তো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে বোনের পাশে। সে যদি এই গহীন গাড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকে তো মেয়ে দুটোকে কে দেখবে? সে তো কোনও পাপ করেনি যে শাস্তি পাবে। বাচ্চাদুটো শাস্তি পাবে কেন? নাহ্ , সে এভাবে নিশ্চয়ই মরবে না। অন্ধকার বাইরে এখনও। অন্ধকার ভিতরে তো থাকেই। চালু খাদান হলে বাতি জ্বলত। হল্যাজ লাইন ঠিক থাকত। গাড়ি লোড

হত। মানুষজন এমন ভূতের পারা থাকত না—কথা বলত, হাসি মজাক উড়াত। ময়লা হাতের চেটোয় খইনি ডলত চুন দিয়ে। গান গেয়ে উঠত কেউ। চোরাই কয়লা কাটতে শুধু যন্ত্রের মতো কাজ করে যাওয়া। কয়লা কাটার শব্দ। নিজের বুকের পাঁজরের ভেতরে সচল হৃৎপিন্ডের দ্রুত চলনের শব্দ। কয়লা তুলতে নিচু হলে কি অন্যের মাথায় ঝুড়ি তুলে দেবার সময় কোনও কোনও হাতের গোছাভরা কাচের চুড়ির নামা-ওঠার শব্দ। কেউ কাশল, কেউ নাক ঝাড় —সেইসব আবশ্যিক শব্দ শুধু জানিয়ে দেয় মানুষের আনাগোনা। বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা কবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—গরম লাগে, লোভে লোভে বেশি নিচে নেমে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার কষ্ট। তাই নিচে কোনও আলতু-ফালতু কথা নেই—অতি প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ ও ভাঙা বাক্য ছাড়া। যত পারো কয়লা কাটো। যত পারো কয়লা ওঠাও। হাসি মজাক ওপরে। আকাশের নিচে। তখন আশেপাশের গুমটি দোকান থেকে চা খাও। চপ, বেগুনি দিয়ে মুড়ি সেনে খাও। মাথায় গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাওয়া খাও অল্প। তারপর ঝুড়ি নিয়ে মেয়েরা আর সাইকেল ঠেলে ছেলেরা চলে কয়লা বেচতে। বড় এক বোরা আর ছোট দুই বোরাই নেয় এক সাইকেলে খাড়া করে, আরও একটা বড় বোরা নেওয়া হয়। সাইকেল ঠেলতে শরীর খাড়া থাকে না, মাঝে মাঝে টলেও যায়, হাতের শিরা পেশি ফুলে ওঠে, পায়ের পাতা আর আঙুলে ভর রেখে মাটির ভেতরের টানের উলটো দিকে যাওয়ার ধাক্কাটা দিতে যে যত ভালো পারে তার সাইকেল তত আগে যায়। কথা বলার শক্তি খরচ করে না এরা, ডিপোতে দিয়ে, সাইকেলে খালি করে দম থাকলে আবার ফিরে আসা, নইলে পরের শেষরাতের জন্য আবার তৈরি হওয়া।

দু-ঝুড়ি কয়লা বিক্রির টাকা চন্দনার আঁচলে বাঁধা। তার চায়ের নেশা আছে। পান দোক্তা খাওয়াটাও আর এক নেশা। এক গ্লাস চা খেয়ে, একটা পান মুখে দিয়ে সে তৃতীয় ঝুড়ি নিয়ে সুঁদের মুখে এসেছে, কোন অতল থেকে যেন একটা ভয়ংকর কান ফাটা আর্তনাদ আর হুড়মুড় করে কী যেন ভেঙে পড়ার শব্দ এল। বাইরের ছেলেরা সাইকেল ফেলে ভেতরের দিকে নেমে গেল, ক'মিনিট বাদেই উঠে এল তারা, ভেতর থেকেও একদল বেরিয়ে এল হাঁফাতে হাঁফাতে।

'সর্বনাশ। ছাদ ভেঙে গেছে।'

'ক'নম্বরের?'

'বইলতে লারব, উয়ারা চাপা পড়্যাছে, হায় হায়।'

'ধুর শালো ভাগ্ এখুনি সিকুরিটি আইসবেক্, তোদিগে ধইরবেক।'

'হারু আসে নাই?'

'মকবুল ছিল না উয়াদের সাথে?'

'চল চল, সাইকেল মাইকেল লিয়ে লিব্যাক, চল, ভাগ।'

'উয়ারা রইল যে!'

'তুই তুলগে যা।'

পুতুল পাগলের মতো ভিড়ের ভেতর খোঁজে। 'ওগো, সেও যে নামুতে গেল। উঠে নাই? ও হো হো।' পাগলিনী, আলুথালু ঝুড়ি ফেলে দেয়, সুঁদের ভেতর ছুটে যেতে চায় তো ছেলেরা আটকায়, 'বউদি, কুথা যেছ? উয়াদের কাছকে যেথ্যে লাইরবে। মইরবে নাকি?' 'মরণও ভালো ছিল গঁ, ও হো হো' পুতুল কপালে করাঘাত করলে ওর ডান হাতের শাঁখা ভেঙে ছিটকে পড়ে আর ও কেমন বিহ্বল অসহায় বিস্ফারিত চোখে নির্বাক হয়ে যায়, ভাঙা শাঁখার টুকরোগুলো ঝাপসা চোখে শাদা ধবধবে হাড়ের কুচির মতো লাগে। চন্দনার মাথাটা কেমন করে। প্রথম দিন খাদানে নেমে ওর জ্বর চলে এসেছিল — সেইরকমই জ্বরাক্রান্ত আচ্ছন্ন শরীরে ও হাঁটা শুরু করে, ওকে মেয়েদের কাছে পৌঁছতে হবে। ঝুড়ি ভর্তি কয়লা কাত হয়ে ওর পেছনে পড়ে থাকে।

পাঁচ

দু-সপ্তাহ চন্দনা খাদানে যায় না। পয়সার টানাটানি হলেও উপায় নেই। ইনসপেকশন হচ্ছে, সিকিউরিটি, সি আই এস এফ গোটা এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এ খনির মালিক রাষ্ট্র নয়, কেননা কয়লাখনি জাতীয়করণের আগেই এটি লাভজনক নয় বিবেচনায় পরিত্যক্ত হয়। সাতাশ বছর আগে পরিত্যক্ত খনি কেন নিয়মমাফিক সিল করে দেওয়া হয়নি, সাতাশ বছর পরে তার জবাবদিহি করবার জন্য খনির মালিককে অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়। এ পর্যন্ত মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবং পাওয়া যায়নি মিলে মৃতের সংখ্যা বারো থেকে পনেরো।

এসব খবর চন্দনা সাথীদের মুখে পায়। যে-অফিসারের বাড়ি ও কাজ করে সেই বাড়ির বউদিও বলে এখন অনেকদিন কড়া পাহারা থাকবে। ওপর থেকে আরও অফিসাররা এসেছে তদন্ত করার জন্য।

এমনিতে ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক সুঁদ পরিষ্কার করা, আবার রেজিং-এর উপযুক্ত করে তোলা এসব কাজ চলে, বর্ষার আগেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় কয়লা তোলার চেষ্টা হয়। এই তিন মাস কয়লা তোলা মুশকিল। তার আগেই সেসব বন্ধ হয়ে গেল বলে চন্দনা অফিসের কাজেই মন দিল। সে বাউরি ডোম বাগদি নয় বলে অসুবিধে হয় এদের সঙ্গে এদের একজন হয়ে থাকতে। অফিসে তাকে রান্নার কথা বলেছিল কাকুরা, এবারে সে রাজি হয়। খাবার নিতে কিংবা খেতে সে পারবে না কিন্তু কিছু উপরি পয়সা পেলে তার আপাতত একটা বাঁচোয়া হয়। সে বাজার করে, চাল ডাল আলু ডিম পেঁয়াজ মশলাপাতি কিনে আনে। তার হাতের ডিমের ঝোল আর ঝিঙে-পোস্ত খেয়ে কাকুরা বলে, 'হ্যাঁ, তুই বামুনের বেটি ব্যটে। এমন বিউটিফুল রান্না জীবনেও খাইনিরে।'

রান্নার প্রশংসায় চন্দনা এমন অভিভূত হয়ে যায় যে, পয়সার কথাটা বলতে ভুলে যায়। বাড়ি এসে মুনমুনের রান্না আলুকুমড়ো সেদ্ধ ফ্যানাভাত খেতে খেতে তার মনে পড়ে পয়সার কথাটা বলতে হবে। দিনের বেলা ভাত ডাল সবজি আর রাতে রুটি তরকারি

টিপেটুপে খেলেও পঁচিশ টাকা লাগে দিনে। তা বাদে সাবান বলো, তেল বলো, মেয়েদের একটু আধটু আবদার এসবও আছে। পুজো এবার এগিয়ে, ছোটটা খেতে পেলেই খুশি, কিন্তু মুনমুন ছেলেবেলায় খুব আদর পেয়েছে, তখনও তার কপাল পোড়েনি, তাছাড়া মুনমুনকে দেখতে একটু বেশিরকম ভালো। বাদামি সিল্কের মতো একঢাল চুল, মায়ের মতো বড় বড় বাদামি চোখ, বিস্মিত ভুরু, পাতলা ওপরের ঠোঁটের নিচে গোল গোলাপি ছোট ঠোঁট, ধবধবে ফরসা রং — এমন রাজকন্যার মতো মেয়ে আধময়লা জামা গায়ে ঘোরে। মুনমুনের শুধু চেহারা নয়, মেজাজটাও রাজকন্যার মতো। ঘরে নুনভাত খাবে তবু বাইরে মাংসভাত দিলেও খাবে না। কথা যা বলে ঘরেই। বোনের সঙ্গে। মায়ের সঙ্গে। যেন এ সমাজে তার অবস্থান কোথায় আর সেটা যে তার অনুপযুক্ত এটা তার জানা হয়ে গেছে। নতুন ভাড়াটে বলে কাল রাতে রামু রজক তার নিজের হাতে রান্না করা খিচুড়ি আর মুরগির মাংস দিয়েছিল দু-বোনকেই। মুনমুন খায়নি, কিন্তু চাম্পি খেয়েছিল। রাতে রুটি ট্যাঁড়শের তরকারি খাওয়ার পরে খিচুড়ি মাংস খেয়ে চাম্পি বমি করে দিলে মুনমুন হিংস্র চোখে তাকিয়ে বলে,— 'লোভী'।

এবারে রাজকন্যা বায়না করেছে তাকে জুতো কিনে দিতে হবে। কাজের বাড়ি থেকে একজোড়া পুরনো হাওয়াই পেয়েছিল চন্দনা। হাট থেকে প্লাস্টিকের সস্তা চটি কিনে মুনমুনকে বলে, 'কোনটা নিবি? হাওয়াই চপ্পল না চটি?' শক্ত মুখে মুনমুন বলে, 'দুটোই বিচ্ছিরি।' দু-জনের দুখানা জামা কিনতেই এক-দেড়শো টাকা লাগবে—সুতোর ছিটের ফ্রক বা নাইলনের জামা কিনলেও। তার অমন সুন্দর মেয়েটার কচি পা দুটি ধুলোতে কাঁকরে মাখামাখি হয়ে থাকে তবু উপায় নেই। চাম্পি দেখতে ওর বাবার মতো– কালো, রোগা, ছোট পুঁটলির মতো নাক আর গোল গোল কালো চোখ। মোটা ঠোঁট, হাঁ বড় কিন্তু খুব বুদ্ধি ওর। মুনমুন শেখেনি, কিন্তু অ আ ক খ আর অনেকগুলো ছড়া চাম্পির মুখস্থ।

কী করে যে কী করে, চন্দনা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে যেন উড়ে চলছিল। এখানে আসার পরে তার ছন্দই বদলে গেছে। আগে সে কথা বলত ধীরে, নম্রস্বরে, ভয়ে ভয়ে বুঝি-বা, এখন সে সবসময় এত জোরে এবং এত দ্রুত কথা বলে যে, হঠাৎ শুনলে মনে হবে ঝগড়া করছে। তা ঝগড়া তো তাকে করতেই হয়। এক জায়গায় কয়লা জড়ো করে ঝুড়িতে তুলবার সময় যদি দ্যাখে বড় বড় কয়েকটা টুকরো নেই তখন চোর ধরতে পারলে হাত মুখ দুই-ই চালিয়ে সেগুলো উদ্ধার করতে হয়। নইলে চেঁচিয়ে তার চোদ্দপুরুষের পিণ্ডি চটকে দেয় সে। তাছাড়া রাস্তার কলে, তাড়া থাকলে জল আগে নেওয়া নিয়ে ঝগড়া,প্রতিবেশীর দৌরাত্ম্যে ঝগড়া .... শুধু অফিসে সে গেরস্তবাড়ির লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটি কিংবা বউটি, কাকুদেরই ঘরের মেয়ে যেন --তার ক্রমশ খসে পড়া, পুরনো চুনবালির আস্তরখসা বনেদি বাড়ির মতো ভদ্র পরিচয়টা সেখানে একরকম করে টিকে থাকে। 'বামুনের মেয়ে, ভদ্রঘরের বউ ব্যবহারেই বোঝা যায়'— হঠাৎ হঠাৎ কাকুদের এইসব আলগা স্বীকৃতিতে। অথচ তার গজেন্দ্রগমন গতিও যে কবে বদলে গেছে সে টের পায়নি। এখন তার মাথায় কাপড় নেই,

রুখু চুল হঠাৎ তেলে একটু বেশি চকচকে, পেছনে গার্টার দিয়ে একটা উঁচু খোঁপায় আটকানো, শাড়িটাও গোড়ালির অনেকটা ওপরে। আঁচল কোমরে আঁট করে গোঁজা। সাঁওতাল কামিনদের মতো সঙ্গে গামছা, তবে মাথায় না জড়িয়ে ও সেটা কাঁধে ফেলে রাখে। এ অবস্থায় দেশ গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বড় লজ্জা। তো তাই হল। 'ও বউদি, তুমি এখানে?' বলে এক বিস্মিত বাস কন্ডাকটর তাকে থামায়। 'দাদা তো, মিহিজামে ভেটিনারি হসপিটালে চাকরি করছে। পার্মেন্টি হল এবারে।'

গবরমেন্টের চাকরি সে জোটালেই বা কবে আর পার্মেন্টিও এত জলদি হল কী করে চন্দনা ভাবে। মুখে বলে—'এখানে একটা অফিসে চাকরি করি। পিওন।'

'বাচ্চারা ভালো আছে?'

'হ্যাঁ ভাই। তোমরা ভালো আছ?'

একগাল হেসে ছেলেটি ঘাড় কাত করে ঘন্টি মারে—'মিহিজাম, মিহিজাম'—হাঁকতে হাঁকতে বাস চলে যায়।

ছয়

যাবে নাকি চন্দনা মিহিজাম? খোঁজ করবে লোকটা সত্যিই চাকরি করছে কি না। ঘাড় মুচড়ে আদায় করবে খোরপোষ? আজকাল আইন নাকি মেয়েদের পক্ষে। কিন্তু কোন পথে সেই আইনের কাছে যেতে হয় তা চন্দনার জানা নেই। কাকুদের বলবে? লোক লাগাবে খবর নেবার জন্য? কিন্তু এর আগে সে তো এ-ও শুনেছে যে লোকটা দুরবস্থায় পড়েছে। মেয়েমানুষটা তাকে খেতে দেয় না, মারধোরও করে। কোনটা সত্যি? চন্দনার কেমন স্থির বিশ্বাস যে লোকটা একদিন ওর পায়ে পড়বে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে এক একদিন তার শরীর জেগে ওঠে। জ্বালা ধরে। ঘুম হয় না। লোকটা যতদিন তেমন বিগড়ায়নি, সোহাগ করত খুব। চন্দনা নিজেকেই যেন জানত না। নিজের শরীরকেই চিনত না। শরীরের কোথায় কোথায় আনন্দের খনি লুকিয়ে আছে তা তো ওই মানুষটাই জানিয়েছিল। এখন ভাবে কী শয়তান। এক মেয়ের শরীরের গন্ধ নিয়ে কেমন অনায়াসে অন্য মেয়ের শরীরে চলে যায়। নাহ্, চন্দনা আর তার খোঁজ করবে না। এ মাসটাও বোধহয় ধার করেই চালাতে হবে। সামনের মাসেই তো বারোশো, পাঁচশো মোট সতেরোশো টাকা পাবে; রান্নার জন্য কাকুরা কি একশো টাকা দেবে না?

হঠাৎ তার কান খাড়া হয়ে ওঠে। বাইরে পরিচিত শব্দ। সাইকেলের। ফিসফাস কথার। সে আস্তে আস্তে ওঠে। কপাট ফাঁক করে শরীর গলিয়ে দেয় বাইরে। ঠিক, যা ভেবেছে তাই। পাঁচ-ছ-টা সাইকেলে এক বোরা দু-বোরা কয়লা নিয়ে ঠেলে চলেছে ছেলেরা। শরীর টান টান ঝুঁকে যায় সামনে, পেছনের পায়ে সমস্ত শক্তি সংহত করে সেই শক্তিকে নিয়ে আসে দুই বাহুতে। ফুসফুস ফুলে ওঠে অক্সিজেনে, নাসারন্ধ্রে জমে থাকে রেণু রেণু কালো হিরে ...... টিপ টিপ বৃষ্টির গুঁড়ো আর ঘামে তাদের আপাদমস্তক ভেজা। চন্দনা বেড়াল পায়ে

এগোয় — 'অ্যাই বিশু, খাদান খুইলল?'

'তুমরা পাইরবে না। আর কদিন সবুর করো —আবার যাবে। এখুন কষ্টে, তাড়া খেয়ে এই কটি বোরা আইনলুম। পেট যে চলে না।' একে একে যেন মানুষ নয় প্রেতচ্ছায়া সব চলে যায় ডিপোর দিকে। 'ডিপোর মালিককে কেউ ধরবে না। যত মার খাব আমরা।' থুঃ করে একদলা থুথু ফেলে ও। কার উদ্দেশে, কী উদ্দেশ্যে, তা না-জেনেই। দরজা বন্ধ করে ওতেই হেলান দিয়ে বসলে ক্যাঁচ করে ওঠে নড়বড়ে দরজাটা। হাতড়ে হাতড়ে কুপিটা জ্বালে। ছোট বাটি করে চা খায়। চা খেতে খেতে মনটা হালকা হয়ে যায়। ঘুমন্ত মেয়েদুটির দিকে তাকায়। আলোতে আর চা বানানোর হালকা আওয়াজেই মুনমুন উঠে পড়ে। রাজকন্যার মতো মরালগ্রীবা কাত করে বলে—'খাদে যাবে আজ মা?'

'যাব রে বেটা, আজ নয়, ক'দিন পরে। তুই ঘুমা।' বলে ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে চা নিয়ে ও বাইরে আসে — আকাশ যেদিকে পরিষ্কার হয়ে এসেছে, সেখানে মস্ত বড় একটা তারা ঝকঝকে নীলের মাঝখানে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। ওইখানেই আজকের সূর্য উঠবে। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে চন্দনা রাজকন্যার মায়ের মতো হেঁটে ঘরে গেল।

পরিচয় ১৯৯৭

অনীশ্বর

১/ উৎস

এ কাহিনীটি আমি ঈশার মুখে শুনি। ঈশা হল ঈশ্বর গুপ্ত, আমার পুরনো বন্ধু। একেবারে বন্ধুত্ব হবার বয়সেই আমাদের আলাপ। তারপরে মাঝখানে বহুবছর দেখাসাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ আবার দেখা। তারপর থেকেই মাঝে মাঝেই দেখা হয়। তুমুল আড্ডা হয়। টেলিফোনে ঝগড়া হয়। চিঠিতে ভাব হয়। যেন দু-জনের বয়স বাড়েনি। আমার চেহারায় বয়স তার অল্প-স্বল্প ছাপ রাখলেও ঈশা তেমনি আছে। মুক্ত (ফ্রিল্যান্স) সাংবাদিকতা করে। ভালো ছবি তোলে। একসময় কবিতা লিখত এখন সেসব ছেড়ে দিয়েছে। আমি গল্প উপন্যাস লিখি জেনে মাঝে মাঝে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে যায়। বলে –'তুমি শোনো। কাজে লাগতেও পারে।'

'তুমি লিখলেই পারো। সাংবাদিক লেখা তো লিখতেই হয়।'

'ধুস্‌স্‌। ওসব আবার লেখা। পড়ো নাকি? '

'কখনও কখনও পড়তে হয় বৈকি। যা বাজে লেখো!'

'তাহলেই বোঝ।' বলে আমার হাতটা ধরে রাখে অনেকক্ষণ।

'কী হল?'

'ঘড়ি দেখছি। আমার ঘড়িটা আজ পরতে ভুলে গেছি।'

ফোনে বলা ছিল। কলকাতা গেলে ওকে ফোন করি। ঈশা পেশায় অধ্যাপক। শহরতলীর একটা স্পনসর্ড কলেজে ইংরেজি পড়ায়।

দরজা খুলে দিল ঈশার বউ। শালোয়ার কামিজ পরা, বোধহয় বেরোবে।

'এত দেরি করলে? ফ্লাস্কে কফি আছে। তারা আজ আসেনি। রান্না করা আছে, নিজে নিয়ে খেতে হবে কিন্তু, আমার আজ নেমন্তন্ন।'

ঈশার ছেলে তাতা গেছে মামার বাড়ি। কফি নিয়ে আমরা মাদুর পেতে বসলাম ব্যালকনিতে।

'বলো কী বলবে?'

'দাঁড়াও অত তাড়া কিসের? তুমি থাকবে না আজ? তপতী খুব রাগ করবে ফিরে এসে তোমায় দেখতে না পেলে।'

তপতী ঈশার বউ। আমাকে খুব ভালোবাসে। তাতাও।

ওরা না থাকাতে ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, আবার মনে হচ্ছিল একটানা ঈশার কথা শোনা যাবে। সব কিছুরই প্লাস পয়েন্ট কিছু আছে।

'আচ্ছা তুমি নিউক্লিয়ার টেস্টের উপর আমার লেখাটা পড়েছিলে?'

'গল্পোটা ভালোই বানিয়েছ। ভেতরে তো ঢুকতে পারোনি।'

'না, তা পারিনি, তবে গল্প একটা পেয়েছি। বানানোর চাইতে বেশি বানানো। বিশ্বাস করা মুশকিল।'

'একটু খুলে বলো তো। হেঁয়ালি করা স্বভাব আর গেল না তোমার।' তবু ঈশার তেমন সাড়া নেই মনে হল। উঠে ঘরে চলে গেল।

ফিরল দু-প্লেট ঘুগনি নিয়ে। 'মিষ্টি তো খাবে না এটা খাও।'

'আমি কি খেতে এসেছি?'

'খেতে খেতেই শোনো।'

দুই/ ঈশার বানানো অথবা সত্যি কথা

'দুনিয়ার কেউ টের পায়নি আমাদের মতো একটা দেশ সাহস করে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাবে। যে বি ঘটনাটার পেছনে প্রবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। তা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে তুলকালামও হচ্ছে কিন্তু সে আলোচনা আলাদা। আমি তোমাকে একজন সাহসী মেয়ের কথা বলব। তার স্বপ্ন দেখার কথা বলব। আবার হয়তো এটা তার বোকামিরও গল্প।

তোমার কি মনে হয় না রূ (এভাবে একাক্ষরী করে নিয়েছে আমাকে ঈশা), এই ঘটনাটার তলায় আমাদের অন্য সমস্যাগুলো আপাতত চাপা পড়েছে?'

'তা হয়তো--', আমার উত্তর, 'কিন্তু সেটা বেশিদিনের জন্য নয়। আণবিক মৌতাত কেটে গেলেই সব সমস্যাই গেঁজিয়ে উঠবে। সামনে বাজেট -- বেশিদিন আণবিক জ্বর থাকবে না ঈশা। এখন তোমার গল্পটা বলো, নইলে মার খাবে।'

'হুঁ, আমি ওখানে কখন পৌঁছেছিলাম, কীভাবে পৌঁছেছিলাম, গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কী কী কথা বলেছিলাম, কত বাড়িতে ফাটল ধরেছে, প্রধানমন্ত্রী কবে এসেছেন, কী কী বলেছেন সবই তো লিখেছি, পড়েছ তো সেসব।'

'মম্‌হুঁ। তা এটা লেখোনি কেন?'

'শুনলেই বুঝতে পারবে।'

'ওই গ্রামে থাকার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অবশ্য বললে ব্যবস্থা হয়তো হত। কিন্তু প্রটেক্টেড জোন-এ ঢুকতে না পেরে মনটা তেতো হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিলাম মিলিটারিরা কী দিয়ে তৈরি? কোনও কথাতেই চিঁড়ে ভিজছে না, কোনও জলেই ডাল গলছে না। আমি ঈশ্বর গুপ্ত, কারোর বাঁধা নই। স্বাধীনভাবে কাজ করি। কিন্তু সব কাগজ তো একই গল্প ছাপবে। মন খারাপ নিয়ে গ্রামের কয়েকটা ছবি তুললাম -- ছাদের, দেয়ালের ফাটলের, কম খেতে পাওয়া বাচ্চাগুলোর, পাগড়িপরা মুখিয়াজির, মাস্টারজির আর হাবিলদারের। ফিরে আসছি তখনও বিকেল, মনে হচ্ছিল যা লিখব সেটা এখানে না এসেও লেখা যেত। কতজনই

তো এল গেল। হঠাৎ দেখি একটা ছোট ছেলে, বারো তেরো বছরের, হাত তুলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। গাড়ি থামিয়ে এক ধমক দিলাম রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ানোর জন্য। সে বলল, সে নাকি গাড়ি থামানোর জন্যই ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।'

কাঁহা যানা হ্যায় তেরা? ভাবলাম গাঁয়ের ছেলে হয়তো গাড়ি চাপার শখ হয়েছে।

আপকা সাথ বাবুজি!

'এবারে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। মুখখানা উৎকণ্ঠা ভরা হলেও, স্বাস্থ্যবান কিশোর। কালো ঝাঁকড়া চুলে প্লেয়ারদের মতো ফেট্টি বাঁধা সেটির রং হলুদ। একটা আলখাল্লা মতো পাঞ্জাবি পরা, সেটার পকেটে হাত ঢোকাতে গেলে ওকে শরীর বাঁকাতে হবে। পাঞ্জাবির রংও হলুদ। শাদা আধময়লা পাজামা আর পায়ে পুরনো একজোড়া নাগরা। ছোকরার হাতে একটা লাঠি; পাচন জাতীয়, মনে হয় ভেড়া ছাগল চরায়।'

'মেষপালক না রাখাল বালক?' আমার নিরীহ প্রশ্নের উত্তরে ঈশা কিছু বলে না কিন্তু ওর ঠোঁটের কুঞ্চনে স্পষ্ট বুঝি বিরক্তিটাকে স্রেফ হজম করল ও। চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে আবার বলতে শুরু করে।

'রিয়েলি ইটস অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। জাস্ট ট্রাই টু ইমাজিন। গরমে পিচের রাস্তাও ঘেমে উঠেছে। মনটা অতৃপ্তিতে ছেয়ে আছে। রাস্তার দু-ধারে দেখবার মতো কিছু নেই—শুধু বালি। শাদা এবং বাদামি বালিয়াড়ি; আর রুক্ষতার মাঝখানে সবুজ বলতে কাঁটাঝোপ, বাবলা গাছ, আর কিছু অচেনা গাছ।'

'ফল ফলে না থাকলে তুমি তো আম-কাঁঠাল গাছও চেনো না, এনিওয়ে বলে যাও।'

'এত রসভঙ্গ করছ কেন? ব্যাপারটা রহস্যময়।' ঈশা বলে।

'বেশ বলো, এই আমি চুপ করলাম।'

'ভাবছি ছেলেটাকে উঠতে দেব কি না, চিনি না, গাড়িতে আমি একা। নিজেই ড্রাইভ করছি। যোধপুরে আমার এক চেনা সাংবাদিক বন্ধু থাকেন, তাঁর গাড়িটাই নিয়ে এসেছি। বেশ শক্তপোক্ত গাড়িটা। মনে হচ্ছে নিজের গাড়িই চালাচ্ছি।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'বুঝেছি আ ...'

ঈশার চোখ সরু হতেই থেমে গেলাম ওই স্বরবর্ণে লম্বা করে টেনে 'আহ্!' বলে।

'ভাবলাম হয়তো ব্যাটা যোধপুর যাবে। একাই তো ছিলাম, একটা সঙ্গী জুটলে মন্দ হয় না। ওঠালাম ওকে। পাশে বসতেই ঘামটাম মেশা একটা তেলকুটে গন্ধ এল নাকে। গরিব ছেলেমেয়েদের গায়ে এরকম গন্ধ থাকে। তেল-টেল তো রোজ জোটে না। ফলে সাবান মেখে চান করলেও আপাদমস্তক তেল মেখে নেয় চানের পরে। অফকোর্স যেদিন জোটে।'

'তুমি নকশাল ছিলে না ছাত্রজীবনে?'

'জানোই তো, কেন খোঁচাচ্ছ? কাগুজে বাঘের মতোই কাগুজে নকশাল। খালি লিফলেট লেখা আর পোস্টার লেখা, আর বুর্জোয়া কাগজে বেনামে চিঠি প্রবন্ধ লেখা।' ঈশা লজ্জা মেশানো মধুর হাসে। হাসলে সবার মতো ওকেও সুন্দর লাগে।

'অত বিনয়ী হয়ো না বন্ধু। জেলেও গেছ আবার নকশালদেরই একটা গ্রুপের হাতে ঠেঙানি খেয়েছ।'

'তুমি খালি অফ্‌ দ্য ট্র্যাক চলে যাচ্ছ।' ঈশা ধমকায়।

'বেশ তো বলে যাও আমি শুনছি।'

'তো গাড়িতে বসেই ছেলেটার মুখচোখ বদলে গেল। আমার হাতে চাপ দিয়ে বলল, ''গাড়ি ঘুমাইয়ে সাব।''

'বলে কী? তার মানে আবার যে পথে এসেছি সে পথে ফিরতে হবে!

''কাহে?''

''আপকো হমরা সাথ যানা পড়েগা।''

'ব্যাটা হুকুম করে নাকি? তোমাকে বলতে লজ্জা নেই রূ, একটু ভয়ই পেলাম। কে জানে উগ্রপন্থী-টন্থী নয় তো।'

'ডরপুক কাঁহাকা।' আমি অস্ফুটে বলতেই ঈশা ওর পাতলা ভুরু (ওর নিখুঁত মুখশ্রীর একটিই খুঁত) তুলে বলে, 'ক্‌কী ব্যাপার! বাংলা ছেড়ে একেবারে রাষ্ট্রভাষা!'

'দুঃখিত। বলো।'

'বলতে দিচ্ছ কই, খালি ইয়ার্কি! ইয়ার্কি করে করে নিজের জীবনটার সাড়ে দেড়টা বাজিয়েছ। আচ্ছা তুমি কি কখনও সিরিয়াস হবে না?'

'বড্ড বেশি সিরিয়াস হয়ে পড়ছ ঈশা, আর এক কাপ কফি খাও। কী করব বলো আমার ওয়ে অব পুটিং থিংস এরকমই। আর বারোটা, সাড়ে দেড়টা আবার কী? জীবন তো বিজ্ঞানের সূত্র নয় যে, একই রকম হবে — সবার? তোমার মনের মতো হল না বলেই আমার সাড়ে দেড়টা বেজে গেল! ইনডিভিজুয়াল ডিফারেন্স মানবে না? মানুষ বলে কথা। সবাই নিজের মতো করে ভাবে এবং ভাবাতে চায় বলেই গণ্ডগোল। নাও, বলো তোমার সেই রহস্যময় বালক কী করল।'

'আমি ভয় এবং বিস্ময় দুই-ই গোপন করলাম। ছেলেটাকে দেখে যাই বলো রূ, রাখাল রাজার কথাই মনে হল ওর অমন উদ্ভট পোশাক সত্ত্বেও।

'ওর নাম হল কিষণ। মা জন্ম দিয়েই মরেছে, বাপ গেছে গো সাল। দিদি জামাইবাবুর কাছে থাকে। দিদির ছেলেপুলে নেই, ওর থেকে অনেকটাই বড়। বাপ খেতে-খামারে কাজ করতে গেলে ওকে মেয়ের কাছেই রেখে যেত। ছেলেপুলে নেই বলে দিদিকে সাস খুব কথা শোনায়। ছেলের আবার বিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। কী ভাগ্যি ওর জামাইবাবুরা অনেকগুলি ভাই, তাদের ছেলেমেয়েও প্রচুর। ফলে বংশে বাতি কি, রীতিমতো দেওয়ালি জ্বালাবার মতো পোতার দল আছে। তবে ইদানীং শাশুড়ি কিষণকে তাড়াতে চায় — যদি ছেলের জোতজমি যা অল্প কিছু আছে বহুর ভাই নিয়ে নেয়।

'এই জামাটা কিষণের মৃত বাবার। ওর পিরান সব ছিঁড়ে গেছে, তাই দিদি এটা বের করে দিয়েছে। গায়ে ঢোলা হওয়াতে আরাম লাগে। হাতা দুটো কেটে দিদি সিলাই করে দিয়েছে। কিন্তু

স্কুল ছোট করলে পাকিটন্ডি কাটা পড়বে। তাছাড়া তাকে তো খুব তাড়াতাড়ি জওয়ান হয়ে উঠতে হবে। তাতে দো সাল বাদেই গোড়ালি থেকে পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটুতে উঠে আসবে।

'এবার মনে মনে জায়গাটার জিওগ্রাফি ভাবো। একটা আউট লাইন মতন আমার রিপোর্টে লিখেছি। সেটা হল যে, সকাল থেকে দেখেছি — কাঁটাতারে ঘেরা ফৌজি ছাউনি আর পরমাণু বিস্ফোরণের জায়গা। তার দু-পাশে দুটি গ্রাম, তাও পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার দূরে। মরুভূমির শুরু পর্যন্ত পিচ রাস্তা। চব্বিশ বছর আগে বিস্ফোরণ ঘটানোর জায়গা থেকে ওপাশের গ্রামই কাছাকাছি ছিল। এবারে, চব্বিশ বছর পরে তিন প্লাস দুই এই পাঁচ বিস্ফোরণ ঘটেছে এ গ্রামের কাছাকাছি। চব্বিশ বছর আগে মিডিয়ার এত রমরমা ছিল না। এখন টিভির দৌলতে গাঁয়ের মানুষজনও জানে পরমাণু বিস্ফোট আর তার রিঅ্যাকশন কী। অথচ গাঁয়ের ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা এখনও নেই। ফৌজি গাড়ি ছাড়া লোকে উটের গাড়ি দেখেই অভ্যস্ত। এ হেন গাঁয়ে প্রধানমন্ত্রীজি এলেন, গাঁয়ের খবরাখবর নিলেন, মুখিয়াজি আর মাস্টারজি নতুন পাগড়ি মাথায় বেঁধে বললেন, "বো কুছ হুয়া আচ্ছাই হুয়া। আভি কোই রাষ্ট্র হমারা সাথ লড়াই কর নহি সকতা।" বোঝ, গাঁয়ে একটা ভালো স্কুল নেই, স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা নেই। পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পর্যন্ত নেই — 'রাষ্ট্র' শব্দটা কত মোহময়।'

আবার ঈশা অন্য দিকে যাচ্ছে— ওর এলোমেলো চুল ধরে একটু টানি—'কিষণের কথা বল। তারপর?'

'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, কিষণ ভেড়া চরায়। দিদিরই কয়েকটা ভেড়া আছে আর তার দেওরদেরও; সব মিলিয়ে পঁচিশ-তিরিশটা।

'এসব জায়গায় গরু ছাগল ভেড়া রাখা খুব শ্রমের ব্যাপার। কিষণ আগে স্কুলে যেত —ফোর ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। গত দুই বছর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভেড়াই চরায়। কে জানে কী খাওয়ায়। কোথায় চরায় ওগুলোকে—দু-বছরে ভেড়াগুলোর চেহারা ফিরে গেল। ভেড়ার লোম বেচে এদেরও দু-পয়সা হাতে আসত, ওর কাপড়ে বাঁধা রুটির সংখ্যাও বেড়ে গেল। ভাজির সঙ্গে আচারও মিলছিল। কিন্তু গত তিনরোজ ও ঘরেও যায়নি — পেট ভরে খায়ওনি।

"কাহেরে? কেন খাসনি?"

'রাস্তার ধারে একটা ছোট চায়ের দোকান থেকে চা, নমকিন আর লাড্ডু খাওয়ালাম ওকে। দোকানের সামনের বেঞ্চিতে যারা বসেছিল তারা বলল, "আরে পত্রকারজি, ওহ কিষণ তো পাগল হো গিয়া। উল্টা সিধা কহনে লগা।"

'কিষণের কথামতো গাড়ি ওদের গ্রামকে পেছনে ফেলে, ফৌজিদের প্রটেকটেড এরিয়া পেরিয়ে, ধরো আরও দশ-বারো কিলোমিটার চলে এল। একটা বালিয়াড়ির কাছাকাছি এসে

বলল, "অব পয়দল চলনা পড়েগা।" গাড়ি লক করে ক্যামেরা, টেপ নোটবুক, জল, টর্চ ঝুলিতে ভরে ওর সঙ্গে হেঁটে বালির পাহাড়ে উঠলাম।

'এইখানেই ও আর বেদিয়া ওদের বকরি আর ভেড়িয়া নিয়ে আসে। আই মিন আসত। তিনদিন আগেও এসেছিল।

'বেদিয়ার কথা বলি। কিষণ যা বলেছিল তা থেকে একটা ধারণা তো তৈরি হল রঞ্জু। ও এ গাঁয়ের মেয়ে নয়। সে কোথা থেকে এল কী বৃত্তান্ত কেউ জানে না। কবে কোনদিন কোন অনজানা দেশ থেকে ও চলে এসেছে আর গাঁয়ের মানুষজন ওকে খেতে পরতে দিয়েছে তার খবর কিষণ জানে না। কেউ বলে ইরানি বেদিয়ার দল ওকে ফেলে পালিয়েছে। তার ক'দিন আগেই তো এই অদ্ভুত মানুষগুলো এসেছিল। তাদের দলে বেশ কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েও ছিল। তবে তার মধ্যে বেদিয়া ছিল কি না সেটা হলফ করে কেউ বলতে পারল না। প্রথম প্রথম ছোঁয়া বাঁচিয়ে মেয়েটাকে খেতে দিত গাঁয়ের বহুরা, কিন্তু এ তো সড়ক কি কুত্তি নয় যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে রুটির টুকরো দিলে সেটা খেয়ে ল্যাজ নেড়ে চলে যাবে। সে তেমন কিছু খেল না সিরেফ তালাওতে নেমে পানি পিয়ে থাকল। তখন নানকুর মা বলল, "লাগতা হ্যায় ইয়ে কোই অচ্ছি ঘরকি বেটি। ব্যস ওহি ও রহ্ গয়ি।" নানকুর একপাল ছেলেমেয়ের মধ্যে ভিড়ে গেলেও খানিক অলগ্ হয়ে রইল ওর সুরতের জন্য। সোনালি চুল, নীল চোখ, গোরা রং আর ছিপছিপে শরীর নিয়ে বেদিয়া পারে না হেন কাজ নেই। খেজুর গাছ থেকে পাকা খেজুর পাড়া, দৌড়ে বালিয়াড়ির মাথায় ওঠা, কেউই ওর সঙ্গে পারে না।

"বয়স কত ওর?" — জিগ্যেস করতে কিষণ নাকি খানিক হাঁ করে থেকে বলল, "পুছা নহি তো।" বলে হাত দিয়ে নিজের কান অব্দি দেখিয়ে বলে, অতটা লম্বা। আন্দাজ করলাম এগারো থেকে তেরোর মধ্যেই হবে। জ্ঞান হবার পর থেকেই বেদিয়াকে ও দেখছে। মা মরা ছেলে, বাপ খেতমজুর। ছেলের দিকে কড়া নজর ছিল বাপের, ফলে কিষণ একটু ভিতু পন্তুনেরই ছিল। বেদিয়াকে দেখে ওর তাক লেগে যেত। বাপ মরার পর ভেড়া চরাতে গিয়ে বেদিয়ার কাছাকাছি আসে ও। বেদিয়ার কোলে প্রায়ই একটা ভেড়ার বাচ্চা থাকত, গলায় ঘণ্টি বাঁধা। বেদিয়া বলত, "ইসকা নাম হ্যায় রেশম। দেখো, কিতনা নরম রেশম যৈসা।"

'এদিকে, আগেই বলেছি, গরু ছাগল পোষা বেশ ঝামেলা। উট তার চাইতে কম ধকল দেয়। কাঁটা ঝোপই তার খাদ্য আর জলও তেমন কোনও সমস্যা নয়। বেদিয়ার সঙ্গ পেয়ে কিষণের খুব সুবিধা হল। সে তাকে এক আশ্চর্য জায়গায় নিয়ে গেল। যে-বিশাল বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়িয়েছি তার ওপারেই সেই আশ্চর্য জায়গা। অত লম্বা বালিয়াড়ি আর দেখিনি আমি। অবিশ্যি পড়াশুনোর জন্য একবার ইউরোপ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল — কিন্তু তাতে মরু অঞ্চলের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, এত উঁচু আর লম্বা বালির পাহাড় দেখা দূরের কথা। তবে বইতে পড়েছি।

চোখ বন্ধ করে শুনছিলাম, 'চাঁদের পাহাড়' বলে তাকাতেই ঈশার চোখ জ্বলে উঠল।

'না সেরকম ভয়ংকর কোনও কালাহারি সেটা ছিল না। আর অত উঁচু কোনও বালির পাহাড় হয়তো হয়ও না।'

'হয় না কী করে? সম্পূর্ণ সজ্ঞানে তুমি দাঁড়িয়েছিলে তার মাথায়, উঠেছিলে কষ্ট করে?' আমি বলি।

'আমিও তাই ভাবছি। যদিও তখন তেমন কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন মনে আসেনি। জায়গাটার ভয়াল কিংবা অপার্থিব সৌন্দর্য আমাকে একেবারে অন্য এক জগতের ইশারা জানাচ্ছিল। ফিলিং বোর্‌ড্?'

'একদম না।'

'তখন সূর্য অস্ত গেলেও গোধূলির আলো। পশ্চিমদিকে দূরে ফৌজিদের ক্যাম্প। তারও পরে দেখা যাচ্ছে না, তবু জানি কাঁটাতারের বেড়া। আর তার ভেতরে বহুদূরে অস্পষ্ট কীসব যেন সচল অবস্থায়।

'' পহলা ওহ দেখিয়ে বাবুজি।'' বলে কিষণ আমাকে ওদিকে দেখতেই বলেছিল। আমি বললাম, ''এরপরে অন্ধকার হয়ে যাবে, চল পাহাড়ের ওধারে নামি। ফিরতে হবে তো।'' সে যা বলল, শুনে আমি ভাবলাম সত্যিই পরমাণু বিস্ফোটে ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চৌষট্টি বছরের রিটায়ার্ড হাবিলদার ওকে তাই বলেছিল। বেদিয়া বারণ করাতে কিষণ এই জায়গার কথা কাউকে বলেনি। বেদিয়াই ওকে নিয়ে এসেছিল এখানে। ওরা ভোরে বেরিয়ে পড়ত, এই পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে ভেড়াদের ছেড়ে দিয়ে গপসপ করত। দুপুরের খাবার দু-জনে ভাগ করে খেত। এই পাহাড়ে আসা এমনিতে বারণ। এদিকে নাকি দানো আছে, ডাইন আছে, সাহস করে দু-চারজন যে আসেনি এতদিনের মধ্যে তাও নয়, কিন্তু তারা কেউ ফিরে যায়নি। রাত্তিরে কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যায়, হা হা করে হেসে ওঠে, নারী কণ্ঠের বিলাপও শোনা যায়।

'তো বেদিয়াই দলছুট এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসে। আসলে ও এসেছিল জলের খোঁজে। এদিকে হাঁটতে হাঁটতে একদিন ওর পিয়াস লাগে খুব। কী খেয়াল হল ওর যে গাঁয়ের দিকে না গিয়ে উলটোদিকে গেল। আসলে খোঁজা মানেই তো বাঁধা পথের বাইরে খোঁজা। নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে ছোটা। মহাভারতের বনপর্বে তেমনি জলের খোঁজে বেরিয়েই তো যুধিষ্ঠির সব ভাইকে মৃত দেখলেন আর বকরূপী ধর্মের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁর ক্যুইজের সব ক'টি উত্তর দিয়ে তবে তো সব ভাইদের নতুন করে পেলেন। তা আমাদের এই গল্পের নায়িকা ধর্মের সাক্ষাৎ না পেলেও জল পেয়েছিল। ওর অনেক আশ্চর্য ক্ষমতার মধ্যে এটাও ছিল উঁচু নাক আরও উঁচু করে বাতাসে ডুবিয়ে জলের গন্ধ পেত যেন ও। সেই টলটলে ঠাণ্ডা পানির ঝোরাটা ওই খুঁজে বার করে। আর পানি মিললেই গাছগাছালি, লতাগুল্ম, পশুপাখি মানুষ আসবে। তো এখানে মানুষ বলতে তো দু-জন — কিষণ আর বেদিয়া। জগৎ সংসারের কোনও জটিলতার খোঁজ রাখে না যারা, যদিও ওদের জীবন মোটেও আর পাঁচজনের মতো সোজা ছিল না। এই পাহাড়ের

মাথায় দাঁড়ালে নিষিদ্ধ এলাকার কিছু আভাস পাওয়া যায়। বাইনোকুলার থাকলে হয়তো ভালো দেখা যেত। কিন্তু কিষণের নজর খুব তীক্ষ্ণ। সে ভুরুর কাছে হাতের পাতা তুলে দিব্যি বলে দিল ফৌজিরা ওখানে কী করছে। বেদিয়া নাকি আরও ভালো পারত। বাজপাখির মতো দৃষ্টি ছিল ওর। কী করে দৃষ্টি বাড়াতে হয় ওই তো কিষণকে শিখিয়েছিল। বিস্ফোটের মাসখানেক আগে থেকেই ওরা দেখেছিল লম্বা লম্বা তার টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফৌজিদের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে তার টানা হয়েছে, ওদের অচেনা যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে টের পাওয়া যাবে না ওখানে কিছু আছে। চাঁদ যত গোল হতে থাকে ফৌজিদের ব্যস্ততা তত বাড়তে থাকে। তো কিষণ একদিন গাঁয়ের বুড়োদের জিগ্যেস করে, "চাচাজি, ওঁহ্য কেয়া হো রহা হ্যায়?" অন্যরা হো হো করে হেসে ওঠে। শুধু সীতারাম, সে কিনা কয় বরষ বাংলা বিহার মুলুক ঘুরেছে, দিল্লি গেছে, বহুত কুছ দেখেছে; কিতাব-উতাব পড়ে, বলে, "ওঁহ্য তো গরমিন্টকা পরটেকটেড প্লেস হ্যায়; কুছ কাম হো রহা হ্যায়।"

"তো কেয়া উও সিপাইলোগ গরমিন্ট হ্যায়?"

'সীতারামের শরীরটি এখন শুকিয়ে গেছে, কিন্তু গোঁফজোড়াটি পুলিশ জীবনের স্মৃতিবাহী — দু-প্রান্ত পাকিয়ে তুলে দিলে পেছনের লোক দেখতে পায়। দু-চারখানা গাঁয়ের লোক তাকে 'মোচওয়ালি পুলিস' বলেই জানে। সেই গোঁফজোড়া কিঞ্চিৎ ঝুলে পড়ে ওর প্রশ্ন শুনে — "আরে নহি নহি। গরমিন্ট তো চুনাও মে বনতা। দিল্লিমে পার্লিমিন্ট হ্যায় না? মন্ত্রীলোগ হ্যায় বহুত সারি? ও সব গরমিন্টকা আদমি।"

"তো কেয়া মন্ত্রীলোগ গরমিন্ট?"

"শায়দ নহি।"

"দিল্লি মে হ্যায় গরমিন্ট?"

'বুলাকিরাম বাঁচায় ওকে — প্রাইমারি স্কুলের মাস্টরজি।

"কেয়া তু জাসুস বননা চাহতা? বড়া আয়া হ্যায় গরমেন্টকা পতা লগানেওয়ালা। স্কুল ছোড় দিয়া কাহেরে? আরে ভেড়িয়া চরানেবালা এ বাত তু কেয়া সমঝেগা?"

"একদম বুদ্ধুরাম হ্যায় তু।"

'সেদিন জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল দিশ্বিদিক। বৈশাখের শেষ সপ্তাহ — সারাদিন গরম যেন শুষে নিয়েছে ওদের প্রাণ। খাওয়াদাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়লে বেশি রাতে বেশ ঠাণ্ডা আমেজ, হাওয়াও দিচ্ছিল — বেদিয়া আর কিষণ বালির পাহাড়ে ওঠে। কিষণ বলে, "বেদিয়া কেয়া তু জানতি গরমিন্ট কঁহা রহনেবালা?" বেদিয়া তো সব প্রশ্নের উত্তর জানে তাই বুদ্ধুরাম তার দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

"কৌনসা গরমিন্ট?" চাঁদের আলোয় মাখামাখি বেদিয়া যেন অচেনা কেউ, তেমনি অচেনা স্বরে বলে ওঠে।

"যো চুনাও মে বনতা। ওহ ফৌজি লোগোনে বিসকা হুকুম পর ইয়ে সারি কাম করনে

লগা।''

''চল জঙ্গলমে বতাতি হুঁ।'' বলে তরতর করে বেদিয়া নেমে যায়। পাহাড়ের এদিকটা কেমন পাথুরে। ওপাশে যেন বালিরই পাহাড়, এপাশে পাথর, বড় বড়, কোনও কোনওটা ঝুলে আছে, নিচে গাঢ় অন্ধকার। সেদিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছিল, বিশ্বাস করো, শুধু তাতা আর তপতীর কথা ভেবে ছেলেটার পিছু পিছু নেমে গেলাম। ওরা আমাকে কত সাহসী ভাবে! শুধু তুমি একা এই সত্যটা জানো যে আমার ভেতরে একটা ভিতু কুঁজো মানুষ থাকে।' বলে চুপ করে যায় ঈশা। আমার গলার কাছে কী যেন পিণ্ডি পাকিয়ে যায়। আমি জানি ওগুলো কথা। অনেক অনুচ্চারিত কথা। আমি ওর হাতে একটু চাপ দিই। 'বল ঈশা তারপর?'

মনে মনে বললেও ঈশা ঠিক শুনতে পায়।

'নিচে মনে হয় কোনও দুর্গের ভগ্নাবশেষ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভাঙা প্রাচীর — পাথরের ওপর বালি জমেছে তবু কোথাও কোথাও উঁচু হয়ে আছে পাথরের খিলান, গম্বুজ ছাদ সিঁড়ি। আর সেই পাথরের খাঁজে খাঁজে নাম না-জানা বুনো লতা। মাঝখানে বোধহয় বাগান, ফোয়ারা, তালাও ছিল পাঁচিলের পাশে ব্যারাক মতো ছিল এককালে এখন সেগুলো পাথরের টিবি বললেই চলে। একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। বেশ ঝিম ধরানো। মনে হল ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। গন্ধ পাচ্ছি কিন্তু ফুলটা দেখতে পাচ্ছি না। জংলি ফুল ফুটে আছে। কিছু ক্যাকটাসও আছে। বুনো গোলাপের গাছ আছে ফুল নেই। কিষণকে জিগ্যেস করতেই ও হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাল। এ যে বাবলা গাছ। বৃক্ষ বললেই চলে। থোকা থোকা শাদা ফুলে ছেয়ে আছে। হাওয়াতেই ঝরে পড়ছে মাটিতে, উড়ে যাচ্ছে ঝোপঝাড়ের ওপর — এই ফুল থেকেই অমন গন্ধ তাহলে? সেই ঝিমঝিম গন্ধের ভেতর দিয়ে ছেলেটার পেছন পেছন গিয়ে আবারও উঠতে হল। অত উঁচুতে না হলেও এটাও পাহাড়। আবছা চাঁদের আলোয় বুঝলাম জায়গাটা একটা ছোটখাট উপত্যকা মতো। একদিকই খোলা, দুর্গের সামনে, সেখানে এককালে পাথরের নিরেট দেওয়াল ছিল। এখন শুধু স্তূপ।

'কৃষ্ণপক্ষ, যদিও চাঁদ তখনও অনেকখানিই নিজের আকৃতিতে আছে একপাশ দিয়ে খানিক ক্ষয়ে গেছে শুধু। তারার আলোও বোঝা যাচ্ছে। পূর্ণিমার পরে বেশ ক'টা দিন কেটে গেছে তো। গোটা আকাশ যেন উপুড় হয়ে পড়েছে এই দৃশ্যের ওপর। ভয় ভয় ভাবটা কখন যে কেটে গেছে টের পাইনি। আমরা যেখান দিয়ে উঠছিলাম সেটা একটা শুকনো ঝর্নার পাশ দিয়ে পায়ে চলা সরু পথ। বোধহয় বেদিয়া আর কিষণের পায়ে পায়ে তৈরি। সাতশো তিরিশ দিন দু-জন মানুষ কতবার যাওয়া আসা করলে এই পথ তৈরি হয় তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, কিন্তু মনে হচ্ছিল ওরা না-এলে এই ভাঙা দুর্গ, অদ্ভুত অরণ্য আর পাহাড়, এদের অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যেত। সেই ঝিমঝিম মিষ্টি গন্ধটা তীব্র হয়ে উঠেছে, আর মনে হচ্ছিল এই বনের গাছ পাতা ঘাস আবছা আলো সবাই যেন কী এক দুঃখে চুপ করে আছে। আকাশের দিকে না-তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম, একজনের অতন্দ্র দৃষ্টি লক্ষ

কোটি তারা হয়ে আমাদের দেখছে। সেই সময়, হঠাৎ কী কাণ্ড দেখ, তোমার কথা মনে পড়ল না। তুমি যে সাহস জোগাবে সে জন্য নয়, মনে হল এই অভিজ্ঞতা একমাত্র তোমার সঙ্গেই ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।' — বলে আচমকা থেমে গিয়ে ঈশা কাশতে শুরু করল। একটু যেন ঝাপসা দেখছিলাম, ওদিকে মুখ ফিরিয়ে আঁচলে মুখ চোখ মুছে ওকে জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিলাম।

'থ্যাঙ্ক য়্যু।' বলে এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে নিল ও। আর সেইটুকু সময়ের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনল কথনের মধ্যে।

'আমার কোনও ক্ষমতাই নেই শব্দে বা রঙে সে ছবি আঁকি। আমি শুধু ঘটনাই বলছি। অনেকটা উঠে ঝোরার উৎসমুখে এলাম। একটা গুহার হাঁ মুখ। চাঁদের বা সূর্যের আলো সেখানে পৌঁছয় না বুঝলাম। টর্চ জ্বেলে দেখলাম কিছুটা গিয়ে গুহাটা ডানদিকে বেঁকে গেছে। আশ্চর্য এই যে, ঝোরাটায় জল না থাকলেও, শুকনো খটখট করলেও, অল্পদিন আগেও জল ছিল বেশ বোঝা যায়। গুহার দেয়ালে শ্যাওলা, আর পাথরগুলো দেখলেও বোঝা যায়। কিষণ আমার কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে দু-পা এগিয়ে আমাকে হাতের ইশারায় ডাকল, "আইয়ে বাবুজি, জরা সমহালকে; ওহ দেখিয়ে।" আমিও পিছল নুড়ি পাথর ডিঙিয়ে খুব সাবধানে গলা বাড়িয়ে টর্চের আলো যেখানে স্থির সেখানে তাকালাম। হা ঈশ্বর। গুহার মুখের সামান্য দূরে একটা বিরাট গর্ত না বলে গহ্বর বলাই উচিত, মনে হল ভেতরের কোনও আলোড়নে হঠাৎ-ই সৃষ্টি হয়েছে। গুহার মেঝে ও দু-ধারের দেওয়ালেও বড় বড় ফাটল। কিষণ আমার হাতে টর্চ দিয়ে বুনো জন্তুর মতো টপাটপ লাফ দিয়ে সেই গহ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকল, "আইয়ে বাবুজি, দেখিয়ে।"

'আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! কী মতলব ওর? শেষে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে না তো? ভাবতে ভাবতেই কে যেন খুব বিশ্রীভাবে ফ্যাঁচ করে হেসে ফেলল যেন ঠাট্টা করছে, আর অনেক দূর থেকে যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ খটাখট খটাখট। দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা হাওয়া পাক খেয়ে যেতেই গাছপালার ভেতর থেকে একটা হায় হায় রব উঠে এল। যা থাকে কপালে বলে আমি পাথর টাথর ডিঙিয়ে ছেলেটার পাশে এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে টর্চের আলো ফেললাম —

'গর্তই বলব এখন — বড় কুয়ো বা ইঁদারার মতো তার মুখটা, যদিও কিঞ্চিৎ এবড়ো খেবড়ো। প্রায় পনেরো-ষোলো ফুট নিচে ভেজা ভেজা কাদা কিংবা বালি মিশ্রিত কাদার একধার দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ মতো নেমে গেছে, টর্চের আলোয় আর দেখা গেল না। ভুল কি না জানি না,কাদার মাঝখানে একটু বসা যেন অনেক ওপর থেকে থেকে ভারি কিছু একটা পড়েছে আর কত গুলো পায়ের ছাপ, অস্পষ্ট সেই সুড়ঙ্গের দিকে চলে গেছে। গর্তটা গুহার ওয়াল টু ওয়াল ফলে ডানদিকে বেঁকে সেটা কোথায় গেছে জানা গেল না।

"হামরা সারি ভেড়িয়া ওঁহা ঘুষ গয়ে। অর বাপস্ নহি লোটে। অউর, অউর ..." বলে কিষণ দু-হাতের পাতায় মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে।

"অউর কেয়া কিষণ? বেদিয়া কঁহা গয়ী?" সে আর কোনও কথা বলে না বা বলতে পারে না — ইশারায় শুধু সেই গহ্বরটি দেখায়। রুদ্র, মুখের ভাষা দিয়ে আমরা কতটুকু বলতে পারি? ভাষা দিয়ে বড়জোর আড়াল করতে পারি, কিন্তু শরীরের ভাষা এত কালারফুল, এত তার ডাইমেনশান ও তীব্রতা যে, সে নীরবতাকে মুখর করে তোলে। তেমনি কান্নায় ভেঙে পড়া কিষণের হাতের ভাষায় বুঝলাম বেদিয়াও ওই অতলে তলিয়ে গেছে।'...

'চল খেয়ে নিই, নইলে খাওয়াই হবে না তোমার। হাতমুখ ধুয়ে তুমি বোসো, আমি চট করে চান করে আসি।'

শীত গ্রীষ্ম ঈশার দু-বেলা চানের অভ্যাস। তার ওপরে কলকাতার গরম। আমারও ঘামে শরীর ভিজে গেছে। কিন্তু আমি চান করব নিজের আস্তানায় ফিরে। একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা হাত পা মুছে নিয়ে দু-জনে নীরবেই আহার পর্ব সমাধা করলাম। ঈশা ভাত আর চিকেন। আমি রুটি আর সবজি।

'আইসক্রিম খাও।' বলে ঈশা একটা বিশাল আইসক্রিম দেয় আমার সামনে। বেসটা পেস্ট্রি, ধারে ধারে পেস্তা বাদামের সমারোহ। ঈশা জানে আমি আইসক্রিম খেতে ভালোবাসি।

'ওরে বাবা, এ যে বিশাল দামি জিনিস!'

'তোমার চাইতে নয়। শোনো বাকিটুকু।' বলে ঈশা নিজেও চামচ দিয়ে একটু আইসক্রিম মুখে দেয়।

'ওখান থেকে প্রায় কিষণের হাত ধরেই বেরোলাম। খোয়াটার পাশ দিয়েই নামলাম। ওটা শেষ হয়েছে একটা এককালে বাঁধানো তালাওতে এসে। তালাও-এর নিচে তখনও কিছু জল আছে। খরগোশ বেজি আরও কিছু ছোট ছোট জানোয়ার জল খাচ্ছে দেখলাম।

"ইয়ে পানি ভি নহি রহেগি, সব জানবার মর যায়েগা — হম কেয়া করেঙ্গে?"

'ঘোড়ার খুরের শব্দের কথা বললাম কিষণকে। "ওহ কুছ নহি বাবুজি জানবর কা আবাজ।"

'সত্যিই মিছিমিছি ভয় পেয়েছিলাম। পুরনো কেল্লা হয়তো বাদুড় চামচিকেতে বোঝাই। রাত্রে ওরা ডানা ঝটপটিয়ে বেরোয়, পেটের টানেই বেরোয় আর ফাঁকা ঘরে তার ইকো হয়। শজারু দৌড়ে গেলেও তো ঝুমঝুম আওয়াজ হয়। শকুন বা অন্য কোনও নিশাচর পাখির চেঁচানি নারী কণ্ঠের বিলাপ মনে হয়। কিন্তু সাপ তো আছে — অজগর? শুনে কিষণ বাচ্চা ছেলের মতো হেসে উঠল। "ছোটামোটা নাগ হ্যায় লেকিন ওহ কুছ নহি করেগা।" এখানে কোনও হিংসা নেই। পাপ নেই। খিদে পেলে সাপ ইঁদুর কিংবা ব্যাঙ খায়, কিন্তু সে তো জীবজগতের নিয়ম।

'তো বাবলা গাছের তলায় .....'

'আর য়্যু শিয়োর দোজ আর অ্যাকাশিয়াস?'

'হ্যাঁ বাবা, ছেলেবেলায় আমরা বলতাম জিলাবি গাছ। ফলগুলো বাঁকা, জিলিপির

মতো। পাকলে লালচে হয়— মিষ্টি খেতে।'

'গো অন।'

'বাবলা গাছের নিচে বেশ একটা চ্যাটালো পরিষ্কার পাথরে শুয়ে পড়েছি দু-জনে। দিনে গরম হলেও রাত্তিরটা বেশ প্লিজিং ঠাণ্ডা মনে হল। বিস্কুট আর লাড্ডু দিয়ে নৈশভোজন করেছি। একেবারে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রাত কাটানো, তাও এরকম এক খণ্ডহরের মধ্যে। ওহ্‌ সাব্লাইম! আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার, কালপুরুষ বৃশ্চিক সপ্তর্ষিমণ্ডল কেমন ধীরে ধীরে তাদের রুটিন মাফিক আকাশের একদিক থেকে আর একদিক চলে যাচ্ছে। আমরাও তো চলেছি, মহাশূন্যের মধ্যে আমাদের গ্যালাক্সির একপাশে আমরা এই সোলার সিস্টেমের এক গ্রহের অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। কী আছে ওই ছায়াপথের ওধারে? এসব ভাবছি আর তোমার কথা মনে হচ্ছে — সেই যে তুমি বলেছিলে নাকি লিখেছিলে মানুষ খুব ছোট আবার মানুষই খুব বড়, যেন সে তার নিজের শরীরে আঁটে না। তাতা আর তপুর জন্য খুব মন খারাপ লাগছিল। ছেলেটো অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর যা বলল তা হল এই:

"সেই রাতে ওরা এই পাথরে বসে গল্প করেছিল। কিষণ বলেছিল ঘর যাবি না তো নানকুর মা তোকে খুঁজবে না? শাদি হবে না তোর। শুনে বেদিয়ার হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল — 'আমার বিয়ে কার সঙ্গে? কোনও মরদের সাথে আমার শাদি হবার নয়। আমাকে কেউ পুছ করবে না কোথায় ছিলাম, কী খেলাম। তোকেও তো কেউ বলবে না কোথায় ছিলি রাতভর? তোর দিদি লুকিয়ে কাঁদবে। দিদির সাস বজরংবালীর মন্দিরে পুজো দেবে। তোর জিজাজি শ্বাস ছেড়ে বলবে বেঁচে গেলাম। দেখ পুনম কি রাত কিতনি সুন্দর। এই গাছপালা, জানবর, এই খোরা এমনকি এই খণ্ডহরও আমাদের ভালোবাসে। ওঁহা তো মেরা দম ঘুঁট যাতা, নানকুচাচা কা ঘরমে।'

'তাহলে এখন বল গরমিন্ট কী চিজ আছে?'

'চুনাওতে যে গরমিন্ট বানায় তা শুধু পাপ আর হিংসাকে রাজা করে। তুই একে ধরতে পারবি না, ছুঁতে পারবি না। সব লোককে পুছ কর কেয়া আপ গরমিন্ট হ্যায়? তো সব কোই বোলেগা হাম গরমিন্ট নহি মগর গরমিন্টকা আদমি। সব শয়তান মিলজুল করকে এক চালাকি বনা লিয়া উসিকা নাম হ্যায় গরমিন্ট। ইয়ে করেগা, উও করেগা মগর ভলা তো কুছ নহি হোতা।' আরও বলে চলে বেদিয়া। 'দেখ তোর মা বাপ নেই, আমারো নেই — গরমিন্ট কেন আমাদের মা বাপ হয় না? আঠাঠারো সাল উমর হলে তুই-ও ভোট দিবি। আমিও দেব। মগর কিউ? কাহেরে?"

'এত কথা বলেছিল বেদিয়া! অসম্ভব! এতটুকু মেয়ে! না না, ঈশা, তুমি বানাচ্ছ।' আমি বলি।

'বিলিভ মি, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

'ঠিকাছে। বলো।'

'সেদিন শেষরাতে গ্রামের দিকে রওনা দেয় ওরা। রাতের অনেকটা সময় ওরা

বিস্ফোরণের প্রস্তুতিপর্ব অস্পষ্টভাবে দেখেছিল — আলো, ফৌজিদের চলাফেরা, একটা নিঃশব্দ চাঞ্চল্য, কিন্তু ওদের পক্ষে তো অনুমান করা সম্ভব না, কিছুতেই না, যতই দৈব ক্ষমতার স্ফুরণ ঘটুক বেদিয়ার মধ্যে যে ওখানে কী হতে চলেছে, তবু আদিম ও প্রকৃতিজ সরলতায় নিহিত যে জ্ঞান, বা সহজাত, এবং পরম্পরা অর্জিত, অভিজ্ঞতাবাহী, সেই জ্ঞানে আধুনিক সভ্যতা-বহির্ভূত মানুষও অনেক গূঢ় রহস্যের ঠিকানা ও উৎস জানে, এবং এও অনেকটা তেমন জানাও বলতে পার, ঝড় আসার আগে পাখিরা যেমন টের পায়; বৃষ্টির গন্ধ অনেক আগে পায় পিঁপড়েরা। আবার পাখিদের কিছু আগাম করবার নেই শঙ্কায় ডানা ঝাপটানো অথবা ভয়ার্ত রব তোলা ছাড়া, বেদিয়ারও কিছু করবার ছিল না শঙ্কিত আর আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া। তার তো তেমন ক্ষমতা ছিল না যেমন থাকে পিঁপড়েদের ডিমগুলি নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার। কিন্তু গ্রামে ফিরতে তাদের একটু দেরিই হয়েছিল। ততক্ষণে ফৌজিরা গাঁও ঘিরে ফেলেছে। কেউ ঢুকতে পারছে না। কেউ বেরোতেও পারছে না। ওরা দূর থেকে দেখেই আবার ফিরে যায়। বেদিয়া বলেছিল যেসব কথা — তাকে একটু আমাদের চিন্তার যোগ্য করে নিলে এইরকমই দাঁড়ায় যে, ও ভয় পেয়েছিল। পাখিদের মতো ছটফট করে উঠেছিল এই বলে যে, যো কুছ হো রহা হ্যায়, সব হি ভগওয়ান কা খিলাফ হো রহা হ্যায়। কিসিকা ভালা নহি হোগা অন্ত মে। কুছ করনে হোগা কিষণ।

'সেই মধ্য দুপুরে ফোস্কা পড়া পায়ে ওরা আকাশে তিনটি ভয়ংকর নারকীয় মেঘ দেখেছিল। মাটি পাথর উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ধরিত্রীগর্ভ থেকে, কোটি কোটি বছর আগে বা এখনও মহাশূন্যে এমন প্রবল বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হয় পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ, যা থেকে উৎসারিত হয় তেমনি শক্তি, যা এই সৃষ্টির জনক ও ধারক এবং বাহক। ছায়াপথের মধ্যবয়সি যে মাঝারি নক্ষত্রটি এই পৃথিবীর প্রাণ অস্তিত্বের কারণ, তার অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ বন্ধ হয়ে গেলে কী হবে তা আমাদের মতো সভ্য মানুষরাই সব চাইতে বেশি জানি। কিন্তু বেদিয়ার মতো করে ভাবলে বলতে পারি, এসবই সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতির নিয়ম, ঈশ্বরের বিধান। কিন্তু যে-ডালে বসেছি, সে ডালটি যদি কাটি সেটাই তো ভগওয়ানকা খিলাফ, আই মিন ঈশ্বরের বিপরীত; কল্যাণ ও ভালোবাসার বিপরীত। এই অসহায় নিষ্পাপ বালক-বালিকাদের কী-ই বা করবার ছিল? যেখানে আমরা নিরুপায়। আত্মনিধনের সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছি।

'তৃতীয় দিনের দুটি বিস্ফোরণ আর তেমন বিস্ময় ও আলোড়ন জাগায় না। যো কুছ হুয়া ঠিক হুয়া — মুখিয়াজি তাই বলেন। যদিও একথা জানাতে ভোলেন না — জলের পাইপ ফেটে যাওয়াতে পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ, ফলে তালাও-এর জল খেতে হচ্ছে। সে জল তো গরু ভেড়া ছাগল উটও খায়। বিজ্ঞানীর দল যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে বলেছেন — বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা নেই। তাহলে মেঘটা কোন দেশের কোন বাতাসে তেজস্ক্রিয় ভস্ম ভরা বৃষ্টি হয়ে বাহিত হবে? কোন নদীতে মিশবে? কোন ফসলের মাটিতে মিশবে কে বলবে? সেকালের বিষকন্যার গল্প শুনেছ তো? সুন্দরী নৃত্য-গীত পটিয়সী নারীকে অল্প মাত্রায় বিষ খাইয়ে খাইয়ে 'টাইফয়েড মেরি'-র মতো ভয়ংকর করে তোলা হত, তেমনি

সেই মেঘ অন্য মেঘ, জলসঞ্চারী মেঘের দলে মিশে কত নদী নালা খাল বিল ভরতে ভরতে যাবে — কত ফসলের খেতে মাটির ভেতর সেঁদিয়ে যাবে? হুঁ! সামান্য পাইপ কাটবে, পাথরের দেওয়াল ফাটবে এটাই বোঝেনি। বুঝলে বিকল্প জল সরবরাহের ব্যবস্থা করত। আর যদি বুঝেও সাধারণ মানুষের কথা ভাবেনি, তাহলে এদের দ্বীপান্তরে পাঠানো উচিত।'

'এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ঈশা? এই ক্রোধের কোনও মূল্য নেই।' গ্লাসটা এগিয়ে দিলে ঈশা এক নিঃশ্বাসে খালি করে বলে, 'আ আ! শোনো— তারপর তো নানা কাণ্ড হল - — সেসব রিপোর্ট সব কাগজেই বেরিয়েছে। দিন কতক পরে বেদিয়া আর কিষণ তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে সেই ঝোরা, গাছ-গাছালি ভরা খণ্ডহরে গেছে। ওরা অবশ্য অন্য একটা পথ আবিষ্কার করে যাতে বালির পাহাড়টা এড়ানো যায়। সেটা দিয়ে ঝোরার কাছেই ওঠা যেত। তো সেদিন যেতে যেতে বেদিয়া বলছিল এবার এই উপত্যকার কথা ও সবাইকে বলবে। গাঁয়ের লোকের এত জলকষ্ট ও সইতে পারছে না। কিন্তু তেমন ভরসা পাচ্ছে না- - হয়তো এই পানিকে ওরা নোংরা করে দেবে। জন্তুজানোয়ার মেরে দেবে। গাছপালা কেটে চুলহা জ্বালাবে। এভাবেই কয়েকটা দিন গেল।

'তিনদিন আগে, ওরা তখন ঠিক করেছে, পরের দিন ওরা গাঁয়ের লোককে সব জানাবে কেননা তখনও পর্যন্ত পাইপ মেরামতের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না, ট্যাঙ্কারে করেও জল আনার একটা সাময়িক ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়নি। এদিকে তালাও-এর জল খেয়ে গলা জ্বলছে গোটা গাঁয়ের। চব্বিশ বছর আগের কথা যাদের মনে আছে তারা জানে এরপরে চামড়া জ্বলবে, পেটের গোলমাল হবে। ফুসকুড়ি আর বিষফোঁড়ায় গোটা শরীরে জ্বলন শুরু হবে। মরেও যেতে পারে কেউ, তবে যারা বেঁচে থাকবে তাদের শরীরের ভেতরে কোন অঙ্গ যে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাবে তা মৃত্যুর আগে টের পাওয়া যাবে না।

"তাই বেদিয়া বলল, চল কিষণ আজ শেষবারের মতো জায়গাটা দেখে নিই।"

'ঝোরাটার পাশ দিয়ে প্রথমে ভেড়াগুলো, পেছন পেছন বেদিয়া আর কিষণ উঠে আসে। আর উঠে এসে ওরা ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়। ঝোরাটা শুকিয়ে গেছে। তালাও-এর পানিও বহুত কমে গেছে। তলার বালি আর নুড়িগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভেড়ার দলও ঘাস খাওয়া ভুলে ওদের আগে আগে উঠে এল এই গুহামুখে। গুহার ভেতর থেকে জলধারা তখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি। একটা ভেজা ভেজা তখনও ছিল। তো ভেড়ার পাল কিছুক্ষণ ওখানে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে গুহার মেঝেটা ফেটে ওই কুয়োর মতো গর্তটা তৈরি হল আর কে জানে চমকে গিয়ে বা ভয় পেয়ে ভেড়াগুলো ওই মরণকূপে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। কিষণ আর বেদিয়ার হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতেই বেদিয়া রেশমকে কিষণের কোলে দিয়ে বলল — "আমি আর ফিরব নারে। আমিও ওই কুয়ায় ঝাঁপ দেব। দেখ দেখ কিষণ, ভেড়িয়াগুলো নেই। বিলকুল গায়েব হো গয়ে!" কিষণ নিচে তাকিয়ে দেখে সত্যিই ভেড়াগুলো নেই। বেদিয়া বলে ওঠে —"সমঝ গয়ি — ওহাঁ পানি হ্যায়। ইসলিয়ে সারে ভেড়িয়া ওঁহা ঘুষ গয়ে। ও দেখ?"

'কুয়োটার এক দেয়ালে একটা সুড়ঙ্গপথের মুখ দেখা যাচ্ছে। "মেরি কসম কিষণ, খবরদার মৎ আ মেরা পিছা", বলে বেদিয়া এক লাফ দিয়ে নিচে পড়ে। "অব দে মেরা রেশম কো।" ঘাগরা ছড়িয়ে দিলে রেশম টুপ করে ওর কোলে পড়ে। "তু ঘর যা, সব লোগোসে বাত কর, বতা দে মেরি বারে মে, ম্যায় পানি কি তালাশমে যা রহি হুঁ। যব তক পানি না মিলে ম্যায় ঢুঁড়ুঙ্গি।" কিষণ চেঁচিয়ে ওঠে, কেঁদে ওঠে, বুনো লতা পাকিয়ে দড়ি বানায়। যা দিয়ে ওরা ঘাস লকড়ি বেঁধে নিয়ে যায়। একটা ভারি কাঠের টুকরো বেঁধে নামিয়ে দেয় — "উঠে আয় বেদিয়া, উঠে আয়, ওখানে জল নেই পরমাণু বিস্ফোটের আগ আছে, গ্যাস আছে, তুই মরে যাবি।"

'বেদিয়া রেশমকে ওই কাদাগোলা জল খাওয়ায়। বলে, "ধরতি কি অন্দর শান্তি হ্যায় কিষণ। অব তো মেরি শাদি হোগি মওত্ কে সাথ। পানি হ্যায়, ম্যায় লাউঙ্গি ওহ্ পানি।" বলতে বলতে সুড়ঙ্গপথে রেশমকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় বালিকা। কিষণ ভেবেছিল ও-ও লাফ দিয়ে নিচে পড়বে, কিন্তু ভয় হল। ওর মনে হল ধরতি কি অন্দর আগ হ্যায়। তাছাড়া গাঁয়ের লোককে বলতে হবে। সে তাই নেমে আসে। নেমে এসে দেখে ওদের গোপন পথটা পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। ও বালির পাহাড় পেরিয়ে টলতে টলতে গাঁয়ে আসে, ওর লাল, ফুলে-ওঠা চোখ, তেতে-ওঠা শরীর আর ভাঙা ভাঙা গলার আজগুবি কহানি কেউ বিসোয়াস করে না। সবাই বলে ভেড়িয়া নিয়ে বেদিয়া কোথাও ভেগে গেছে। জাতজন্মের ঠিক নেই , ও ছোকরি তো চোর বদমাশ হবেই। সবাই মিলে নানকুর মাকে গালি দেয়। নানকুকে গালি দেয়। আর জামাইবাবু এসে এ-গালে ও-গালে দুই থাপ্পড় দিলে কিষণ চোখ উলটে আঁ আঁ করে মুখে ফেনা তুলে পড়ে যায়। তো 'বেদিয়ানে উসকো জাদু কিয়া' বলে ওর দিদির সাস গুনিন দিয়ে ঝাড়ু লাগায়। তালাও-এর এক কলসি পানি ঢাললে ওর জ্ঞান ফেরে। আর রিটায়ার্ড হাবিলদার বলে — ছোকরা পরমাণু বিস্ফোটের রি-অ্যাকশনে পাগল হয়ে গেছে। টিল মেরে কুকুর-তাড়া করে ওরই খেলার সাথীরা। সেই থেকে ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

'আমার কাহিনী এটুকুই।' বলে ঈশা হাতের ওপর মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে।

৩/লেখকের স্বাধীনতা

'বুঝলাম তোমার এ গল্প কেউ ছাপবে না। কিন্তু আমি লিখলেও তো না ছাপা হতে পারে।'

'ছাপানোর প্রোবাবিলিটি নিঃসন্দেহে তোমার লেখার বেশি। এক, তুমি একজন ক্রিয়েটিভ রাইটার। ঈশ্বরের মতো তোমার সৃষ্টি ক্ষমতা। সেখানে আমি একজন রিপোর্টার। দু-নম্বর হল, তুমি একা এবং নিঃসঙ্গ লেখক। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক দাসত্বে তুমি বাঁধা নও। স্বাধীন তোমার লেখনী। সুতরাং এগিয়ে যাও। মাভৈঃ।'

'অত সোজা নয় বন্ধু, চলো ওঠো আমাকে পৌঁছে দেবে। তপতী এসে গেছে।'

'ও মা তুমি থাকবে না? তাতা কাল দুপুরেই এসে যাবে। যাহ্।' বলে তপতী ঠোঁট

কোলায়। কী সুন্দর যে ওকে দেখতে।

'অন্যদিন তপতী।'

'প্রমিস?'

'প্রমিস।'

ভাইয়ের ফ্ল্যাটের সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ঈশা বলে 'কী হল তোমার? তুমি যে বলো, একজন সম্পাদক শুধু লেখা ছাপতে অস্বীকার করতে পারেন, এম্প্লয়ার চাকরি খেতে পারে, গুণ্ডা শারীরিক মৃত্যু ঘটাতে পারে মাত্র। প্রত্যেকেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু একজন স্বাধীন ও সৎ লেখকের ঈশ্বরের মতো ক্ষমতা। যা কালোত্তীর্ণ। যার বিচার সময় ও পাঠকের হাতে।' বলে ঈশা আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি ওর গালে ঠোঁট রাখি কয়েক মুহূর্ত। শরীরের ভাষা দিয়ে বুঝে নিই পরস্পরকে।

এক লাফে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয় ঈশা। অভদ্রটা হাত পর্যন্ত নাড়ে না। আমিও পেছন ফিরে না-তাকিয়ে কলিং বেলে আঙুল রাখি।

কেউ ছাপুক না ছাপুক, বেদিয়ার কথাটা আমাকে তো লিখতেই হবে। সেটাই লিখলাম।

কালান্তর ১৯৯৮

চাবি

সদাশিব চক্রবর্তী ভুলেই গিয়েছিলেন যে, তার একমাত্র ছেলে বিনুর ভালো নাম সুশান্ত। দুই মেয়ের পরে দুটি ছেলে নষ্ট হবার পরে বিনুর জন্ম। খুব ঠাণ্ডা ছিল ছেলেবেলায়, বড়মেয়ে গায়ত্রীই অপটু হাতে তাকে নাইয়ে খাইয়ে, পিঠ থাবড়ে পায়ে নাচিয়ে নাচিয়ে, দোল দিয়ে, কোলে-পিঠে করে বড় করেছে। কালকেই গায়ত্রী এসেছে গরমের ছুটিতে, তার নতুন চাকরি কলকাতার কাছাকাছি এক পুরনো স্কুলে। আর পাঁচদিন পরে কালই বিনুর খোঁজ পড়ল। পাঁচদিন কি ছ-দিন, বা সাতদিন কি আরও বেশিদিন বিনু বাড়িতে নেই, একেবারে বেপাত্তা, বিনুর খোঁজ করা দূরে থাকুক, বাড়িতে ২৪x৫ অথবা ২৪x৬ কিংবা ২৪x৭ ইত্যাদি ইত্যাদি করে যত ঘন্টাই হোক, বিনুর নামোচ্চারণ হয় না। অথচ বিনু এ বাড়ির, এমনকি এই চক্রবর্তী বংশের একমাত্র পুত্রসন্তান আর বিনুর বয়স মাত্র একুশ বছর ছ-মাস। বড়বোন গায়ত্রীর আঠাশ আর পরের বোন বা বিনুর ফুলদি; সংহিতার বয়স ছাব্বিশ। গায়ত্রী প্রথম প্রথম ঘর-বার করত। বাবাকে উত্যক্ত করত, মাকে অনুযোগ করত, ছোটবোনকে অকারণ বকাবকি করত বিনু যখন প্রথম প্রথম দেরি করে বাড়ি ফিরতে শুরু করে। সদাশিবও খুব চেঁচাতেন, যে-চেঁচানি তিনি শুরু করেছিলেন বড়মেয়েটি এবং পেছন পেছন ছোটটিও বিয়ের পিঁড়িতে বসার মতো হয়ে উঠেছিল, তখন থেকে। বড়টি পড়াশুনায় ভালো—মোটামুটি নিজে নিজেই নীরবে এম এ পর্যন্ত পাশ করে, বছরখানেক বাইরে থেকে বি এড করে নিল। ছোটটি 'উচ্চমাধ্যমিক অনুত্তীর্ণা'। কিন্তু গান গায় বড় আশ্চর্য রকমের ভালো। দুটি মেয়েই ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, কিঞ্চিৎ দাঁত উঁচু। ফলে যত টাকা দিয়ে পাত্র কেনা যেত, সদাশিবের তত টাকা কোনওকালেই ছিল না। রিটায়ারমেন্টের পরে দু-ঘরের একটা বাড়ি বানাতেই তাঁর বেশ কষ্টই হল—পেনসন তো পান কুল্যে হাজার দুয়েক। রেলের পাস পান ফার্স্টক্লাসের কিন্তু স্ত্রীর অসুখের জন্যই মাঝে মাঝে কলকাতা যাওয়া ছাড়া ও এখন তেমন কাজে লাগে না। গায়ত্রী চাকরি পাবার পরে অবশ্য খানিকটা কাজে লাগছে। বুড়ো বয়সের ছেলে বলে বিনুই বাড়ির ভালো মাছটা, মাংসটা, ক্ষীরটা সরটা খেয়ে এসেছে ঠিক আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত। পড়াশুনোর চাইতে ফুটবল আর হৈ-হল্লোড়ে মেতে থাকা বিনুর স্বভাবের এক ক্রমশ হয়ে দাঁড়ায়। পনেরো বছর বয়স থেকেই সে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত। সদাশিব তখন তাঁর চেঁচামেচির উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ বদলে ফেললেন। আক্ষেপ ও বিস্ময়সূচক অব্যয় পদের জায়গায় এল চোখা চোখা বাক্য এবং স্থূল বিশেষণ। সে বিশেষণে সবিশেষ সুশান্ত চক্রবর্তী নামটা কয়েক বছরের মধ্যেই বিস্মৃতপ্রায় হয়ে 'বিনু'-তে থিতু হয়। শুধুই বিনু নয় অবশ্য।

'কুলাইঙ্গার', ইদানীং 'পাপী'।

একথা ঠিক যে সদাশিব, সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জন করেননি। রেলের এ-টাইপ ছোট মাপের এই কোয়ার্টার্স থেকে সামনে, ভেতরে জমি গাছগাছালি এবং কারখানা শহরের নিয়ম অনুযায়ী বাধ্যতামূলক বাগানসহ দু-কামরা রান্নাঘর উঠোন বারান্দার বি-টাইপ কোয়ার্টার্সে তিনি সোজা রাস্তায় মাথা উঁচু করে হেঁটে এসেছেন। ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে তিনি রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে যখন আসেন তখন তাঁর বয়স অল্প, ম্যাট্রিকুলেশন পাশের সার্টিফিকেট ছিল বোলো বছর বয়সেই। দিদিকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। দুই ছেলেকে নিয়ে সদাশিবের বাবা এই শহরে আসেন নতুন কারখানা শহরে চাকরি নিয়ে। মা ছিল না, সদাশিবই রান্নাবান্না করে ছোট ভাইকে আর বাবাকে দেখেছেন। লেখাপড়া তাঁর তেমন হয়নি। অবশ্য বাবার অকালমৃত্যু না হলেও তিনি চাকরি পেতেন। তখনও বিধান রায় ছিলেন, তাছাড়া চাকরির বাজার এরকম ছিল না। বিনু মাধ্যমিক দেওয়ার আগেই তাঁর চাকরির মেয়াদ ফুরোল। বড় মেয়ে আর তিনি ছাত্র পড়াতেন। তো মেয়েই একদিন তাঁকে বোঝাল যে এম এ বি এড না হলে চাকরির আশা নেই। তবে মেয়ের সুবুদ্ধি বলতে হবে প্রাইভেটে সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনটি করে, শুধু একবছর সে হস্টেলে ছিল। তাও এতদিনে চাকরি হল। এখন তো পাওয়া নয়, হওয়া। কিছু একটা হওয়া। তা বিনুর জন্য খরচ সব চাইতে বেশি করেও বিনুর কিছু হল না। বিনু কিছু হল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষকে তো একটা কিছু হয়ে উঠতেই হয়। ক্রমাগত না হয়ে ওঠাও এক ধরনের হওয়া। হয়ে ওঠা।

কিন্তু গত তিন চার বছর ধরে বিনুর হওয়াটা ঘটছিল। বিনু ক্রমাগত হয়ে উঠছিল। আঠারোতে আই টি আই পাশ করে বিনুর ঘোষণা সে আর পড়বে না। চাকরির চেষ্টাও করবে না।

'কী করবি তা অইলে ক?' সদাশিব ভারি অবাক হন।

'বিজনেস করব।' আঠারোর বিনু, 'কুলাইঙ্গার বিনু' বলে।

'বিজনেস?' খেয়ে না-খেয়ে বড় হয়ে, এমন একটি চাকরির নিরাপত্তায় জীবন কাটিয়ে যার বারবার মনে হয়েছে 'কী আইশচজ্জ! মরি নাই ত! পোলাপান লইয়া, একখান নিজের বাড়িও কইরলাম, সৎপথে থাইক্যা। বিজনেস কইরব চৌদ্দ পুরুষে ভাবি নাই, এ পোলাডা কী কয়? শুধু ফাঁকি দ্যাওনের মতলব।' মুখে বলেন,'বিজনেস কইরবি তরে ক্যাপিটাল দিব কে? আমার হাত খালি। তর দিদির বিয়্যা অয় নাই অহনো। ভাইগ্য যে গায়ত্রী চাকরি পাইসে। বিজনেসে পইস্যা ঢাইললে খামু কী? তার চাইতে অ্যাপ্রেনটিসের চেষ্টা কর। অহনও বোস সাহেব আছেন। রিকোয়েস্ট কইরলে সাইধ্যমত কইরবেন। আসলে দ্যাশের লোক ত...'

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন সদাশিব কিন্তু সেসব বিনু তো জ্ঞান হবার পর থেকেই শুনে আসছে। বাংলাদেশে তাদের মস্ত বাড়ি। টিনের চালা হলেও আটখানা বড় বড়

ঘর। গোলাভরা ধান, পুকুরের মাছেরা হেসে হেসে ধরা দেয়। চই চই করে ডাকলে গলা তুলে হাঁসেরা এসে ইয়া বড় বড় ধবধবে ডিম পেড়ে রাখে, গোয়ালে গরুর বাঁট থেকে দুধ পড়ে মাটি ভিজে ওঠে — এইসব গল্পের সম্ভাবনাকে সে উড়িয়ে দেয় ফিল্মি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে — 'তোমাকে একটি পয়সা দিতে হবে না— শুধু আমার পেছনে ভ্যানভ্যান করতে মাকে বারণ কোরো। আর তুমিও অমন চিল্লিও না।'

তা এমনিই হয়ে যাচ্ছিল বিনুর ভাবা। শুধু ভাবা নয়, এই নভেম্বরে বাইশ পূর্ণ হবার আগেই বিনুর অনেক কিছু পালটে যাচ্ছিল। কিংবা বিনুই বদলিয়ে নিচ্ছিল তার হাঁটা-চলা কথা-বলা-তাকানোর ভঙ্গি থেকে সব কিছু। যেন সে অস্বীকার করছিল তার বাড়ির দৈনন্দিনতাকে। বাড়ির উত্তরাধিকারকে। কিন্তু তেমন কোনও উত্তরাধিকার কি তার জন্ম মুহূর্তে, যখন তার পিতার বীজ মাতৃগর্ভে স্থাপিত হয়েছিল, সে পেয়েছিল? যে-জীবনযাপন সে দেখে এসেছে আশৈশব, তার সঙ্গে তো মেলে না, মাঠ ভর্তি ধানের শীষ, কিংবা অতিথি কুটুম এলেই সাগ্রহে 'আইজ এহানেই চাড্ডি খাইয়া যান'-এর স্মরণ? গুঁড়ো দুধের বিস্বাদ চা আর দুটি বিস্কুট দিতেই মা জননীর মুখের কুঞ্চন এর সঙ্গে মেলে না।

আবার তার 'ফাদারেরই' কি কোনও উত্তরাধিকার আছে? বিনু চায় নতুন জীবন যাতে তার থাকবে অঢেল টাকা। অনেক টাকা। এভাবেই সদাশিবের কাছে পুত্র বিনু 'কুলাঙ্গার' থেকে 'পাপী' হয়ে ওঠে।

রাতেই গায়ত্রী থানায় যায়। থানার সাব ইনস্পেকটর, সম্ভবত সেটি ছোটবাবু বেশ অমায়িক। নইলে এত রাতে তিনি নিরুদ্দেশের— তাও এক হাড় বজ্জাত ছেলের, এটি তাঁর নীরব উচ্চারণ কারণ বিনু তাঁকে এবং থানার সবাইকেই মাস গেলে মুখ আঁটা সাদা খাম দেয়, ডায়েরি নিতেন না।

একুশ বছরেই বিনু দু-দুখানা বাসের মালিক হয়েছিল। ডাম্পার ছিল একটা। আর একখানা কেনার কথা ছিল। বেআইনি কয়লা তোলা এবং তা বেআইনি ডিপোয় পৌঁছে দেওয়া এ ব্যবসায়ে অবশ্য বিনু একা ছিল না, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সে বোধহয় জেমারি গেটের বিখ্যাত মণ্ডলবাবুর মতো একশো টাকার কি পাঁচশো টাকার নোটে তামাক ভরে সুখটান দিতে পারত। এত টাকা বিনু করল কী করে? বাবা একটি পয়সা দেননি। মা-ও গয়না দেননি। গায়ত্রী কাউকে বলেনি সে দু-বারে চারশো আর সাতশো করে মোট এগারোশো টাকা দিয়েছিল বিনুকে। এক বছরের মধ্যে সে টাকা গায়ত্রী পেয়েছিল একটি টাইটান কোয়ার্টজ রিস্ট ওয়াচ সমেত। গায়ত্রী জিগ্যেস করেছিল, বিনু চোখ মটকে বলেছিল জুয়ায় জিতেছে সে। মিহিজাম থেকে নেয়ামতপুর পর্যন্ত বিনুর ঠেক। বিনু খেলে বেড়াত। বিনু হারত না। গায়ত্রী ঠিক জানত না তবে ভাসা ভাসা জেনেছিল মাকড়শার জালের মতো এখানে ছড়িয়ে আছে এক ভয়ংকর ফাঁদ। সভ্য, ভদ্র জীবনের নিচ দিয়ে চুরি-ডাকাতি-চোরাচালান-বেআইনি কয়লা পাচার-মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে এক অন্ধকার দুনিয়া। সে জগতের বাসিন্দাদের

ভদ্রজীবনে যখন দেখা যায় তখন তারা অন্য মানুষ। আবার সে জগতে এমন মানুষজনও আছে যারা ওপর তলায় কখনওই ভেসে ওঠে না। পুলিশের খাতায় তাদের একাধিক নাম—অমুক ওরফে তমুক ওরফে ইত্যাদি ইত্যাদি। দরকার মতো তারা হিন্দু কিংবা মুসলমান, বাঙালি কিংবা উত্তরপ্রদেশীয় বা বিহার অথবা ওড়িশা কিংবা পাঞ্জাবের লোক। সে-জীবন অবশ্য ভদ্র এবং সভ্য জীবনকে এড়িয়ে চলে। সেই ভুবনে একবার নেমে গেলে কোনও উদ্ধার নেই। বিনু কি তেমন নেমেছিল? তার চেয়ে বিনু যদি কোনওক্রমে ই সি এল-এ একটা চাকরি কিনে নিত, যদি কোনওরকমে পে ক্লার্ক হতে পারত তাহলে জুয়ো টুয়ো না খেলেই সে তিনতলা বাড়ি, হিরো হোন্ডা চাই কি মারুতি কিনতে পারত। সে-টাকা অসৎভাবে নয়, অন্যায়ভাবে উপার্জিত টাকা। ঘুষের টাকা, বেআইনি কয়লা পাচারের বখরার টাকা, মহাজনি কারবারের সুদের টাকা। সে-টাকার হিসেব কেউ চায় না—অথচ সবাই জানে মাইনের টাকায় এত সম্পত্তি হয় না। কিন্তু তুমি ক্লাবে চাঁদা দাও—তুমিই প্রেসিডেন্ট। পার্টির ইলেকশান ফান্ডে চাঁদা দাও, তোমাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না। পাড়ার কিংবা পার্টির দুর্গাপুজোয় চাঁদা দাও—তুমিই মাতব্বর। বিনুটা গোঁয়ার, বিনুটা বোকা, সত্যিই 'পাপী' তুই—গায়ত্রী সারাটা রাত বিনিদ্র এপাশ-ওপাশ করে। বিনুর পাপের টাকায় সদ্য তৈরি হওয়া দোতলার বড় ঘরে জোড়া খাটে দুই বোন। বিনু এসব করে দিয়েছে। এমনি পুব-দক্ষিণ খোলা ব্যালকনি সমেত ভালো ঘরটাই দুই দিদির। গায়ত্রী না-থাকাতে এখন সংহিতা সারাটা দিন ঘুরে ফিরে এঘরে কাটালেও রাত্তিরে নিচে মায়ের কাছে শোয়। বিনুও তো মাঝে মাঝে থাকে না।

কিন্তু এবার অনুপস্থিতির পঞ্চম দিনে থানায় ডায়েরি করে গায়ত্রী, কেননা সেদিন রাত সাড়ে ন-টা নাগাদ বিনুর খোঁজে তার দুই বন্ধু, যাদের কখনও কখনও এ-বাড়িতে বিনুকে ডাকতে আসতে দেখা গেছে, সেই কাজল আর গণেশ আসে। গায়ত্রীকে ওরা বিনুর ডাকেই 'বড়দি' বলে কথা বললেও গায়ত্রী থানায় যায় ওর দুই বাসের ড্রাইভারের সঙ্গে। ড্রাইভার হরকিষণ সিং আর ড্রাইভার তিলক মণ্ডলই তাকে থানা পর্যন্ত নিয়ে তো যায়ই, বাড়িতেও পৌঁছে দেয় 'দিদি'কে। বিনুর বন্ধু ছেলেদুটির চেহারা আর কথাবার্তায় গায়ত্রীর কেমন জানি লাগে। বনের পশুপাখির মতো সে যেন কোনও অশুভের আগাম সংকেত পায়। এদের দু-বাড়িতেই নাকি পর পর দু-দিন নেমন্তন্ন ছিল বিনুর। তারা তাই বলে। কী সব বিয়ে এবং অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন। নেমন্তন্ন খেতে যায়নি বলেই কি এদের এতখানি উদ্বেগ? গায়ত্রীর বিশ্বাস হয় না। শেষে বোঝে ওখান থেকে বিনুর যেন কোন কোন ঠেকে খেলতে যাবার কথা ছিল। যেন বিনু এক বিশ্বজয়ের খেতাব নিতে যাচ্ছে। আজ এখানে ম্যাচ তো কাল ওখানে। বড় বড় পাত্তি বাতাসে উড়ছে, বিনু ছাড়া কে তাদের ধরবে? এত বড় টুর্নামেন্ট ফেলে বিনু ঘরে বসে থাকবে তা এরা বিশ্বাস করে না।

ইদানীং জুয়ার ঠেকে বিনু হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য—তার পকেট ওপচানো টাকার লোভে মাছির মতো ভন ভন করত এরা। তা বিনু টাকা ওড়াতেও জানত। নইলে ছেলেগুলো বিনুর বন্ধুত্বে আপ্লুত হয়ে এসেছে এমন কথা গায়ত্রীর বিশ্বাস হল না।

বাড়িতে বিনু মায়ের হাতে দিদিদের মারফত কিছু টাকা দিলেও বাবাকে এক পয়সাও দেয়নি। বাবার সঙ্গে সে কথাও বলত না।

গায়ত্রী চাকরি নিল বাবা-মা-র অনিচ্ছা সত্ত্বেও। পড়াশুনো স্কুল, কলেজ ছাড়া তারা দু বোন বাড়ির বাইরে যেত না। চিত্তরঞ্জনে তবু পাড়া বলে একটা ব্যাপার আছে। গায়ে গায়ে কোয়ার্টার্স, এ-দেয়ালে কান পাতলে ওদিকের কথা শোনা যায়। এ-বাড়ির ছেলের বল ও বাড়ি পড়লে ও-বাড়ির কাকু পাঁচিল ডিঙিয়ে সেটি ফেরত পাঠাতে পারেন। গরমকালে সন্ধেবেলা দলবেঁধে রাস্তার এ-মুড়ো ও-মুড়ো হাঁটে মেয়েরা। খোলা আকাশ মাঠ—তবু তারা যায়নি। কিন্তু বাড়ির সামনে ছোট বাগানে ঘুরতে ঘুরতে হেজের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে পড়া বন্ধুদের সঙ্গে দু-চারটে বাক্য বিনিময় হত। হঠাৎ কোনও কৌতুকে হেসে ওঠা যেত। কিন্তু রূপনারায়ণপুরে বাড়ি করে উঠে আসার পর দু-বোনের সে জানলাটুকুও যেন বন্ধ হয়ে গেল। দোকান বাজার বাড়ির কাজের জন্য একটি বালিকা আছে সব সময়ের। শুধু সে রাত্তিরে তার খাবার নিয়ে বাড়ি চলে যায়। কখনও-সখনও দোকানে গেলে তারা দু-জনে একসঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে যায় আর ছুটতে ছুটতে ফেরে। ইদানীং সদাশিব যেন ঘড়ি ধরে বসে থাকতেন।

'বেঁচে গেছিস দিদি।' সংহিতা বলে।

'তুই বরং একটা গানের স্কুল কর। একটা অকুপেশনও হবে। পাঁচজনের সঙ্গে মিশতেও পারবি।' দিদি বলে।

'ধুর! কেউ গান শিখতে আসে না। দু-দিন পরেই বলবে এটা শিখব, ওটা গাইব। প্রোগ্রাম করো। ফাংশন। তার ওপরে পরীক্ষার ঝামেলা।'

'তাহলে গানের দল কর।'

'দল মানেই প্রোগ্রাম।'

'সে তো ভালোই।'

'খেপেছিস? বাবা অ্যালাউ করবে? যা কনজারভেটিভ।'

'প্রথম প্রথম বাধা দেবে, পরে নাম-টাম হলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'পাগল! ভেবেছিলাম 'আওয়াজ কি দুনিয়া'-তে ক্যাসেট পাঠাব। দিল না। "গান শুধু গান"-ই কত আপত্তি। কলকাতায় কার সঙ্গে যাবি, কোথায় থাকবি, ওসব বড়লোকি ব্যাপার ইত্যাদি। আসলে আমাকে ছাড়বে না। কোনওমতে একটা বিয়ে দিয়ে পার করতে পারলেই বেঁচে যায়। ভাগ্যিস দেখতে সুন্দর নই—তাহলে অ্যাদ্দিনে বিয়ে-ফিয়ে হয়ে দু-তিনটে বাচ্চা হয়ে যেত। গানের দফারফা।'

এত কথা বলার দরকার ছিল না, গায়ত্রী সব জানে। তবু সে লেখাপড়া শিখে কপাল গুণে একটা চাকরি পেয়েছে। চাকরির নিয়োগপত্র যেন বিদেশ যাবার পাসপোর্ট। এখন সে সাহিত্য পরিষদের কাছে একটা মেসে থাকে। কলকাতা শহরে মেয়েদের যে একটা ভালো থাকবার জায়গা নেই এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। হয়তো এখানে সে বেশিদিন থাকতে

পারবে না। এত বাইরের লোক হুটহাট ঢুকে পড়ে, দোতলায় না জানিয়ে উঠে আসে যে তার অনভ্যস্ত মন বিরক্তিতে ভরে যায়। চাকরি পাবার পরে এই তার প্রথম লম্বা ছুটিতে বাড়ি আসা। কিন্তু বিনুর কী হল? থানায় ডায়েরি করার পরেও তিনদিন কেটে গেল। সদাশিব যেন আরও বুড়ো হয়ে গেছেন কিন্তু তাঁর সরবতা আরও প্রবল।

'পাপ, ভয়ানক পাপ। মুহুর্মুহু: বিজনেস কইরব? ডি ও-র কারবার কি বিজনেস? জুয়া খেলা কোন বিজনেস? পোলায় আমার লাখো ট্যাহার বিজনেস কইরসে? কালার টিভি, ফ্রিজ, উয়াশিং মেশিন দিব সব টান মাইরা ফালাইয়া। পাপের পয়সার গরম কত? অহনে, কোথায় রইসে কী খাইসে ভগবানই জানে....।'

প্রায় নির্বাক তবু বিনুর মায়ের বুকটা শূন্য হয়ে যায়। ইদানীং বাড়িতে কমই খেত বিনু, কিন্তু খাওয়ার ফরমাশটা ছেলেবেলার মতোই ছিল। আসানসোল বাজার থেকে দুর্লভ ও নাগালের বাইরের দামে স্বপ্নের চিংড়ি মাছ আসত। 'মা, মালাইকারি করো তো।' ও ছেলে ঘরে থাকবার নয়। চেহারায় স্বভাবে ও যেন অন্য কোনও বাড়ির কেউ। সবাই বলে বিনু নাকি তার মায়ের মতো। দুই মেয়েই বাপের রং আর মুখশ্রী পেয়েছে। খালি মায়ের মতো চুল। বিনু ফর্সা, লম্বা, দেবতার মতো নিষ্পাপ মুখশ্রী, স্বাস্থ্য ওর বরাবরই ভালো, ইদানীং ওকে দেখে কেমন ভয় করত। কত হিরো হোন্ডাই তো যায়। কিন্তু বিনুর মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনলেই বিনুর মা ঠিক বুঝতে পারতেন ছেলে এসেছে। বাতের ব্যথার জন্য সিঁড়ি ওঠা-নামায় তাঁর কষ্ট হয় তবু ছেলে দোতলায় দু-ঘরের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বানিয়ে নিলে তিনি দেখে আসেন। বিনুর ঘর বিনু নিজেই পরিষ্কার করে। দুই দিদির কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। বিনু বললে তারা ঘরটা ঝেড়ে মুছে দেয়। একটা কালার টিভি কিনে দিয়েছে বিনু। সেটি মেয়েদের ঘরেই আছে। বিনু বাড়ি থাকলে ওয়াকম্যান নিয়ে ঘোরে। নিজে গর্জন করে কিন্তু অন্যের কথা, বিশেষ করে বাপের কথা যাতে না শুনতে হয়। নিচে একটা শাদা কালো পোর্টেব্‌ল্ টিভি আছে। ওতেই সদাশিব বাবু আর বিনুর মায়ের চলে যায়। সংহিতা গায়ত্রীকে বলে, 'রিটায়ার্ড লোকেরা কি টিভি অ্যাডিকটেড হয় দিদি? মা তো খালি 'জন্মভূমি' কিন্তু বাবা তো হিন্দি সিনেমাও দ্যাখে। আর ছোটবেলায় আমাদের কী রকম বকত মনে আছে?'

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে দোকানঘরগুলোর মাথা পেরিয়ে ডাবরমোড়ের ব্যস্ততার আভাস আসে। বিনু হাসতে হাসতে বলেছিল, 'এটা ফুলদি, দিদিভাই তোদের স্পেশাল। তোরা তো চাঁদ সূয্যি দেখিস না। এখান থেকে ডাবরমোড়ের রাস্তা লোকজন আর আমাদের বাস দুটো দেখতে পাবি।'

বিনু বলেছিল, 'আমাদের!' ও তো বলতেই পারত 'আমার!' তেমন বলার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতাও থাকত না। কিন্তু 'আমাদের' বলে বিনু বোধহয় বোঝাতে চেয়েছিল তার শিকড় তখনও অচ্ছিন্ন, যে ছিন্নতা তার বাবার শরীরে শত ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল— সর্বাঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শিকড়বাকড় সমেত বুঝি-বা তিনি এক মাটি থেকে উৎপাটিত কোনও

কন্দ, বিনু যেন সেইখান থেকে আরও আরও মাটির গভীরে চারিয়ে দিচ্ছিল তার শিকড়, অন্য এক উত্তরাধিকারে। যে প্রাণে বাঁচতে চায় দিব্য আলো না পেলে, সে তো অন্ধকারেই বাঁচে, যদি সে বাঁচাকে জীবন বলে। নরকে তো কেউ কেউ থাকে যেমন স্বর্গে, বিনু বোধহয় তেমনই বাঁচত। তেমনভাবে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

দশ দিনের দিন ভোরবেলা ড্যামের জলে বিনুকে উপুড় হয়ে ভাসতে দেখা গেল। বিনু তো তেমনি ম্যাজিক জানত। একসময় শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কৌশলে ইচ্ছেমতো চিত বা উপুড় হয়ে জলের ওপরে শবাসনে থেকে সে চমৎকৃত করে দিয়েছে অনেক দর্শককে। তার আপাত অস্থির চরিত্রে নিহিত ছিল এই অন্তর্শৃঙ্খল তাতে মিশেছিল সহজাত ধী-শক্তি। সে বিশৃঙ্খল ছিল না কিন্তু ছিল অধোগামী। সে ধীমান কিন্তু কোনওদিনই মার্জিত হয়নি। তাই তো একুশ বছরেই তার পকেটে টাকা, গদির নিচে টাকা, সুটকেশ ভর্তি ভয় পাবার মতো টাকা। সে যে সোজা পথে এ টাকা অর্জন করেনি সে-কথা তার সর্বাঙ্গে সোচ্চার তার চলনে, বলনে, পাড়াকাঁপানো খিস্তিখেউড়ে, কিন্তু সে ম্যাজিক দেখাচ্ছে না। স্রেফ আর্কিমিডিসীয় সূত্রের নিয়মে সে ভাসমান, নিথর, স্পন্দনহীন; শবাসনে নয়, শব হয়ে।

ক'দিন ধরেই সে ড্যামের জলের নিচে পাঁকের মধ্যে, শ্যাওলায় মাখামাখি হয়ে উত্থানশক্তি রহিত, পড়ে ছিল। যে-বিনু ক'দিন আগে কৃষ্ণচূড়ার ঝিরিঝিরি ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল আর সিগারেট টানছিল, ডিপ সি গ্রিন রঙের ঢিলেঢালা একটি বিদেশি শার্ট আর দুধ শাদা ট্রাউজার পরে, পায়ে নরম সোয়েডের কেড্স্; আর যে-বিনু রবিবার সন্ধে থেকে চেষ্টা করে করে কত রাতে যে থই থই জ্যোৎস্নার নিচে উপুড় হয়ে ভেসে উঠল, একই বিনু হয়েও তারা কতই না আলাদা! পাঁকের মধ্যে প্রথম যেদিন সে পড়েছিল তখন সে ইচ্ছা করলে বা চেষ্টা করলেও ভেসে উঠতে পারত না। তখন তার শরীর তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নিয়ে যতটুকু জায়গা এ পৃথিবীতে মানুষের দরকার ততটুকু জমি ও জল নিয়ে শুয়েছিল। জলের নিচে আকাশ নেই, জলে বাহিত অক্সিজেন ফুলকা দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছিল যে মাছেরা তারা তখনও বিনুকে ঠোকরায়নি, শুধু বিনুর শরীরের এপাশ ওপাশ দিয়ে কখনও বা ওপর দিয়ে ঘুরছিল। বড় মাছেরা একা একা, যেমন ঢোঁড়া সাপও একটি বিনুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত হিলহিলিয়ে তারপর ওপরে একপাক খেয়ে আসে। ড্যামের মাঝখানে বিনু পড়েনি। তাতে অনুমান করা যেতে পারে নৌকো বা ডিঙি বা ওই জাতীয় কোনও কিছু থেকে নয় (সুইমিং ক্লাব আছে, সুতরাং লাইফ-বেল্ট ব্যবহার করা যেত। তবে কিনা সেটা এমনই হাস্যকর কিংবা নির্দয় ঠাট্টার ব্যাপার হত যে, বিনু পর্যন্ত হেসে উঠতে পারত। দু-ফাঁক হওয়া মাথা, হাত পায়ের কাটা শিরা আর পাথর সমেত বড় বঁড়শি বেঁধানো গলা ফুলিয়েই হা-হা করে বিনুর মতোই হেসে উঠত হয়তো।) দুটো হাত আর দু-পা ধরে বাকে বলে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে দিয়েছিল জলে। ঝপাং করে শব্দ হতেই কেউ হয়তো বলে উঠেছিলঃ 'শালার চোখ দুটো দেখেছিলি? যেন তখনও বসিং করছে।' আর একজন তো বলতেই

পারে, 'চোখ দুটো কি জলের তলায় বুজবে? বাপ্‌স্ শালা জান কেলিয়ে দিয়েছে ....।' এইসব ফিসফাস বাতাসে বাতাসে ধরা আছে। এ পৃথিবীতে কত আর্তনাদ, কত গোপন ষড়যন্ত্র, কত কাতরোক্তি ও যন্ত্রণাবিদ্ধ স্বর কত শিশুর হাসি, ভালোবাসার আনন্দোচ্চারণের সঙ্গে মিশে আছে ধরিত্রীকে ঘিরে। বিনুর বুকের ওপরে সাপের ভয়ে পালিয়ে যে ব্যাঙগুলো আশ্রয় নিয়েছিল থরথর দেহে, কিছুদিন পরেই তারা গলা ফুলিয়ে তাদের সঙ্গিনীদের মিলন আহ্বানে ডেকে আনবে। তারপর ক'দিন ধরে বিনুর শরীর প্রকৃতির নিয়মেই ফুলতে থাকে, কীভাবে যেন পাথরটি আলগা হয়ে যায় আর বিনু তার নির্মম, অকরুণ অবগাহন থেকে বুড়বুড়ি কেটে উঠে আসতে থাকে যেন কত কথা নিয়ে ফেটে যেতে চাইছে তার দন্তহীন মুখের ছিন্নভিন্ন ওষ্ঠাধর; সেই অব্যক্ত কথাগুলি উচ্চারিত হয় না কেননা বিনুর ফুসফুসে বাতাস নেই, বিনুর হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল নেই, খুব শান্ত ভাবে ভেসে উঠেছিল সে আকাশের অগাধ বিস্তারের নিচে, থই থই জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হতে, রাত্রির শান্ত বাতাসের শুশ্রূষা নিতে। বিনুর সর্বশরীর ঠাণ্ডা পাঁকে লেপা, যেন তার শরীরে কেউ চন্দন মাখিয়ে দিয়েছিল, চুলের মধ্যে রক্ত হয়তো ধুয়ে গিয়েও কাদার সঙ্গে কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। এভাবেই সে একেবারে একা কয়েকটি ঘন্টা বাঁধের হাওয়া কাঁপা তিরতিরে জলে উপুড়— আকাশের উদারতা আর চাঁদের মায়াময়তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘাড় গুঁজে, বুঝি-বা অভিমানে অতিকায় আদিম কোনও জলজন্তুর মতো ভাসছিল। অন্তত সেসময় তাকে একুশ বছরের বিনু বলে চেনা যাচ্ছিল না। হয়তো বা মানুষ বলেও না। বিবর্ণ এক অতিপ্রাকৃত কোনও অবয়বে রূপান্তরিত হয়েছিল সে।

তবু সেই সময়টুকুই ছিল তার জীবনের সর্বোত্তম সময়। মাছেরা ঠুকরে খেয়েছিল তার রমণীমনোলোভা কমল আঁখি দুটি, শ্যাওলা জড়িয়ে ছিল তার স্ফীত পূতিগন্ধময় শরীরে। কী এক প্রবল মায়ায়, হালকা লাফ দিয়ে দুটি ব্যাঙ নেমে যায় তার পিঠের ওপর থেকে, ভাসতে ভাসতে যখন তীরের কাছে চলে এসে দলঘাস আর কাদার মধ্যে দোল খায় মৃদু মৃদু।

সেসময়ই তো বিনু জাগতিক স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা ভরা এক পৃথিবী পায় যা সে টাকা দিয়ে কিনতে পারেনি।

থানার বারান্দায় নাকে আঁচল চাপা দিয়ে গায়ত্রীই শনাক্ত করে ছোট ভাইকে। সদাশিব একঝলক দেখেই, 'না, না, বিনু না....' বলে বিকৃত মুখ ঢাকেন। সত্যিই বিনুকে বিনুর শরীর দিয়ে চেনা যাচ্ছিল না। বিনুকে চেনা না-গেলেও, বিনুর গলায় এঁটে বসা রুপোর চেনে লোকনাথ বাবার লকেট—রণে, বনে জঙ্গলে যিনি স্মরণমাত্র রক্ষা করেন তিনি বাঁচাতে পারেননি তাকে; নাকি বিনু শরণাগত হবার সময় পায়নি, তার গলায় যে রক্ষাকবচ ঝুলছে সেটা তার স্মরণে আসেনি? নাকি প্রথমেই ধারালো ভারি চপার দিয়ে তার মাথা এতটাই ফাঁক করে দেওয়া হয়েছিল যে, সে যন্ত্রণাদীর্ণ আঁ....আঁ.... ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করতে পারেনি? সেকেন্ডের ভগ্নাংশে হলেও স্নায়ুমণ্ডলীর তো ওটুকু সময় লাগে মস্তিষ্কে বার্তা পৌঁছে দিতে ও বার্তা বহন করে নিয়ে আসতে। সেই সামান্যতম সময়টুকুও বিনু পায়নি যে

ওইটুকু সক্রিয় হয়ে উঠবে। হাতুড়ি কিংবা পাথর দিয়ে তার ঝলমলে একুশ বছরের দিব্য মুখশ্রী নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। একটি দাঁত তাকে বছর খানেক আগে তুলে ফেলতে হয়েছিল —তাই কি তার বাকি সব দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল? এখন তো তার মুখের ভেতর দেখবার উপায় নেই। শিক বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে বোঝা গেল তার মাড়ি পচে গেছে, জিভ মুখময় ব্যাপ্ত। বিনুর শরীর পচে গেলেও, শাদা হয়ে গেলেও তার বিদেশি শার্ট ও প্যান্ট অতটা পচেনি। পকেট থেকে রুমাল উঁকি দিলে একজন কনস্টেবল শিক, বাঁকানো খানিক, দিয়ে রুমালসমেত ওয়াটারপ্রুফ ঘড়িটি তুলে আনে হিপ পকেট থেকে।

ইনস্পেকটর ঝুঁকে পড়ে, বিড়বিড় করে, দু-চারটে শব্দ শোনাও যায় — 'বাহ্, ডেট ফেট দেয়া কোয়ার্টজ ঘড়ি। টাইটান। হয়তো, কিছু বোঝা যাবে। ম্‌ম্‌ .....এহ্ হে ....কী আশ্চর্য। স্ট্রেঞ্জ!' কনস্টেবলের বাঁ হাতের তালুতে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে, নাকে রুমাল চাপা—'ঘড়িটা চলছে! তাহলে তো বোঝা যাবে না কবে, কখন মার্ডার করা হয়েছে। ইশ্‌শ্‌।'

ঘড়িটা চলছে। এমনই সুরক্ষা দিয়েছিল বিনু যে জলের তলায় থেকেও তার হৃদস্পন্দন থামেনি। বিনুর হাতে প্রায় সব সময়ই ঘড়িটা থাকত। যেন ওটা ওর শরীরের অংশ। মাঝে মধ্যেই তো ভোরে উঠতে হত ওকে। একটা ছোট ইলেকট্রনিক অ্যালার্ম ক্লক কিনেছিল, সেটা বাক্‌সের মতো বন্ধ করা যায়। আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখতে হত না, ঘড়িটা নিজেই আলোকিত হয়ে থাকত — অ্যালার্ম বাজত— 'বিহিনু? বিহিনু? ...... ' সেটা বিনু অনেক সময় নিয়েও যেত, যখন বেশিদিনের জন্য বেপাত্তা হত। বিনুর ঘরটা দেখতে হবে, ঘড়িটা আছে কি না; গায়ত্রী ভাবে। তবে আপাতত তাকে ছোটাছুটি করতে হবে। সদাশিবকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বিনুর বন্ধুদের কেউ বলে, 'জ্যেঠুকে বাড়ি পৌঁছে দিই বড়দি?' গায়ত্রী মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে। তাকে তো আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে। তার ভেতরটা যেন একটা অতল অন্ধকার খাদ— সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় না, স্যাঁতসেঁতে হিমশীতলতা, ঘূর্ণি বাতাস আর ছায়া ছায়া কী যেন সে বুঝতে পারে না। মর্গে নিয়ে যাবে ওরা বিনুকে তাতে হয়তো জানা যাবে তার মৃত্যুর সময় বা কীভাবে তাকে মরতে হল এই সব অবান্তর তথ্য। অবান্তর— কেননা গায়ত্রী মোটামুটি বুঝে গেছে ব্যাপারটা পুলিশ এবং তারাও অতলে তলিয়ে দেবে। চাপা পড়ে যাবে আবার বিনু —এবং সেইখান থেকে তার আর উদ্ধার নেই।

তবু সান্ত্বনা যে ব্যাপারটার পরিণতি সে বুঝে ফেলেছে। আশ্চর্য তাতে সে যেন খানিকটা স্বস্তিও পাচ্ছে। মর্গে গিয়ে বিনুকে শনাক্ত করার আগেই বিনু শরীরে অপরিচিতের চিহ্ন ফুটিয়েও চিহ্নিত হল বিনু বলেই। গায়ত্রী বিনুকে বলতে গেলে না-বুঝে মানুষ করেছে। মাতৃস্তন্য পায়নি বলেই কি ও এত নির্দয় মমতাশূন্য জীবে পরিণত হয়েছিল? এখন তো ওকে কোনও অচেনা জীবের মতোই লাগছে। আঙুল থেকে এখন আর খোলা যাবে না — বিনুর বাঁ হাতে আর ডান হাতের মধ্যমায় দুটি আংটি আছে। বিনু 'অরণ্যদেব অরণ্যদেব' খেলত ছেলেবেলায়। ডান হাতে আংটি পরত। ধাঁই ধাঁই ঘুষি চালাত বন্ধুদের গালে ছাপ

ফোটাবার জন্য। কানাঘুষোয় বাড়ির সবাই জেনেছিল বিনু মদ খায়। কিন্তু বাড়িতে কোনও দিন খায়নি বলে ব্যাপারটা সবাই বিশ্বাস করেনি। কিংবা সদাশিব ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করত না। বিনুর অর্শ ছিল তাই গায়ত্রী সরিবাতলির সাধুবাবার ওষুধ খাইয়েছিল ওকে আবার হাতে তামা দিয়ে ওই বিচিত্রবর্ণ পাথরটি—ওখান থেকেই একটি হরিতকির বিনিময়ে নেয়া, বাঁধিয়ে দিয়েছিল। ওগুলো পরে পাওয়া যাবে এস আই বলে।

গায়ত্রী বাড়ি এসে বাবাকে বলে, 'বইস্যা আছ ক্যান? এম এল এ-র বাড়ি যাওন লাগে।'

'ক্যান; অ্যাম অ্যাল এর বাড়ি যামু ক্যান? আমি পাপ করি নাই।'

'আহ্ বাবা, ঠিকাসে তুমি মহৎ, মহা পুইণ্যবান ব্যাক্তি। কিন্তু বিনু তো পাপী ছিল। কাইল হকালে পুলিশি হজ্জৎ ঠ্যাকাইবা ক্যামনে?'

সদাশিব এবার ওঠেন। তৎপর হন। সংহিতা বলে, 'বাবা দুটো খেয়ে যাও। আমি রান্না করেছি। দিদি তুইও চান করে খেয়ে নে। বডি নিয়ে আসানসোল যেতে হবে না? পুলিশের গাড়িতে যাবি না অন্য গাড়ি ? বিশুদারা গাড়ির ব্যবস্থা করেছে।'

বডি! লাশ! মড়া! এখন এই সব শব্দেই বিনুকে বোঝানো। চেনানো। গায়ত্রী বলে, 'বাবা আমি আগে যাই। আন্না, (সংহিতার ডাক নাম) আমি খাব না। কেমন গা গুলোচ্ছে।'

'তাহলে চান করে আয় ভালো করে। শরবত করে দিচ্ছি, যা গরম!' বলে, সংহিতা মায়ের কাছে যায়। বিনু মাকে বলত 'মা জননী বহু পূর্বেই গত হইয়াছেন। দেখিস না কোনও সাড় নেই? কেমন মরা চোখে তাকায়, ভাঙা ভাঙা সেন্টেন্সে কথা বলে, কেমন চমকে চমকে ওঠে? আসলে দ্যাট লেডি ফাদারের ভয়েই মরে আছে। ঘেন্না করি আমি। থুঃ।'

বিনুর কোনও মামার বাড়ি নেই। কিংবা আছে। কিন্তু থাকলেও তা না-থাকারই মতো। বাংলাদেশ হওয়ার পরে বিনুর মা একবার/দু-বার মিনমিন করে বলেছিলেন ওপার বাংলায় খোঁজ নেয়ার কথা, কত লোকই তো হারানো সম্পর্ক ফিরে পাচ্ছে, সদাশিব ধমকে দিয়েছিলেন। আসলে তখন নতুন করে শরণার্থীর ভিড়। যুদ্ধের আগে ও মধ্যে তার চেনাজানা অনেক কোয়ার্টারসেই আত্মীয়স্বজনের ভিড়। বাংলাদেশ হবার পরে তাদের বেশির ভাগই পদ্মা পার হবে। সদাশিব তেমন কাউকে আশ্রয় দেননি বা তেমন কেউ আশ্রয়ের জন্য তাঁর কাছে আসেনি। বড় মেয়ে গায়ত্রী সবে দেড় বছরের, স্ত্রী আবার সন্তানসম্ভবা। ছোটভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। দিদির শ্বশুরবাড়ি আসাম। সে এতদূর যে, জীবনে কোনও দিন সেখানে যেতে পারবেন বলে সদাশিব স্বপ্নেও ভাবেন না। কিন্তু নিজের ছেলেই তার নানা আপদের বালাই ছিল যখন সে বেঁচে ছিল, এখন মরেও সে বালাই ঘোচে না। বাড়িতে কেউই খায়নি। সদাশিবের বুড়ো বয়েসে বড্ড খাইখাই হয়েছে। একবার বললেন, 'তোরা খাবি না?' তোরা মানে সংহিতা আর বিনুর মা। সংহিতা আরও দু-হাতা ভাত দিয়ে বলল,'তুমি খাও তো।'

গায়ত্রী সন্ধ্যার পর ফিরল। এসেই চান করল। সংহিতা চা নিয়ে এল।

'মা খেয়েছে? তুই?'

'না। আমি আর কী করে করে খাই বল? আটা মেখে রেখেছি মালাকে রুটি করতে বলেছি। খেয়ে নে। বাবা তোর কাছে চাবি চাইতে বলল।'

'চাবি! কিসের চাবি?, ও, বুঝেছি, বিনুর ঘরের চাবি। তা তুই দিলি না কেন?'

'ঠিক বুঝলাম না কেন চাইছে। ভাইয়ের ঘরে তো অনেক জিনিস, টাকা পয়সাও থাকতে পারে। বাবার কী দরকার!'

গায়ত্রী কেমন চমকে ওঠে বোনের কথায়। মুখে বলে, 'তুইও ঢুকলে পারতিস। অ্যালার্ম ঘড়িটা ও নিয়ে গিয়েছিল কি না দেখতে হবে। জামাকাপড় ব্যাগ তো বুঝব না কী নিয়েছিল না-নিয়েছিল।'

'আমার ভয় করে দিদি। ভাই না বললে কোনও দিন ঢুকেছি? আর এখন তো আরও ভয় করছে। তুই দেখলি কী করে? বাবা বলছিল ওটা নাকি বিনু নয়—''পাপীর বডি। শয়তানের মড়া'' এই সব।'

'চাবি বাবাকে দে। আর বাবা কি দাশকাকুর কাছে গিয়েছিল?'

'তোকে যেতে বলেছে কাল সকালে। আজ দাশকাকু একটুখানি শুনেছে, তাছাড়া সবাই তো জেনে গেছে দিদি, বাড়িতে পুলিশ আসবে নাকি? পাড়ার সবাই বলাবলি করছে।'

'পাড়ার খবর, কোথা থেকে পেলি?'

'মালা বলছিল।'

'এইজন্যে আমি ঠিকে লোক পছন্দ করি। বাড়িতে সর্বক্ষণ বাইরের লোক থাকলে কোনও প্রাইভেসি থাকে না।' কথাটা নিজের কানেই ঠাট্টার মতো শোনাল গায়ত্রীর। প্রাইভেসি।

গায়ত্রীকে শ্মশানে যেতে বারণ করেছিল সবাই। এমনকি বিনুর মাও। গায়ত্রী ওষুধ আর মাংসে পচা গন্ধসমেত বিনুর কাটাছেঁড়া মাংসের স্তূপ নিয়ে ফিরল শেষে বিকেলে। বন্ধুরা আর স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা বিনুর শেষযাত্রার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। বিনুর মা ছেলেকে দেখতে চাইতে, গায়ত্রী রাজীব গান্ধী স্টাইলে বিনুর একটি বাঁধানো হাফ বাস্ট ছবি চাদর ঢাকা মৃত শরীরের মাথার দিকে রেখে বলে, 'দ্যাখো, নইলে তোমার বিনুরে চিনবার পাবে না। বিনুরে অহনে দেইখ্যা কী অইব?' ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে যায় বিনুর মাংসপিণ্ড, কয়েক শিশি সুগন্ধি ঢেলে দেয় সংহিতা।

বাবাকে ডাকে গায়ত্রী, 'আসো। পোলাডারে দেইখ্যা যাও। জীবনে তো দ্যাখো নাই, মরণেও দেখবা না?' সদাশিব হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন।

এত চোখের জলও বিনুর জন্য ছিল? গায়ত্রীর সঙ্গে যারা ছিল এ ক'দিন, আসানসোল যাওয়া-আসা, মর্গ পর্যন্ত যাওয়া আর মর্গ থেকে আসা, বিনুকে নিয়ে গায়ত্রীর সঙ্গে, তারাও কেঁদে ফেলে।

'এভাবে বিনুকে খুন করবে তা বলে?' একজন বলে। যেন অন্যভাবে, খুব নরমভাবে, দয়া দেখিয়ে খুন করা যায়। আবার তাহলে তো বিনুর হত্যা এক পরোক্ষ সমর্থনও পেয়ে যায়।

'ছাড়বেন না ওদের। বিনুর মতো ছেলে — কতজনকে কতভাবে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে।'

সংহিতার সরু ধাতব গলা শোনা যায়, 'ভাইরে..... ও হো হো'। এভাবেই বিনু তার বন্ধুদের, যারা তার টাকায় ফূর্তি করত, সমবেদনা, তা আন্তরিকই বলা বাহুল্য, পায়। ড্রাইভার খালাসি আর কন্ডাকটারদের আক্ষেপ আর দুঃখ পায়। এইসব পাথেয়, মরজীবনের ওপারে যদি কোনও জীবন থাকে সেই জীবনের পাথেয় সে পেল এই মর্ত্যেই—তার ফুলে ওঠা, রসগড়ানো, পচা নশ্বর দেহটি ঘিরে এইসব, ব্যথাময় আবর্ত তৈরি হয়েছিল, এমনকি সেইসব মায়াঘূর্ণিতে তার সদাত্রস্ত জননী ও ক্রুদ্ধ পিতারও কিছু অবদান ছিল। বুক মুচড়ে ওঠা এক আকস্মিক শোক তো কিছু অশ্রুপতন সাময়িক হলেও ঘটিয়েছিল। বাবা-মা আর দিদিদের নিয়ে যে পারিবারিকতায় বিনু জীবিতাবস্থায় ঢুকতে পারেনি, কয়েকটি বিহ্বল মানবিক মুহূর্ত মৃত বিনু সেই বৃত্তটি রচনা করে ও তাতে অন্তর্গত হয়। সেই সাময়িক বিহ্বলতায় বিনুর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত নানা ছবি ও স্মৃতি নানাদিক থেকে সবার মনে ভেসে ওঠে ও মিলিয়ে যায়।

'বিনুর ঘরে ঢুকসিল্যা বাবা?' শ্মশান থেকে ফিরে ক্লান্ত গায়ত্রী জিগ্যেস করে।

'হ। কিসস্যু নাই।'

'ঘড়িটা? অ্যালার্ম ক্লকটা বলছি?'

'আসে। জামাকাপড়, চাদর, রেডিয়ো, উয়াকম্যান,কত কী আসে। জুতার বাহার কী। কিন্তু আসল জিনিসটাই নাই।'

'সেটা আবার কী?'

'ট্যাহা। মোটে আড়াইশো আর কিছু খুচরা। ব্যাঙ্কের পাস বই তো কিসু দ্যাখলাম না।'

'বিনু ব্যাঙ্কে টাকা রাখত না। স্যুটকেশ, ব্রিফকেশ, আলমারি সব দেখেছ?'

'আলমারিটাই দেহি নাই। চাবি তর কাছে?'

'কী আশ্চর্য, চাবি আমার কাছে কেন থাকবে? ওটা ওর পার্সোনাল ব্যাপার।'

'তা অইলে? গদরেজের আলমারি—ডবল চাবি তো থাকব। কাইল আর এগবার দেইখব।'

রাতে সংহিতা দিদির গায়ে হাত রাখে,'দিদি বিনুর আলমারির চাবিটা কোথায় জানিস? হয়তো ও সব টাকা আলমারিতেই রেখেছিল। কত টাকা কে জানে। হাজার হাজার না লাখ কয়েক? অ্যাই দিদি ঘুমোলি নাকি?'

ঘুম মাখা গলায় গায়ত্রী বলে, 'তুইও কি বাবার মতো পাগল হলি? ঠিকাছে বাবা, কাল তোরা দু-জনে মিলে খুঁজিস।'

'পোলাডারে অমন কইর‍্যা মাইরা কী লাভ অইল তদের? মাথাটা বেবাক ফাঁক কইর‍্যা ঘিলু বাইর কইর‍্যা দিসে। দাঁতগুইল্যা উপড়াইসে। হাত পাওয়ের শিরাগুলি কাটসে। কত টাইম লাইগল য্যান পাপীডা কিসুতেই না বাঁসে। অসুরের হক্তি সিল তো গায়ে। ক্যান?

একখান পিস্তল দিয়াই তো শ্যাষ করন যাইত। যাক গেসে বালোই অইসে। আমার কী? ঘরে এট্টা ট্যাহাও রাহে নাই। সব জুয়ার ঢালসে। বালোই অইসে—অই পাপের ট্যাহা আমি ধইরতাম না। বালোই অইসে।'

ডাবরমোড়ের দোকানে দোকানে সদাশিব এইসব বলে বেড়ান। আর রাত হলেই পা টিপে টিপে ছেলের ঘরে যান। পাগলের মতো চাবি খোঁজেন। বিনুর আলমারির। দেয়ালে মাধুরী দীক্ষিত, শচীন তেণ্ডুলকার, মারাদোনা, আর ব্রুস লি। যে যার মতো। শুধু এক নকল মোনালিসা রহস্যময় হাসির বদলে ঠোঁটের ভঙ্গিতে ফিচেল হাসি ফুটিয়ে যেদিকে সদাশিব যান সেদিকেই তাকায়।

এস আই-টি অল্পবয়সি, বছরখানেক হল এসেছে। এখানকার জলহাওয়া তেমন মানিয়ে নিতে না পারলেও আবহাওয়ার গতিবিধি বোঝে। গায়ত্রীকে জিগ্যেস করে,

'কালপ্রিটগুলোকে ছেড়ে দেবেন?'

গায়ত্রী আসল কথাটা বলতে পারে না। সদাশিবকে অন্ধকারে বাড়ির সামনেই কয়েকজন শাসিয়ে যায়, 'চুপচাপ থাকবি, নইলে বাংলা করে দেব।'

'বাবার বয়স হয়েছে। মা অসুস্থ। আমি তো এখানে থাকি না। যা হবার হয়েছে। ওদের ধরলে বা ফাঁসি হলেও আমার ভাই তো ফিরে আসবে না।'

নিজের ভীরুতা এভাবে চাপা দিয়ে গায়ত্রী মরমে মরে যায়। তার যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে সেও একটা একটা করে ওদের চামড়া ছাড়িয়ে নিত। কী করেছিল বিনু? দু-চার ঘা দিয়ে এমনকি হাত-পা ভেঙে দিয়েও যদি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিত বিনুর শাস্তি হত। কত বড় অপরাধ করেছিল বিনু? সে তো কাউকে খুন করেনি। সে হতে চেয়েছিল অরণ্যদেব। সবার মুশকিল আসান। ক'জনে মিলে মেরেছিল ওকে? কেন? জুয়া কি ও একাই খেলত? ডি ও-র কারবার কি ওর একার? তাছাড়া বাসের ইনকাম তো ছিল। তাহলে?

দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে এল গায়ত্রীর। পরশু তার যাবার দিন। সোমবার তার স্কুল খুলবে। মা গেছে দুর্গাপুর। বিনুর কাজে কাকা কাকিমা এসেছিল। ক'দিন ছিল। খুড়তুতো ভাই আসেনি। সংহিতা আর বিনুর মাকে ওরাই নিয়ে গেছে। বাবার অজুহাত দেখিয়ে গায়ত্রী যায়নি। কাল দুপুরেই ওরা ফিরবে। সদাশিব চিত্তরঞ্জন গেছেন কোন সহকর্মীর কোয়ার্টার্সে। কাপড়চোপড় তুলে মালা নিচে ঘুমোচ্ছে। গায়ত্রী ভাবল যাবার আগে বিনুর ঘরটা পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। বিনুর মৃত্যুর পর সে মোটে একদিনই ঢুকেছিল। না, সেও কিছু পায়নি। সংহিতা ও সে মিলে আঁতিপাঁতি করে সব খুঁজেছে। আলমারির চাবিও পায়নি।

চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে, কুশনকভার সব ও টেনে টেনে নিজেদের ঘরের এক কোণে রাখল। পোশাকের জন্য একটা কাঠের আলমারি। আয়না দেওয়া। বিনুর ময়লা জামা গেঞ্জি সেসবও ও ঘরে রেখে এল। কাঠের আলমারিতে চাবি ঝুলছে। হ্যাঙ্গারে শার্ট

প্যান্ট কোট, পাঞ্জাবি ঝুলছে। আলমারিটা গুছনোই থাকত কিন্তু সদাশিব এমন ওলট-পালট করে ফেলেছেন খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে যে, গায়ত্রীকে সব নামিয়ে আবার গুছোতে হল।

সব ছবিই পোস্টার শুধু বিনুর একটা স্মরণযোগ্য মুহূর্তের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। পায়ের দিকের দেয়ালে স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপটেন বিনুর হাসিমুখ। শূন্যে প্রসারিত দু-হাতের মাঝখানে ট্রফি। ছবিটা নামাবার আগে বিছানাটা উলটে-পালটে ঝাড়তে গিয়ে খান তিনেক চটি বই, মলাট দেওয়া দেখতে পেয়ে, — নকশাল ছিল নাকি বিনু? এখন আর নকশালই বা কই এখানে? চিত্তরঞ্জনে আই পি এফ-এর কিছু ছেলে আছে। কোনও নিষিদ্ধ বই? পলিটিক্যাল? তবে কি মাও-এর কোনও বই? ভয়ে ভয়ে বই খোলে গায়ত্রী যদি বিনুর হত্যা সম্পর্কে রাজনীতি এসে থাকে এই ভেবে।

ছবি দেখেই গায়ত্রীর কান গরম হয়ে উঠল। ছাড়া ছাড়া দুটো-চারটে বাক্য পড়েই তার শরীর শিউরে উঠল। ঘেন্নাও করল। এইসব বিনু পড়ত? এইসব ছবি বিনু নিভৃতে নির্জনে দেখত? হায় ভগবান। তবে কি নারীঘটিত কোনও ব্যাপারে বিনু জড়িয়ে পড়েছিল? কিন্তু সদাশিব তো এগুলি দেখেছেন। বইগুলো পুড়িয়ে দেবে, না যেমনটি ছিল তেমনটিই রেখে দেবে; যাতে বাবা না বোঝেন গায়ত্রী এসব দেখেছে? কিন্তু সংহিতা যদি দেখে? সেও তো খুঁজতে আসে আলমারির চাবি। যতই বলুক সে বিয়ে করতে চায় না আসলে ওটা নিজের কমপ্লেক্স্ চাপা দেওয়া। গায়ত্রী তো প্রেমে পড়তে চায়। তা বাইরে সে যতই উদাসীন ভাব দেখাক। মেসে মেয়েরা যা আলোচনা করে গায়ত্রী সহ্য করতে পারে না। সে যদি সুন্দরী না হোক, মোটামুটি সুশ্রী হত তাহলে দু-চার কথা শুনিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে তা পারে না। সবাই ভাবত তার রূপ নেই বলে সে ঈর্ষাকাতর।

কিন্তু বিনু? গায়ত্রী একটা পলিপ্যাকে বই তিনটে নেয়। ট্রেনের জানলা দিয়ে কুচি কুচি করে ফেলে দেবে সে। নয়ত ময়লার সঙ্গে আজই পুড়িয়ে দেবে নিজের হাতে। সিদ্ধান্তটা নিয়ে সে বেশ সুস্থ বোধ করে। বিনুর জগ থেকে কতদিনের বাসি জলই ঢকঢক করে খেয়ে খালি করে দেয় ওটা।

বিনুর ছবিটার নিচে ধুলো পড়েছে। ঝুল হয় এখানে খুব। লম্বা লম্বা সুতোর মতো লালা দিয়ে দেয়ালের কোণ পর্যন্ত টানা জালে কয়েকটি মরা পোকার ছিবড়ে আর চুপ করে বসে থাকা উর্ণনাভটি। আহা। — গায়ত্রী খাটের ওপর দাঁড়িয়ে ফটোটি পেড়ে আনতেই ঝিনঝিন মৃদু শব্দ। উলটোদিকে ঘোরাতেই ফটোর দড়িতে আটকানো চাবির রিং। দু-জোড়া চাবিই পাওয়া গেল।

এখন এই চাবি নিয়ে কী করবে গায়ত্রী? খুলে দেখবে নাকি কত টাকা জমিয়ে রেখেছে বিনু আলমারিতে? তারপর? নাকি বাবাকে দেবে চাবি? পাগল! টাকা দেখলে বাবা হার্টফেল করবে আনন্দে আর না-দেখলে করবে হতাশায়। তবে কি সংহিতাকে দেবে? না তাও না। কী করবে চাবি নিয়ে গায়ত্রী বুঝতে পারে না। তবে কি চাবিটা ফেলে দেবে যেমন ভাবে

পর্নোগ্রাফির নিদর্শনগুলো নষ্ট করতে চাইছে অনায়াসে, দ্বিধাহীন ভাবে? যদি ওগুলো বাবার কথায় পাপের টাকাই হয় তাহলে সেসবও কি পুড়িয়ে ফেলা উচিত নয়। অবশ্য যদি আলমারিতে টাকা থাকে? টাকাগুলো দিয়ে যদি কোনও পুণ্যকাজ করা যায় তাহলে কি বিনুর পাপস্খালন হবে? কোথায় দেবে টাকাগুলো? বন্যাত্রাণে? খরাত্রাণে? মাদার টেরিজার শান্তিনগর কুষ্ঠাশ্রমে? স্প্যাসটিক সোসাইটিতে? রামকৃষ্ণ মিশনে? কেউ যদি জিগ্যেস করে অত টাকা তুমি পেলে কোথায়? বিনুর শত্রুরা যদি টের পায়? না, এ টাকা সে দেখতে চায় না, যে-টাকা ভয়ে ভয়ে রাখতে বা খরচ করতে হবে তেমন টাকার কথা বাবাকে বলেও লাভ নেই। তার চাইতে আমৃত্যু বাবা খুঁজে যাক বিনুর আলমারির চাবি। মিস্ত্রি ডেকে বা গোদরেজ কোম্পানির কাছ থেকেও চাবি বানানো যাবে না জানাজানি হবার ভয়ে।

খুঁজুক বাবা খুঁজুক আর দোকানে দোকানে হাটে বাজারে বিনুর কথা বলুক আর আক্ষেপ করুক, গায়ত্রী এ চাবির কথা আপাতত কাউকে বলছে না। চাবিজোড়া সে সঙ্গে নিয়েই যাবে। বাক্সের তলায় ফেলে রাখবে ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত। নষ্ট করলে বা ফেলে দিলেও তো চাবির কথাটা সে ভুলতে পারত না।

বিনুরই একটা ছেঁড়া গেঞ্জি ন্যাতা করে গায়ত্রী সযত্নে ঘর মুছতে শুরু করল। ভিজে ন্যাতা দিয়ে নিজের চোখের জলও সে মুছে ফেলবে মেঝে থেকে এটাই তো স্বাভাবিক।

দিবারাত্রির কাব্য ১৯৯৮

নিষিদ্ধ প্রশ্ন

অধ্যাপনা ছেড়ে আমার ছোটবেলার বন্ধু ঈশা এখন পুরোদস্তুর সাংবাদিক। খবরটা পুরনো হয়ে যাবার পর জানতে পারি সীমান্ত থেকে পাঠানো ওরই একটা চিঠিতে। ওর সেই অলোকসামান্য চিঠি। যার দুটো পাঠ। গোটা চিঠি জুড়ে ওর এখনকার রোমাঞ্চকর, ভয়ংকর ও দুঃখময় অভিজ্ঞতার বিবরণ। লেখক হিসেবে এটি আমার একটি পাঠ। আর অন্য একটি পাঠ উদ্ধার করে নেয় পারাপারহীন অতল খাদের এপার থেকে যেন ওরই দ্বিতীয় সত্তা, ওপার থেকে পাঠানো ওর নিজেরই বলা কথা শোনে ও নিজেই। '..... জানো রু, শখ এখন আমার জীবিকা। ফ্রিল্যান্স করতুম যখন, লেখা ছাপা হোক না হোক এক রকম স্বাধীন ছিলাম। সেই স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় হারালাম, অন্য এক প্রাপ্তির আশায়। তার একটি হল হাতিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি আর সমগোত্রের মানুষজনের সঙ্গে আরও যোগাযোগ, তার মানে পৃথিবী জুড়ে যেখানেই আত্মবিনাশী কাজকর্ম সেখানে অনেক সহজে পৌঁছে যাওয়া। কাগজের জন্য পাঠাচ্ছি এক খবর, আর তোমার কলমের জন্য পাঠাচ্ছি অন্য এক খবর, কারণ তোমার লেখনী এখনও স্বাধীন— তার বিচার সময় আর পাঠকের হাতে। পরমাণু বিস্ফোরণের ওপর তোমার লেখাটা তো ছাপা হয়েছিল, বলো? তোমার ভাবাতেই বলি—'একজন সম্পাদক খুব বেশি হলে লেখাটি ছাপবেন না, কিন্তু তাতে লেখা বন্ধ হয় না। তোমার ঈশা।'

কতদিন ঈশার সঙ্গে দেখা হয় না।

দুই

পাহাড়, উপত্যকার সবুজ, বরফ শীতল নদীস্রোত, কতরকম ফুলের রঙিন বাহার, ওপার থেকে আখরোট খোবানি-কিসমিস-খেজুর আসে তো এপারের নিমক চলে যায় ওপারে অন্যান্য দরকারি কি শখ সৌখিনতার জিনিসের সঙ্গে। এপারের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না ওপারের সঙ্গে মেশে। গান আর নাচের ফূর্তি ভরা ছেলে-বুড়োর এক দলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, হাতের মুদ্রা আর পায়ের ছন্দ মিলিয়ে, ঈশা সফর করেছিল পাহাড়ি পথে, চলতে থাকা একটি বাসের ছাদে। ঈশার ব্যক্তিগত অ্যালবামে সেই খণ্ড সময় অনন্তের জন্য ধরা আছে।

এ হল গত বছরের কথা, পরমাণু বিস্ফোরণের আগের কথা। আর এক বছর যেতে না যেতে ঈশা ঘুরে বেড়িয়েছে ওপারের পাঠানো মৃত্যুদূতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত বাস-বসতি আর ভীত, সন্ত্রস্ত, শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর তাড়নায় সাময়িক বাস্তুহারা মানুষজনের উৎকণ্ঠা ভরা আর পরিত্রাণহীন নিরানন্দের মধ্যে।

'আমি সব হারিয়ে ফেলেছি রা। আমি কে, কোন ভূখণ্ডে আমার বাঁচা-মরার অধিকার, কেন এসেছি এই পরিকল্পিত অথচ অর্থহীন পাগলামির মধ্যে, ধ্বংসে আর হত্যার বিবাদে-উল্লাসে? বেদিয়ার কথা মনে পড়ে, পরমাণু বিস্ফোরণের নারকীয় মেঘের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল — "যো কুছ হো রহা হ্যায়, সব কুছ ভগওয়ানকা খিলাফ হো রহা হ্যায়। কিসিকা ভালা নহি হোগা অন্তমে।" কোন অন্তের কথা বলেছিল সে? তোমার গল্পের সেই মেয়ে—পানির তলাশে যে ধরিত্রী গর্ভে হারিয়ে গিয়েছিল?'

ঘুরতে ঘুরতে ঈশা পেয়ে যায় গাছের পাতার ফাঁকে আটকে থাকা একটি লেফাফা। রক্তে ভেজা। তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে গোপন, নারকীয় এক দৃশ্য যা কোনওদিনই ছাপা হবে না। মোট তিনটি ছবি ও আমাকে পাঠায়।

তিন

ছবিগুলোর দিকে আমি তাকাতে পারি না—এতই ব্যথা, আর্তি ও হাহাকার ভরা সেগুলি। তবু দেখি, মানুষকেই তো দেখতে হয় এইসব মানুষী কীর্তি। তার মধ্যে একটা হল ইনতেজারের ছিন্নশির। যে লেফাফাটি ঈশা পেয়ে যায় তার ভেতরের চিঠিতে রক্তাক্ত অস্পষ্ট অক্ষরে শুধু সম্ভাষণ আর পত্রলেখকের নাম পড়তে পারা যায়। চিঠির ভাষা আমার শ্রবণবোধ্য হলেও হরফে চিনি না। ঈশা হয়তো সামান্য জানতে পারে। হয়তোই। 'তাতে কিছু যায় আসে না'— ঈশা লেখে, 'এই পৃথিবীর এক অখ্যাত গাঁয়ের এক দাদিকে তার নাতি লিখেছে রণক্ষেত্র থেকে। সে চিঠির ভাষা বোঝা কি খুব কঠিন?' লেখাও রক্তে প্রায় ঢাকা। চিঠিটার লেখক ওই ছিন্নশির ব্যক্তিটি কি না জানি না বা আর একটি ছবির বিধ্বস্ত ট্রাক আর ছড়িয়ে পড়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কোনটা কার তাই বা বুঝি কী করে? পোশাকের ভিন্নতা দিয়ে চিনে নেবে তারা যারা গোর দেবে, বা দাহ করবে। সেই শ্রমবিধ্বস্ত মানুষগুলির ভাবনাচিন্তা আমার ধারণার বাইরে।

ঈশা আমার কষ্ট এবং শ্রম অনেক কমিয়ে দিয়েছে, লিখেছে — '৯১ তে গালফ্ ওয়ার কভার করতে পারিনি। দ্বিতীয়বারেও না। কসোভোতেও যেতে পারলাম না। কিন্তু যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক "এ সবই ভগওয়ানকা খিলাফ"— ধর্মই বলো আর রাষ্ট্রই বলো, হত্যা আর ধ্বংসের দিকে যেন এই অনিবার্য ও নিরুপায় পতন।' ঘুরে ঘুরে ঈশা পিঁপড়ের মতো কণা কণা করে তার অভিজ্ঞতা সাজায় — যুদ্ধের বাস্তবতার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে অন্য এক বাস্তবে ঢুকে পড়ে। সেই বাস্তবে সে ইনতেজারের বুড়ি দাদিকে চিনে ফেলে, ওপারে একশো কিলোমিটারের মধ্যেই তার ঘরের ভেতরে ঘুর ঘুর করতে করতে এটা নাড়ছে, ওটা ভাঁজ করছে, আর আল্লার কাছে দোয়া মাগছে তার নাতি যেন সহি সালামত থাকে। ইনতেজার ফৌজিদের দলে নাম লেখানোর পর থেকেই দুনিয়া বিবির মুখে বয়সের বলিরেখার সঙ্গে সঙ্গে দুই ভুরুর মধ্যিখানে ফুটে ওঠে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। যেন শুকিয়ে যাওয়া কোনও ক্ষতচিহ্ন। মহরমের আগেই জরুরি তলব পেয়ে ছুটি কাটাতে আসা ইনতেজার

চলে গেল কোন দূর পাহাড়ের মাথায়। তার চিঠিতেই বুড়ি জেনে যায় সেই বরফ ঢাকা পাথুরে পাহাড় চূড়োর কথা, নিচের দিকে পাইন, ফার, চিনার, এসকল দীর্ঘ তরুরাজি, লতাগুল্ম ভরা হরিৎবর্ণ উপত্যকা আর তুষার শীতল পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া নদীস্রোতের কথা। জমাট বাঁধা ঝর্ণার কথা। দুশমনরা তাদের ওপর বোমা ফেলছে, কামান দাগছে, বুলেটের বারিষ বইয়ে দিচ্ছে এই সব হাড় হিমকরা কথার পাশাপাশি তাদের লড়াই-এর কথাও। কাফের আর মুশরিকদের কেমনভাবে খতম করছে তারা এ খবরটি পেয়ে বুড়ি খুশি হতে পারে না। তার স্বামী বলত, সব কিছু আল্লারই সৃষ্টি। তাহলে সেই পাহাড়চূড়ো তুষারময় সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ তো দুনিয়ার শোভা বাড়াবার জন্য খোদা বানিয়েছেন। তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন কে কোথায় জন্ম নেবে, আর কে কোথায় মাটি নেবে। একটা বকরি পর্যন্ত চরে না সেই পাহাড়চূড়ো নিয়ে লড়াই! গাঁয়ের মাতব্বর যাঁরা তাঁরা বলেন, এ তাঁদের ফর্জ। তাঁদের ছেলেদেরও ফর্জ। পবিত্র কিতাবে নাকি এসকল আছে। বুড়ি অতশত জানে না শুধু জানে আল্লাহ দয়াবান, পরম করুণাময়। বিধর্মী যদি তোমার শরণ নেয় তুমি তাকে আশ্রয় দেবে। আল্লাহ্‌র করুণার কথা শোনাবে। সে যদি তওবা করে তাকে হত্যা করবে না। তার ছেলে রহমত, ইনতেজারের মৃত পিতা, এসব পড়ে শোনাত তাকে। সে ছেলের শখ ছিল মোয়াজ্জিন হবে। মসজিদের মিনার থেকে তার আজানের সুর শষ্যক্ষেতের ওপর দিয়ে গাছগাছালির ওপর দিয়ে আসমানের দিকে উঠে যাবে। আল্লাহ্‌র মহিমা, তাঁর গুণের কথা, রহমের কথা শুনতে শুনতে ফজরের নামাজ শুরু হবে। দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে তার স্বর যেন সবাইকে মনে করিয়ে দেয় হৃদয় মন থেকে পাপ ধুয়ে ফেলার কথা কিন্তু সে, যে-চাষা সে চাষাই হয়ে থাকল। বাপ মরে গেলে মক্তব ছেড়ে, মাদ্রাসা ছেড়ে ছেলে মাঠে চাষবাসের কাজেই লেগে যায়। কিন্তু গাঁয়ের মাতব্বররা তাকে দেখতে পারত না। তারা বলত রহমতের মনের কোণে কাফেরদের জন্য মহব্বত আছে, নইলে এসব কথা সে বলে কেন?

রহমত একদিন আচমকাই মারা পড়ল মাঠের মধ্যে। ওর বিবিও। রহমত দুপুরে খেতে আসত, সেদিন আসেনি বলে সাবিনা খাবারের পুঁটলি নিয়ে স্বামীর কাছে যায়। আকাশভরা মেঘ ছিল, বর্ষণ ছিল ভোর থেকে, বেলা বাড়লে বৃষ্টি কমে, কিন্তু আবার নতুন করে কোথা থেকে মেঘ আসে, হাওয়া আসে যেন অপার্থিব আর অকস্মাৎ অশনিপাতে রহমত আর তার বিবি পুড়ে কালো হয়ে গেল। তা এসকল নাকি আল্লাহ্‌র শাস্তি। তাঁর আয়াতসমূহের বিকৃত অর্থ করার জন্য ভয়াবহ শাস্তি দিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং। কতিহার সময় দুনিয়া বিবির বুক ঢিবঢিব করছিল। গলা এত শুকনো ঠেকছিল যে কথা বেরোচ্ছিল না— ভয়ে পানি পর্যন্ত খায়নি যেন সেদিনই তার কেয়ামতের দিন, কিন্তু পড়শি মইনুলের কথায় সব ঠিক হয়ে গেল। শুধু কিছু জমি জাকাতের জন্য গেল। তা যাক, তবু তারা যে শেষমেশ দোজখে যায়নি এটা ভেবে দুনিয়া বিবির মন পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে আসে।

অবিশ্যি এখনও সে বুঝে উঠতে পারেনি ওই বজ্রপাত ও অমন অনাবশ্যক, নিষ্ঠুর

মৃত্যুর কারণ। আল্লাহ্‌র এ কেমন করুণা দুনিয়া বিবি সেদিনও বোঝেনি, আজও বোঝে না। শুধু এক অজানা ভয়ে ও দিন দিন কুঁজো হয়ে যায়। যেন এক জিন ভয়ের বস্তা হয়ে ওর পিঠে চেপে বসেছে। সমস্ত ভয় ক্রমে নিজের ভেতর লুকিয়ে, বহন করে ও বড় করে তুলল নাতি ইনতেজারকে। দশটি সন্তানের মধ্যে বেঁচেছিল শুধু রহমত। সেই রহমত তার বউ নিয়ে মাটির নিচে শুয়ে থাকল, বজ্রদগ্ধ শরীরে। বুড়ি ভাবে তার চামড়াটা কেউ যদি ছাড়িয়ে নিত তো দেখতে পেত তার অস্থিমাংসে সকলই দগ্ধ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। পরম করুণাময়কে সে ভয় পায়। যেন সে এক শবাধারের ভেতর শুয়ে কেয়ামতের দিন গোনে। সেই আঁধারের ভেতর বাস করা দুনিয়ার চোখে রোশনাই জ্বলে উঠত ইনতেজারের বড় হয়ে ওঠায়, তার নির্ভীক কথায়, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ভরা হাসিতে, শরীর ভরা যৌবনের গন্ধে, যে-বাস সে পেত তার সন্তানের শরীরে। সে ভেবেছিল নাতি তার বাপের মতো লেখাপড়া করুক, নয় তো চাষবাস করুক, জমিজমা যেটুকু আছে দেখুক, ডাকাতের জমি ফেরত পাওয়ার কথা সে মনেও ভাবে না, কিন্তু আরও খানিক জমি তাদের দরকার। ইনতেজারের জন্য পাত্রী সে ঠিক করেই রেখেছে— সেই শাদি হবে, ঘর ভরে উঠবে ছেলেপুলেয়। তখন হয়তো তার দগ্ধ শরীরটা কবর থেকে বেরিয়ে আসবে, আসমানের নিচে দাঁড়িয়ে শ্বাস নেবে বুক ভরে, তারপর শান্ত পায়ে তার ছেলের কাছে চলে যাবে একদিন।

হায়, অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌, সে কি খুব বেশি চাওয়া?

চার

ইনতেজার ভাবছিল আল্লাহ্‌র রহম তার ওপরে যে তার শাদি হয়ে যায়নি। বেঁচে গেল মেয়েটা। কী যেন নাম বলেছিল দাদি? 'এবার বাড়ি এলে মইনুল মিঞার বিটির সাথে তোর শাদি দেব রে ইনতেজার।' বলেছিল দাদি — শাদা চুল ভরা মাথা নাড়িয়ে, দন্তহীন মুখে হাসি ফুটিয়ে। জ্ঞান হওয়া ইস্তক দাদিকেই জেনেছে সে। তাকে পালপোষ করে ডাগর ডোগর করে তুলেছে ওই দাদিই। তার স্মরণে কোনও আম্মাও নেই, আব্বাও নেই। মাজা বেঁকিয়ে শরীরের উর্ধ্বাংশ জমির সমান্তরালে রেখে হাঁটে বুড়ি দাদি। আর শরীরের অমন ভঙ্গিমার জন্যই বোধ হয় দুনিয়া বিবি ভারি বোঝা মাথায় নেওয়া মানুষের মতো হাঁটে, একটু দ্রুত লয়ে।

মইনুল চাচা তাদের জমিটার দেখভাল করে, লাগোয়া নিজের জমিটার সঙ্গে। দাদি বলত, 'বুড়ো চাচাকে রেহাই দে বাছা, ঘরে বোস, চাষবাস কর, শাদি কর, আমি দেখে যাই।' তো কার কথা কে শোনে! ইনতেজার চাষের কাজ জানে কিন্তু সে হতে চাইত ফৌজি। লাঙল ঠেলার চাইতে রাইফেল চালানো তার বেশি পসন্দ্‌। সৈনিকের ইজ্জত আলাদা ব্যাপার। সে যদি মিলিটারি কলেজে পড়ত তাহলে অ্যাদ্দিনে ক্যাপ্টেন, কি মেজর হয়ে যেত।

তা না-হলেও নিজেকে তার ভারি ইজ্জতঅলা ইমানদার সিপাহি বলে মনে হয়। মহরমের আগেই তার সদরে তলব হল। হেড কোয়ার্টার্সে গিয়ে দেখে সাজো সাজো রব। যেদিন তাদের গ্রামে চমৎকার প্রসেসন বেরিয়েছে, তাজিয়া নিয়ে জওয়ান ছেলেরা কেউ কারবালা যুদ্ধের ছবি ফোটাচ্ছে শরীরের আর লাঠি খেলার ভঙ্গিতে, কেউ কেউ 'হায় হাসান হায় হোসেন' ধ্বনিতে বুক চাপড়ে সেই বিস্মৃতিহীন শোকগাথা নতুন করে রচনা করছে, সেদিন সে এই পাহাড় চূড়োর পথে। তাদের তাজিয়া ছিল না, কিন্তু তার স্মরণ ছিল, লাঠির বদলে ছিল নতুন নতুন মারণাস্ত্র।

আর এখন তার যন্ত্রণাদীর্ণ দেহের পাশে, হাতের নাগালে তারই অস্ত্র পড়ে আছে, সে সেটা তুলতে পারছে না। একটু আগে যেখানটায় গোলা ফেটেছে তার আশেপাশে বাষ্প আর ধোঁয়া। বাতাসে বারুদের গন্ধ ঝুলে আছে। তবে কি সে শহিদ হয়ে যাচ্ছে এই নাঙ্গা পাথর আর বরফের রাজ্যে, সাড়ে ষোলো হাজার ফুট উঁচু এই পাহাড়ের মাথায়? হায়, তার আর দাদির কাছে ফেরা হল না। কতদিন সে শষ্যখেতের সবুজ দেখেনি। পাকা গমের হলুদ বর্ণ! দাদি বলেছিল, এন্তেকালের সময় সে যেন বিবি বাচ্চা নিয়ে দাদির কাছে থাকে। পবিত্র কিতাব পড়ে শোনায়। এখন তার গোরেই হয়তো মাটি দিতে হবে দাদিকে যদি দুশমনরা তার লাশটি ফেরত দেয়। তাহলে দেশে ফিরে, মুর্দা হলেও সে ফৌজির সম্মান পাবে। কিন্তু সে ছাড়া দাদির আর কেউ নেই। কত মরণের ভেতর দিয়ে যেতে হয় মানুষকে যদি তার লম্বা উমর হয়। সেই সব মরণ হল আপনজনের মরণ, সে মরণে কলিজা ফেটে যায়। জীয়ন্তে। ইনতেজারের তো তেইশ সাল উমর, এর মধ্যেই সে মরণ দেখেছে অনেক। মরণ হেনেছেও অনেক। আর এবার বুঝি তার পালা। ইনতেজার বলতে চাইল, 'পানি, পানি?' কিন্তু শুকনো গলায় কোনও স্বর ফুটল না। সে যেন বাঙ্কারের ছাদে চাপানো একটা বালির বস্তার মতো পড়ে আছে। তার মাথা এখনও অসাড় হয়ে যায়নি অবশ্য। সেই সচেতন মস্তিষ্কই বলে দিচ্ছে সে মরতে ভয় পায় না। সিপাহি হয় জিতবে নয় মরবে। কিন্তু সে একটাও মুশরিককে খতম করতে পারল না। সে শহিদ হবে হয়তো কিন্তু গাজি হতে পারল না। আহ্, সে যদি আর্টিলারিতে থাকত। দুশমনদের প্লেন ফেলে দিত — কিন্তু ওদের প্লেনও যেন ইবলিশের বাচ্চা— মিসাইলের রেঞ্জের অনেক ওপরে থাকে ওগুলো। কিন্তু ওই ছোকরাগুলো যারা শুধুই লড়াইয়ের জন্য এসেছে, তাদের আর্মির লোকই নয়, তাদের দেখে ইনতেজার তাজ্জব বনে যায়। ইনসাল্লাহ্! কী তাকত আর ইরাদা ওদের! ধর্মের জন্য জান কোরবানি দিতেই এসেছে ওরা। এ জমিন, পাহাড়, নদী আর উপত্যকার দখল না নিয়ে তারা ছাড়বে না। 'হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা যখন কোনও দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।'

তাহলে কেন ওই মুশরিক আর মুলহিদের দল তাদের পিছু হটিয়ে দিচ্ছে? ইনতেজারের মনে পড়ল, মইনুল চাচা লুঙ্গি গুটিয়ে মাঠের মধ্যে ঘুরছেন। কিষানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন, বাতাসে তার শাদা চুল উড়ছে, দাড়িতে লেগে আছে বাসি মেহেন্দির ফিকে

কমলা রং। কাদামাটি মাখা পা ডুবে আছে খেতের নরমে, চাচার কোন মেয়ের কথা বলছিল দাদি? অনেকগুলি মেয়ে চাচার, তাদের কারও কারও শাদিও হয়ে গেছে। সেই মেহেন্দি রাঙানো দুখানি কোমল হাত, শান্ত গৃহস্থালি, মাঠ, প্রান্তর, শব্যখেত, বুড়ি দাদি —সব কিছুর জন্য ওর কলজেটা ছটফটিয়ে উঠল যেমন ছটফটাচ্ছিল মনবাহাদুরের দিল তার ছোট কাঠের বাড়ি, বাবা-মা ভাই-বোন আর নববিবাহিত বধূর জন্য। যেমন ছটফটিয়ে উঠছিল গোলাম হোসেনের প্রাণ তার দুই সন্তানের জন্য, যেমন ছটফটিয়ে উঠছিল অনিমেষের ভেতরটা যখন রোল করতে করতে সে পৌঁছে গেল তার সাথীদের কাছে, রক্তমাখা একটা ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবার আগে যারা তার লবণাক্ত স্বাদ ভরা মুখের ভেতর বরফের টুকরো পুরে দিয়ে চাপা সুরে বলেছিল, 'দেশমাতা কি জয়।' তার চোখের ঘোলাটে দৃষ্টির সামনে ছিল এক ক্রম অন্ধকার। তাকে ঘিরে ছিল তুষারের শীতলতা অথচ তার হাতের অস্ত্র তখনও তপ্ত, একটু আগেই তা থেকে মরণবাণ ছুটে গেছে উলটো দিকে। আল্লাহ্ করুণাময় তাই এ আকাশে শকুন নেই—থাকলে তারা হয়তো এখনই জীয়ন্তে ঠুকরে খেত তাকে। উপড়ে নিত চোখ। কিন্তু শকুনের আগেই যদি দুশমনগুলো উঠে আসে? সম্পূর্ণ মরার আগে সে যদি ধরা পড়ে ওদের হাতে? তাহলে ওরা ওকে জ্যান্ত গোর দেবে নাকি ছিন্ন করবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, গুলি করে খতম করার আগে? বদলা নেবে? কী ভয়ানক! নিজেকে নিয়ে এমন ভয়ংকর কল্পনাতেও তার ভেতরটা শিউরে উঠল, সে বুঝে ফেলে এসব খোদার নির্দেশের অতিরেক এক ঘৃণ্য নিষ্ঠুরতা। ইনতেজার ভেবে ঠিক করতে পারল না কোনটা তার পক্ষে মন্দের ভালো — তার এমন নিরুপায়, অসহায় মরণ, নাকি বিকলাঙ্গ সিপাহি হয়ে গাঁয়ে জওয়ান ছোকরাদের তাতানো? সে কি এক্স্-মিলিটারিম্যান বলে কোনও সার্ভিস পাবে? চাকরির যা হাল তাতে তা জোটানোর চাইতে শহিদ হওয়া আসান।

অনিমেষ তো তেমনই করল। খেলাধুলার সুবাদেও যখন অন্য কোথাও চাকরি হল না, তখন সামরিক বাহিনীর ভর্তি পরীক্ষায় উতরে গেল চমৎকার। তার জন্মের বহু আগেই দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই অন্য কোনও তাগিদে নয় ব্রেফ বেকার থাকা যায় না বলে সে ফৌজি হয়ে গিয়েছিল। তখন সে জানত না এমন একটা লড়াইতে তাকে যেতে হবে। মরতে হবে। তার ধ্যানধারণায় কোনও দেশমাতা কোনওদিন ছিল না। মরণ মুহূর্তেও না। বরং তার মনে চকিত বিদ্যুতের মতো উদ্ভাসিত হল কয়েকটি আপনজনের মুখ—তার শীর্ণ চেহারার কম্পাউন্ডার বাবা, হাঁড়ি হেঁশেল সামলানো নিরীহ জননী, ছোট বোন দুটো আর তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা এক কিশোরী কন্যা। সে জানত, জেনেই এসেছিল যুদ্ধ মানে শত্রুনিধন। হত্যা করো শত্রুকে নইলে তুমি নিহত হবে। এটাই তাদের মগজে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। সেটাই দেশপ্রেম, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া এই মূল কথাটির অলংকরণ। অতঃপর অনিমেষ চক্রবর্তী এই যুদ্ধে শহিদ হয়ে যায়। কোনও প্রশ্ন না-করে সে শবাধারে শুয়ে ফিরে এল তার বাড়িতে। তার অন্ত্যেষ্টি হল পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। তার দেশের দূরদর্শনের পর্দায় তা দেখল লক্ষ লক্ষ লোক। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসম ব্যক্তিত্বরা নানা বিশেষণে ভূষিত করলেন তাকে

এবং তার এহেন মরণকে।

টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ল ইনতেজারের ফেটে যাওয়া ঠোঁটের ওপর—বরফ ঠাণ্ডা হলেও তা পানি! আল্লাহ্ তার দোয়া মঞ্জুর করেছেন — আরও ঝিরিঝিরি বৃষ্টিবিন্দু ঘিরে ফেলল তাকে, ঢুকে পড়ল তার পিপাসার্ত হাঁয়ের ভেতর। গরম পোশাকের ভেতরে তার শরীর থরথরিয়ে উঠল। উইন্ডচিটার বাঁচিয়ে দিয়েছে পোশাকগুলোকে। ও বুঝল কোথা থেকে এক ভাসন্ত মেঘের রাশি ওকে ঢেকে ফেলেছে—চলমান কুয়াশা যেমন, এই জলরাশিও তেমনই ক্ষণকাল তাকে নিশ্চিন্ততা দান করল — এখন শত্রুবিমান হানার ভয় নেই এই ভাবনায়। মেঘ যদি বেশিক্ষণ দাঁড়ায় তাহলে স্রেফ ঠাণ্ডায় জমে ও মারা পড়বে। যন্ত্রণাহীন ঘুমে এখানেই ওর তুষার-সমাধি হবে। কিন্তু এভাবে মারা পড়লে বেহেশ্‌তে গিয়েও ও শান্তি পাবে না। একটাও দুশমন খতম না করে, দুশমনদের গোলাগুলির জবাব না দিয়ে সে শহিদ হতে চায় না। এ জমিন, এ পাহাড় এসবই তাদের, লড়াই ছাড়া তা ফিরে পাওয়া যাবে না। তার বয়স মাত্র তেইশ, হাতের থাবায় সে এক একটা জোয়ান মরদের গর্দান মুচড়ে দিতে পারে, ইনতেজার ধীরে, খুব ধীরে শামুকের গতিতে আর পিঁপড়ের অধ্যবসায়ে ডান হাতটা সচল করার প্রবল চেষ্টা করতে করতে টের পেল বাঁ হাত তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, পাথর বা কাষ্ঠবৎ সেটি—সাড়শূন্য নিশ্চল। ডান হাতের আঙুল দিয়ে ও কোনও ক্রমে মৃদু ঝাঁকুনি দিল সেটায়, অমনই দাঁতে দাঁত চেপে যেন তপ্ত লৌহ শলাকা বিঁধিয়ে দেওয়ার মতো তীক্ষ্ণ ব্যথা থেকে উঠে আসা আর্তনাদ চাপা দিল, 'হায় খোদা।' এই অস্ফুট উচ্চারণে আর ধন্যবাদ দিল তাঁকে এই বেদনার জন্য, কেননা এই ব্যথার ধরনেই সে বুঝল তার বাম বাহু এখনও সক্ষম তা অ্যামপুট করতে হবে না। কিন্তু গোলাম হোসেনের কনুই থেকে হাতখানা ছিটকে গেল রক্ত ছড়িয়ে দিয়ে। হাসপাতাল থেকে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে জেনে সে মন খারাপ করে ফেলে। দেশের জন্য প্রাণ গেলে সে খুশি হত। তার সাথীরা যখন পাহাড় চুড়োর পুনর্দখল নিল তখনই সে ডাক্তারের ছুরিকাঁচির নিচে। তবে শত্রুনিধন সে করেছে, শয়তানগুলো তাদের বলে মুলহিদ, আল্লাহ্‌র নামে তারা করে হত্যার পর হত্যা,ওদেরই হত্যা করা উচিত। শয়তানের দল, আল্লাহ্ আর তার রসুলের নামে ওরা নিজেদের কুকর্ম ঢাকছে। সে খুঁতো হয়ে বাড়ি ফিরবে। আর ব্যবসা দেখবে ভাইদের সঙ্গে শুধু তার কাটা হাতখানা পড়ে রইল রণাঙ্গনে। যেন রণদেবতাকে উৎসর্গ করে এল তার দক্ষিণ বাহু।

ঈশার সঙ্গে দেখা না হলেও, দিন, মাস বছর পার হয়ে গেলেও ওকে আমি কল্পনা করতে পারি। শালপ্রাংশু মহাভুজ মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি বন্ধুটি আমার বড়ই কোমল হৃদয়, চিঠির অক্ষরে অক্ষরে সে হৃদয় ফেটে পড়ছে দুঃখে, ক্ষোভে আর ক্রোধে। 'স্না, খবর বানাচ্ছি, না গপ্পো বানিয়ে কাগজে পাঠাচ্ছি, জানি না। তবে আমার গপ্পো টাইপ রিপোর্ট নাকি কাগজের সেল বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশজুড়ে দেশপ্রেমের হাওয়া বইছে, খবরের পাল তুলে দাও সে হাওয়ায়.......।' মনে মনে ভাবি আমার কলমের কি তেমন ক্ষমতা আছে

ঈশার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারব? ইনতেজারের বৃষ্টিভেজা শরীর সেই সচল মেঘরাশির ভেতরেই কেমন লীন হয়ে আছে যেন সেখান থেকেই ও জন্মেছে অথবা ওর আহত শরীর থেকেই নির্গত হচ্ছে এই পূঞ্জীভূত শীকর। এভাবেই হয়তো ও মারা যেত, যেমন ওরই আশেপাশে এবং বাঙ্কারগুলির মধ্যে পড়ে আছে বেশ কিছু নিষ্প্রাণ শরীর, কিন্তু কেউ যেন যত্নে তুলে নিল ওর উর্ধ্বাঙ্গ, ব্যথাভরা পা দুখানি আশ্রয় পেল অন্য কারও হাতে। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, মেঘের মধ্য দিয়ে কারা যেন তাকে বহন করে নিয়ে চলল। ইনতেজার ভাবল তবে কি কেয়ামতের দিন এসে গেল? সে কি সেই পাহাড় চূড়োয় শহিদ হয়ে গিয়েছিল আর এখন কবর থেকে তাকে নিয়ে যাচ্ছে ফেরেশতারা? শেষবিচার বুঝি আজই। ওই তো শিঙা বাজছে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, উন্মূলীত হচ্ছে পর্বত, নক্ষত্ররাশি বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, শুরু হয়ে গেছে মহাপ্রলয়।

ককিয়ে উঠল ইনতেজার, 'আল্লাহ্ মেহেরবান, এ দাস আপনার হুকুম পালন করেছে। শত্রু বিতাড়নের যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। এখন এ ভৃত্য মালিকের ইনসাফ প্রার্থনা করে।'

'কার কাছে ইনসাফ চাইছ হে?' কেউ একজন বলে উঠল। এত ফ্যাঁসফেঁসে আর বাতাসে ভাসানো নিচু স্বরে যে, মনে হল পরপার থেকে আসছে তা। তবে কি তার জন্য, নির্দিষ্ট হয়েছে জাহান্নাম? সে ভাঙা গলায় বলল, 'পানি।' আবার কে যেন তার কষ্টে ব্যাদিত মুখগহ্বরে সন্তর্পণে ঢেলে দিল, উষ্ণ তরল পদার্থ— বিস্বাদ। তবে কি তাকে দেওয়া হল ফুটন্ত রক্ত পুঁজের পানীয়? সে ফেলে দিল নাকি তা নিজেই গড়িয়ে পড়ল মুখ থেকে— 'আরে। এ যে গিলতেও পারছে না। চা হে চা, পি লো দোস্ত, তাকত পাবে। আর কিছু নেই স্টোরে, এর পর গুলি বারুদ ফুরোবে, তখন মর্টার, মেসিনগান, রকেট লঙ্কার চিবুতে হবে। দুশমনরা সাপ্লাই-এর রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।'

আহ্, সে তাহলে দুশমনদের হাতে পড়েনি, কবরেও যায়নি। তার সাথীরা তুলে এনেছে তাকে, আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল তার চোখ ছলছল করে—আবার সে দাদির কাছে ফিরতে পারবে, দাদির হাতের সিমুই-এর পায়েস আর গরম চাপাটি খাবে শীতের সন্ধ্যায় চুলার ধারে বসে। রাত্তিরে দাদির পাশে শুয়ে তার ভালোমানুষ আব্বা আর আম্মিজানের গল্প শুনবে।

এতক্ষণে ইনতেজার চোখ খোলে — মস্ত বড় মগে ধোঁয়া ওঠা চা খাচ্ছে ক্যাপটেন লতিফ, মুখের ভাবে মনে হচ্ছে বেহেশতের হুরিদের দেওয়া স্বর্গীয় সুরা পান করছে যেন। বাঙ্কারের থিকথিকে অন্ধকারের মধ্যে মস্ত এক সৌদামিনী চমকে ও চকিত দৃশ্যে লতিফকে দ্যাখে। লতিফ খোদ রাজধানীর ছেলে, ইমানদার আদমি, এই রণক্ষেত্রেও সে নিয়ম করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। তাদের বাহিনী যখন শীর্ণ হতে হতে বাইশ জনে ঠেকেছে তখন লতিফ তাদের বদরযুদ্ধের গল্প শোনায় —কেমন করে তিনশো তেরো জন নিরস্ত্র অথচ বিশ্বাসী ধর্মযোদ্ধা ফেরেশতাদের অনুগ্রহে সহস্রাধিক কোরেশকে পরাজিত করল, ওই সব গল্প। টর্চের আলোয় ইয়াকুবকে দেখতে পেল ও। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। রক্তমাখা

একটা ইঁদুরের মতো দেখাচ্ছে ওর ছুঁচালো মুখটাকে। চোখ পিট পিট করে বলছে, 'রিট্রিট করার পারমিশন দিল না? ভুখাই মারা পড়ব ক্যাপটেন।' 'তবে মরো।' লতিফের নির্লিপ্ত জবাব। কে যেন নিচু ভল্যুমে ট্রানজিসটারে শুনছে, 'কঁহি দূর যব দিন ঢল যায়ে/সাঁঝ কি দুলহন বদন চুরায়ে/ চুপকে সে আয়ে, মেরে খেয়ালোঁ কে আঙ্গন মে /কোই সপনো কে দীপ জ্বলায়ে..' মৃত্যু তন্দ্রির মধ্যে আহত, রক্তাক্ত অভুক্ত জেহাদিদের ভেতর থেকে সীমানা মুছে দেওয়া এক বিষণ্ণ বেদনা ঘনিয়ে আসছে। কেউ একজন খসখসে গলায় বলে—'বন্ধ করো মুকেশ!' নব ঘোরালে গোলাম আলির কণ্ঠ শোনা যায়— 'জানে দিল, জানে তমন্না কৌন হ্যায়/ তুমসে অচ্ছা, তুমসে প্যারা কৌন হ্যায়.....'

পাহাড়ের নিচে, মনবাহাদুর চোখ বন্ধ করে বাঙ্কারের পাথুরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে গলা মেলাচ্ছিল — ' তুমসে অচ্ছা তুমসে প্যারা কৌন হ্যায়।'

'ক্যাপটেন সাব, আমি আর লড়াই করতে পারব না? খোদার কসম সত্য বলুন।' ইনতেজারের বাঁ হাত জুড়ে এক বিশাল ব্যান্ডেজ বেঁধে লতিফ তার হাঁটুর নিচের গর্ত মেরামত করতে ব্যস্ত। 'পা যদি তোমার সেরেও যায় মিঞা, এ গর্ত পুরোপুরি বুজবে না। আশা করি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে তোমার আপত্তি হবে না। গুড লাক দোস্ত, স্প্লিন্টারের টুকরোটা বেরিয়ে গেছে।' দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে ইনতেজার; চোখ ফেটে তার পানি তো নয় যেন গরম খুন বেরিয়ে আসতে চাইছে, হায় খোদা, এ কী হল তার, একটা দুশমনকেও সে খতম করতে পারল না। দাদির কথা মান্য করে চাষবাস করাই উচিত ছিল তার। লতিফ ইশারা করলে এক ছোকরা দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দেয় তাকে। ওয়াচ হোল-এ চোখ রেখে লতিফ আপশোস করে, 'আসমান জমিন একাকার। কাল ওয়েদার ক্লিয়ার হলে এই বাঙ্কারটাই আমাদের গোরস্তান হবে হে! তার আগে আর এক রাউন্ড কড়া করে চা বানাও।'

'সালাম ক্যাপটেন সাব!' শীতের সন্ধ্যার মতো ঘুম ছেয়ে ফেলেছে ইনতেজারের আহত, ক্লান্ত শরীর। সেই ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে সালাম জানায় তার ক্যাপটেনকে।

পাঁচ

বিজয়ী সেনাদের ছবি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়। ঈশার তোলা। আর এই ছিন্নশির, খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ছবি, মনুষ্যত্বের অপমান আর পরাজয়ের ছবি আমার লেখার টেবিলে। আসমানের নিচে দিয়ে ট্রাকটা ঘুরে ঘুরে নামছে। মেঘের দলও এখন নিচে নেমে এসেছে। হেডলাইট জ্বালিয়ে সেই মেঘরাশির ভেতর দিয়ে ট্রাক আরও নিচে নেমে যায়। ভেজা ভেজা ঠাণ্ডা স্পর্শে ইনতেজারের চোখ শুশ্রূষা পেল যেন তার মনে না-পড়া আম্মিজানের হাতের ছোঁয়া। মেঘ পেরিয়ে ট্রাক আরও নিচে নামল। ইনতেজার চোখ খুলল। সমস্ত মুখ এমন ফুলে রয়েছে যে চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা গেল না। আধখোলা চোখে সে দেখতে লাগল, হয়তো এমন দেখা সে আর দেখেনি —আকাশে মেঘের ধীর সঞ্চরণ, তাতে ফুটে

উঠেছে কত তসবির —তার দাদির বলিরেখা ভরা স্নেহমাখা মুখ, মইনুল চাচার মুখ, তার হারানো সাথীদের মুখ, ওড়নাবৃত এক কিশোরীর মুখ, কতবার দেখেছে তবু আলাদা করে নজর করেনি তাকে। কেননা তাকে পেয়ে বসেছিল লড়াইয়ের নেশা। সেনা ব্যারাকে মেয়েদের নিয়ে হাসি-মস্করা হয়। অতগুলো নওজোয়ান একসঙ্গে থাকলে যা হয় আর কি। তাদের সমাজে রাস্তাঘাটে এখন মেয়েরা চলাফেরা করে যদিও, নানা ধরনের পেশাতেও মেয়েরা নিযুক্ত তবু তাদের মুখ তেমন করে দেখা যায় না। কোমল করপল্লব আর দুটি রাতুল চরণ দেখাই তাদের নয়নসুখ। তাই কখনও কখনও এমন রসিকতা হয়, শাদি-সুদাঅলাদের বেশরম জবান এমনই যে কান লাল হয়ে যায়, শরীর গরম হয়ে যায়। ইনতেজারের চোখ আর আসমানের মাঝে দুলছে একটা পর্দা—মসলিনের মতো স্বচ্ছ আর হালকা হলেও অস্বস্তিকর। তার পোশাক দিয়ে ভয়ংকর দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, সে ঘ্রাণ পায়, রক্ত আর পুঁজের ঘ্রাণ, বিষ্ঠা আর প্রস্রাবের ঘ্রাণ। কতদিন খায়নি সে? তবু শরীর কোথা থেকে উৎপন্ন করল ওইসব অত্যাবশ্যকীয় বর্জ্য পদার্থ? তার জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাবোধও ফিরে এসেছে। সে বেশ বুঝতে পারছে তার আর বাড়ি ফেরা হল না। তারা তো ওকে মুর্দা ভেবে ছুঁড়ে দিয়েছে তার সাথীদের মৃত শরীরের ওপর।

সে একটি রাষ্ট্রের বেতনভুক সৈনিক তাই তাকে তারা গোর দেয়নি। হয়তো ফেরত পাঠাবে তার দেশে, তাহলেও তো সে একভাবে ফিরে যাবে তার দাদির কাছে। হায় খোদা, দাদিকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ? তার জখমি জানুর ওপর কার একখানা মৃত বাহু পড়ে আছে। হতে পারে ইয়াকুব অথবা ক্যাপটেন লতিফের। ইনতেজারের আবারও ঘুম পাচ্ছে। চোখের সামনে পর্দাটার রং গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে, দুলছে সেটি, গলা শুকিয়ে কাঠ, শ্বাস নিতে ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে। অথচ পরম করুণাময় আল্লাহ্ প্রবাহিত করছেন সুস্নিগ্ধ টাটকা বৃষ্টি ধোয়া বাতাস; সে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু দেখার আকাঙ্ক্ষায় রয়েছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এই দুনিয়া, নিচে পাহাড়ের গায়ে বরফ নেই, বরং সবুজেরই কত ছায়াপাত সেখানে, একদিকে পাথুরে দেওয়াল অন্য দিকে খাদ, উপত্যকা ঘিরে আকাশলীন পর্বতশরীর— প্রাণৈশ্বর্যে ভরপুর সেসব।

তাদের গোলাগুলি প্রায় খতম হয়ে গিয়েছিল। সরবরাহ বন্ধ থাকায় তা আর পাবার আশা ছিল না। সেকথা জানালে ওপরওয়ালার ভর্তসনা শুনতে হয় লতিফকে—'য়্যু গুড হ্যাভ বিন কেয়ারফুল। এনিওয়ে উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট টু সেন্ড অ্যানাদার ব্যাটেলিয়ান। ইন দ্য মিন টাইম গো অন ফাইটিং। ডোন্ট গিভ ইন, ডোন্ট বি অ্যা ক্যাপটিভ। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

এইসব শুনে লতিফ শুকনো হাসে। তার খানিক আগেই তাদের কয়েকজন নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়েছিল। একটিন বিস্কুট আর একশিশি জ্যামের জন্য। কুক মারা যাওয়াতে যে ছোকরা কিচেনের ইনচার্জে ছিল সে লুকিয়ে রেখেছিল ওইসব। টের পেয়ে কয়েকজন তার ওপর হামলে পড়ে। লতিফ পিস্তল দেখিয়ে, ধমকিয়ে বিস্কুট ভাগ করে

দেয়। জ্যামের পাত্র ভেঙে তা মেঝেতে লেপ্টে যায়, তা আঙুলে করে চেটে নেয় কয়েকজন; হিবে চোখে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলে — 'গুলি দাও ক্যাপটেন, ম্যাগাজিন খালি।' হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল তখনও, তাই ফজরের নামাজের পরে হাতাহাতি লড়াই শুরু হলে সেসব কাজে লাগে। ইনতেজার অসহায়, নিস্তেজ, পাথরের মতো ভারি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে পড়ে থাকে। ক্যাপটেন নিশ্চয় জন্নত লাভ করবে। তায়াম্মুম করে, নামাজ পড়ে, সেজদা করে দুশমনদের কয়েকটাকে খতম করে সে গাজি হয়েছে। শত্রুর জয়ধ্বনি শোনার আগে সে বধির হয়ে গেল না কেন? শয়তানগুলোর মধ্যে আবার এক অবিশ্বাসীর নামও সে শুনে ফেলে। দোজখের আগুনই ওর বরাতে আছে। ওয়াল্লাজিনা কাফারু। কিন্তু সে তো আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত না হয়েও এই জীবন্মৃত অবস্থায়। আদি পুরুষ আদম ও আদি মানবী হবা-র সন্তান নাকি এ দুনিয়ার সবাই। তাহলে জীবনে মরণে এত ভেদ কেন? তার অর্ধমৃত শরীরের ওপর মাঝে মাঝেই এসে পড়ছে কারও একখানা নিষ্প্রাণ হাত অথবা পা। সামনে পেছনে ফৌজি গাড়িসমেত ট্রাক বিপজ্জনক গতিতে নেমে যাচ্ছে কারণ পাহাড়ের আড়াল থেকে ছুটে আসছে কামানের গোলা। ফলে ঝাঁকুনি খায় ও আর তার পচে ওঠা, ফুলে ওঠা ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হতে থাকে রক্ত পুঁজের চটচটে প্রবাহ, শরীরের কোষে কোষে আর্তনাদ জাগে, অসাড়ে মলমূত্রও বেরিয়ে আসে। তার চোখ বুজে আসে। যেন কেউ তাকে পানির নিচে ঠেসে রেখেছে। আর ওর অনিচ্ছাকে, এক ফৌজির অনিচ্ছাকে রেয়াত না করে দুই বন্ধ চোখের কোল দিয়ে নিরুপায় অশ্রু গড়ায়। সে মৃত্যু কামনায় স্থির হয়। হায় খোদা, মরতেও এত সময় লাগে! জ্বরের তাড়সে তার সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে। যেন কোনও অজানা পাপে তাকে অনিঃশেষ অনলে সেঁকা হচ্ছে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন এখনই সে কবরের ভেতরে চাপা পড়ে রয়েছে— আলো নেই, হাওয়া নেই, পানি নেই — অশ্রুতপ্রায়, অর্থহীন স্বরে সে গোঙাতে লাগল।

একটা বাঁকের মুখে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ওর মৃতপ্রায় শরীর। টুকরো টুকরো হয়ে উৎক্ষিপ্ত হল তা। কয়েকটি মৃতদেহের টুকরোর সঙ্গে ওর দেহখণ্ডগুলিও ছড়িয়ে পড়ল বৃক্ষরাজির ওপর, নদীর হিমস্রোতে, প্রস্তরাকীর্ণ পর্বতগাত্রে, স্বভাবশান্ত উপত্যকার তৃণগুল্মাদির ওপর। নির্ভুল নিশানায় কয়েকটি শেল এসে পড়ে মৃতদেহবাহী ট্রাকের ওপর। পাশ দিয়ে একদল তরুণ সৈনিক বেশ কিছুক্ষণ আগে দখল নেওয়া শৃঙ্গের উদ্দেশে চলে গেছে। অক্ষত।

আশ্চর্য এই যে, অন্তিম মুহূর্তে আলোর ঝলকানি বা অজানা কোনও রহস্যময় কারণে ইনতেজারের চোখ দুটি উন্মীলিত হয়। নরকের চাইতেও নারকীয় এই দৃশ্যের অন্তর্গত ওর ছিন্ন শির গেঁথে যায় বজ্রদগ্ধ এক বৃক্ষের নিষ্পত্র শাখায়। আর তার বিস্ময় বিস্ফারিত দুই চোখের আকুল দৃষ্টি থাকে আকাশের দিকে এমন অপলক, যেন তা দেখতে পায় খোদার আরশ আর সর্বশক্তিমান পরম করুণাময়ের কাছে অনুচ্চার্য এক নিষিদ্ধ প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজে।

ইনতেজারের ছবি আমি টেবিলের কাচের নিচে উলটিয়ে রাখি।

কালান্তর ১৯৯১

ঘরবাপসি

চাটাই-এর ওপর জামা তিনটে পাশাপাশি রেখে ধনবতী কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না কোনটা পরবে। শাড়ি নিয়ে তেমন কোনও সমস্যাই নেই, নীল জমির ওপর হলুদ আর লাল ফুল ছাপা শাড়িটা তার মনপসন্দ্ —এমনকি পরব-টরব কি হাটে, নয় তো মেলায় যেতে বাধ্যতামূলক ভাবে এই একমাত্র ভালো কাপড়টাই তাকে পরতে হয়। তবু তিনটে জামার মধ্যে দুটো ব্লাউজ, একটা খাটো কুর্তা মতো— যেমনটি ওরা পরে। তার ইচ্ছে ব্লাউজ পরা, যেমন ঠাকুরদের মেয়েরা পরে, শাড়ির সঙ্গে। সিনেমায় যেমন পরে খুবসুরত হিরোইনরা। কিন্তু কুর্তায় পকেট আছে, আর তাহলে সে নানকুকে লুকিয়ে দশ, বিশ, পঁচিশ, পচাশ করে জমানো সাত রুপিয়া তিশ পৈসা নিয়ে যেতে পারবে। পূজার পৈসা, বেটার চুল ফেলার জন্য নাপিতের পয়সা, এসব নাকি নানকু জোগাড় করেছে। চাই কি তাকে দোকানে বসিয়ে কটোরি জিলাবি কিংবা পুরি লাড্ডুও খাওয়াতে পারে। হয়তো কিনে দিতে পারবে রেশমি ফিতে, কাচের চুড়ি আর বাহারি বিন্দিয়া। নানকুর তো আর জমানো পয়সায় হাত দেওয়ার কোনও দরকারই নেই। জরুরত পড়েগা তব তো। ধনবতী এখন সত্যিই ধনবতী! সাহস করে ও এও ভেবে ফেলে, ভেবে ফেলতে পারে, আর কিছু পয়সা যদি নানকু দেয় তাহলে পাক্কা দশ রুপেয়া হবে। আর তাহলেই ও কিনে ফেলতে পারবে একটা ইস্টিলের টিফিন বাক্সো তার বেটার জন্য। অবিশ্যি সে জানে না একটা টিফিন কৌটোর কিতনা ভাও। তার ওপরে তাদের দু-বেলা তেমন করে রুটি বা চাবল জোটে না যে একটা তেমন কৌটো বা ডিব্বা খরিদ করা খুব জরুরি। কিন্তু খেয়ে না-খেয়ে সে পয়সা ক'টা জমিয়েছে শুধু এটা কিনবে বলে। তার বেটা রামভজন যখন সিস্টারের ইসকুলে যাবে, তখন ইসকুল থেকে তাকে দুপুরে কেক, পাঁউরুটি, বিস্কুট দিলে সে এটায় নেবে। দু-বাটিঅলা ডিব্বা কিনবে সে, কেননা চার্চের ইসকুলে পাউডার দুধ গুলে দেয় দু-হপ্তা করে। রামভজনের গত সনেই ভর্তি হবার কথা, কিন্তু জ্বর-সর্দিকাশি-পেটখারাপ আর গা-ভর্তি খোশপাঁচড়া সারাতেই বছর ঘুরে গেল। মিশনে ফি-হপ্তায় ডাগদর সাব আসেন শহর থেকে। এমনিতে কমপাউন্ডারবাবু আর সিস্টার দিদি আছেন। ওখানে দেখিয়েই ভালো হল তার বেটা। তাই সে ছেলেকে ওখানেই পড়ালিখা শিখাবে, যাতে সে নানকুর মতো ঠাকুরদের বাঁধা কিষান কিংবা মুনিষ হয়ে থাকবে না। রোগা, ডিগডিগে বলে রামভজনের দিকে ঠাকুরের কি তার গোমস্তার নজর পড়েনি, নইলে ভঁইস চরাত নয় তো ফরমাশ খাটত ও এতদিনে।

লছমনিয়া, শিউপূজন আর গোড্ডু, তিন-তিনটে ছেলে তার মরে গেল ছ মাহিনার ভিতর। তিন

ভাই দৌড়েছিল মরণের দিকে এমনভাবে যেন যে আগে যাবে তার মিলবে কোনও ট্রফি—একশো কোটি মানুষের দেশে চটপট মরে যাবার জন্য। তিনজনেই ছিল এক দেড় বছর বাদে বাদে জন্মানো বাচ্চা থেকে বালক হয়ে ওঠা, আধপেটা বা কম খেতে পাওয়া ভঁইস চরানেবালা। প্রথম জন মরল অসুখে। ধুম জ্বরে। তখনও ধনবতী আর নানকু ফাদার বা সিস্টারদের কাছে যেত না। যারা যেত তাদের মুখে অন্য অজানা শব্দ শুনে ওরা ভয় পেত। পরের ছেলেটি মারা গেল ভয়ে। দানোর ভয়ে। একটা বাছুর জঙ্গলের দিকে চলে যায় যেন কীভাবে। গোমস্তা তাকে চড় কষিয়ে বলে ওটাকে না নিয়ে এলে তাকে বাড়ি যেতে দেবে না। শিউপূজন, ন-বছরের বালকই তো সে, বাড়িতে কিছু বলে না। রাত হলে বাছুর নিজেই ফিরে আসে, শিউপূজন ফেরে না। রাতের বেলা হলেও নানকু, পাড়া-প্রতিবেশীদের আর চার্চের ক'জন লোক, আদিবাসী খ্রিস্টান তারা, মশাল নিয়ে বনের ভেতরে যায়। সেখানে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে ছেলেটাকে। কোথাও আঁচড়-কামড়ের দাগ নেই, শুধু যেন উপুড় হয়ে খামচে ধরেছিল মাটি, ধড়ফড়িয়ে ছিল খানিক। ফাদার না দেখেই বলেন পেটে ব্যথা উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপরিশান করালে ভালো হয়ে যেত শিউপূজন। তো গাঁয়ের সবাই বলল অপঘাতে মরেছে সে। গোমস্তার কাছে আবার টাকা ধার করে নানকু। টিপছাপ দেয়। গম্ভীর মুখে গোমস্তা বলে নেহাত বেটার জন্য, নইলে নানকুর তো আগের টাকাই শোধ হয়নি। এসব গল্প এখন বহুত পুরনো—এই টাকা ধার দেওয়ার গল্প। এমনকি অক্ষর জ্ঞান না-থাকলেও নানকু বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝে সে কোনওদিনই কর্জ শোধ করতে পারবে না। মালিকের গোলাম হয়ে, বেগার খেটেই তার বাকি জীবনটা যাবে।

গোড্ডু, সাত বছরের ছেলেটি, শরীর বলতে মস্ত বড় বড় দুটো চোখ, একেবারেই ভাবাহীন সে দুটি, আর ডগডগে উপুড়-করা ধামার মতো পেট। দিনরাত তার খাই খাই স্বভাব। সে মরে গেল নাক মুখ দিয়ে শাদা, সরু, রূপকথার সূতাশঙ্খ সাপের মতো কৃমি বেরিয়ে। তখন রামভজন সবে হাঁটতে শিখেছে। রাধিয়া, তাদের পড়শিনী, বলে যে, আর ঝাড়ফুঁক তাবিজ-উবিজ নয়, বেমার হলেই মিশনারিদের হসপিটালে যা। তো তাই যায় নানকু, ধনবতী। আর গিয়ে তাজ্জব বনে যায় দু-জনেই। কী মিঠা বুলি সিস্টারের, গরিবলোগ বলে কী মমতা ফাদারের! রামভজনের ফ্যাকাশে হওয়া কালো সর্দি-গড়ানো মুখ নিজে সাবুন দিয়ে ধুয়ে দিল সিস্টার মণিকা। রাধিয়া তাহলে ঝুট বলেনি। রাধিয়ার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাবার পর ফাদারই তো কাজ দিয়ে, পয়সা দিয়ে দুই বাচ্চা সমেত রাধিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রাধিয়া তাই যিশুর স্মরণ নিয়েছে। তাদের তিনজনের গলাতেই রুপোর মতো শাদা চেনে একটি করে ক্রুশ ঝোলে। তবে নানকু আর ধনবতী তা করেনি। ধনবতীর সাধ সে রামভজনকে গির্জার ইসকুলে পড়াবে। অবশ্য সেখানে যারা পড়ে তারা সবাই অমন লকেটঅলা চেন পায়। বই-খাতা-স্লেট-পেনসিল, ইসকুলের জামা, দুপুরে টিফিন এসবই পায় এমনি। সিস্টার, ফাদার, কমপাউন্ডারবাবু, ডাগদর সাব সবাই ভালো আদমি। গোমস্তা, মালিক আর মালকিনের মতো শয়তান নয়। মালিকের বেটা-বিটিদের মতো দেমাকি নয়। ধনবতী-নানকু মাঝে মধ্যে ভাবে তারাও কি রাধিয়ার মতো যিশুর আশ্রয় নেবে? তা শুধু রাধিয়া কেন আরও কয়েক ঘর মানুষও তো খিরিস্তান হয়েছে। তাদের তো শিউজি কি বজরংবলিজি, দুর্গামাঈ

কি কালীমাঈ কোনও শাস্তি দেননি। বরং তারা সাফসুতরো থাকে, ছেলেমেয়েকে ইসকুলে পাঠায়, খেতি করে স্বাধীন ভাবে, আর এতোয়ারের দিন সকালে গির্জায় হাজিরা দেয়। পূজা নয়, ওরা বলে প্রার্থনা। না গেলে ফাদার নাকি গুসসা করেন। সেখানে কী হয় জিগ্যেস করলে রাধিয়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুখে কাপড় দিয়ে হাসে আর চাপাস্বরে বলে : বড়িয়া গানা হয় নাকি চার্চে, পিয়ানো বাজে টুং টুং। খুব সুন্দর আওয়াজ সেসব। মোমবাতি, আগরবাতি ভি জ্বলে। তবে ফাদার কিতাব খুলে কী যে বকে যায় তা ও বোঝে না, শুধু 'আমেন' বললে বোঝে এইবার ছুটি হল।

'তা তোর বাড়িতে যে রাম-সীতার ফোটো ছিল, শিউজির মাথায় জল ঢালতিস, সেসব কী হল?'

'ধুরর্', রাধিয়া হাসে আবার। 'সব আছে। বিলকুল। শুধু এতোয়ারে যিশুবাবা।'

তবে কিনা কাল ওদের সঙ্গে রাধিয়াও যাবে।

কাল মহাশিবরাত্রি। গঙ্গায় চান করে শিউজির মন্দিরে পুজো দেবে ওরা। রামভজনের জটা জটা চুল কাঁধ পর্যন্ত। সেই কেশমুণ্ডন হবে শিউজির নামে।

দলবেঁধে হেঁটেই যাবে ওরা ঠিক ছিল। ভোর ভোর রওনা হলে পাহাড়ি পথে ভালো চলা যাবে। তবে খুব ভোরে যাওয়া ঠিক নয়, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা পথ যেতে হবে। বাস এ পথে চলে না। ভঁইসের গাড়িও তাদের নেই। তাছাড়া সেসব ভাড়া করার মতো পয়সাও নেই। মিশনারিদের শাদা ভ্যানে, গদিতে বসে নানকু বারকয়েক শহরে গেছে—ওদেরই সামান বইবার লোক কম পড়লে। দু-পাঁচ টাকা দেয় ওরা, চা-নাস্তা খাওয়ায়, ব্যাস। তাও মালিকের ঘরে কামকাজ কম থাকলে, নইলে তাও হয় না। কিন্তু মন্দিরে পুজো দেবার জন্য ফাদার জোসেফ টোপনোর কাছে গাড়ি চাওয়া যায় না, এটা ওরা বোঝে। এক হপ্তা আগেও ওরা ভাবেনি এমন মজাকি হবে। আর-এক মিশনারির দল ওদের ট্রেকারে করে নিয়ে যাবে!

এরা পাগড়ি পরা গেরুয়াধারী সাধুবাবার দল। কী সব যজ্ঞ হবে, হোম হবে। তাদের জনেউ (পইতে) পরিয়ে ব্রাহমন ভি করা হবে। রাধিয়াই এসব বলে তাদের। নানকুর মাথায় ব্যাপারটা ঠিক ঢোকে না। দু-দুটো চুটার ধোঁয়াতেও তার দিমাগ সাফ হয় না। ধনবতী এগিয়ে আসে, 'আরে আমরা তো হিন্দুই আছি, তাহলে আবার ঘরবাপসি কাহেরে?' নানকু বলে, 'ঠিক ঠিক। ওহি তো ঠিক বাত। আরে আমরা তো ধরম ছাড়িনি, তাহলে লৌটনার কথা ওঠে কেন? সাধুবাবাদের বলে দে আমরা যাব না।' রাধিয়া বলে, 'বুদ্ধু আছিস তোরা।' গৌরবে বহুবচনই বলে সে। নানকুর বয়স বেশি হলেও, তোবড়ানো গাল আর অকালে মাথায় শাদা চুল দেখা দিলেও ধনবতী ঝগড়া করতে পারে, তার স্বামীকে 'বুদ্ধু' বললে। কী নাকি সে বহুৎ কুছ দেখেছে, শহরে গেছে। টিরেনে চেপেছে দু-বার। তো রাধিয়া বলে, 'হিন্দু আছিস তো আছিস। আর একবার হলে তো ভালোই। তা বাদে পৈসা পাবি। জনেউ পাবি। তখন ঠাকুর তোকে ছুঁলে আর চান করবে না। তা ছাড়া মুফতে শহরে যাবি, গঙ্গায় নাহাবি, পূজা দিবি। আমি তো যাব। আরে কত আদমিলোগ, জেনানালোগ কত কত গাঁও থেকে যাবে।' নানকু আর ধনবতী দু-জনেই বলে,'যাব রে যাব, গঙ্গায় ডুব দেব।

বেটার মস্তক মুণ্ডন করাব, ব্রাহ্মন ভি হব।'

এমনিতেই এ অঞ্চলে ঠাণ্ডা বেশি আর জাড় রোখার মতো জামাকাপড় না থাকলে তা লাগেও বেশি। আবার জাড় রোখার মতো শরীরের প্রতিরোধ, সামর্থ্য এসব থাকলেও তা অতটা লাগে না। ফলে প্রথম শীতে লেগে যাওয়া ঠাণ্ডা থেকে যে-কাশি শুরু হয়েছিল নানকুর, তার অবশেষ এই ফাল্গুনের শুরুতেও বেশ থেকে গেছে। সে আবার মিশনারিদের দাওয়াই খায় না। ছেলে উৎসাহ দিলেও না—'বাপু বড়িয়া দাওয়াই, মিঠা, লেকে দেখ!' নানকু খায় গাছগাছড়ার পাতা-ছেঁচা রস। বনতুলসীর ঝোপ অজস্র, খুঁজলে বাসক পাতাও মেলে। জঙ্গল থেকে চাক ভাঙা মধু এনেছিল যেন কবে—এখনও কালো মতন একটু আছে। তাছাড়া আদা থেঁতো করে লাল চা-এর সঙ্গে গুড় দিয়ে ফুটিয়ে নিলে দাওয়াই বলো দাওয়াই, কুছ পিনা বলো তো তাই। তবে এসব জোটানো মুশকিল। অন্তত রোজ দু-বেলা নিয়ম করে জোটানো মুশকিল।

মাথায় রঙিন পাগড়ির বদলে নানকু পুরনো ছাইরঙা এক মাঙ্কি ক্যাপ চাপালে ধনবতী হেসে গড়ায়। 'হায় রাম? কত লোকে কত সাজছে আর তুই কিনা আজকের দিনে ওই বাঁদুরে টুপি পরলি! রাধিয়া ঠিকই বলে, মাথায় আছে কী তোর?'

বউ যাই বলুক, টুপিটা বাদ দিলে নানকু সেজেছে আজ। লেংটির বদলে আস্ত ধুতি পরেছে সরু লাল পাড়ের। এত ছোট সেটা আড়ে-বহরে যে হাঁটুর ওপরে উঠে থাকে। তা হোক, তারা তো ভুঁয়ে লুটিয়ে কাপড় পরে না, বরং তার ওপরে পিলা রঙের বেনিয়ানটা পরে তার বেশ খুশি লাগে। যেন আজ সে কারও গোলাম নয়, বেগার-খাটা মানুষ নয়, সে অঋণী, অপ্রবাসী ও স্বাধীন মানুষ। যদি আদৌ সে কারও দাস হয়ে থাকে তো শিউজির— দিন দুনিয়ার মালিকের। যদি আদৌ সে ঋণী হয়ে থাকে সে ভগওয়ানের কাছে। তেমন স্পষ্ট ভাবে না হলেও আবছাভাবে সে এসব অনুভব করে। সে আবার স্বভাবজ ভক্তি ও বিশ্বাসের আধার যেন। বরং ধনবতী সভ্যতার কূটকচালির খানিক জানে। সে আজ এমনই সেজেছে যেন নতুন বধূটি শ্বশুরাল যাচ্ছে। আজ তাদের উপোস। ছেলেকেও গুড়গোলা শরবত খাইয়ে রেখেছে, বলেছে, ভুখ লাগলে চুড়া-দহি খাওয়াবে মেলার দোকান থেকে। ধনবতীও পরেছে পিলা রঙের ঢিলা ব্লাউজ, সর্বের খেতের হলুদের ওপর দিয়ে ছাপা শাড়ির আঁচল কাঁধ বেয়ে পিঠ জড়িয়ে এক প্রান্ত কোমরে গোঁজা। হাঁটুর একটু নিচে কাপড়ের প্রান্তরেখাটি — অপ্রশস্ত, রক্তলাল বর্ণের। কিন্তু বেরিয়ে থাকা দুটি কালো পায়ের শীর্ণতা তাকে ঈষৎ বিচলিত করে, বুঝিবা নীল-পাড় শাদা শাড়ির ঘেরে রাধিয়ার সুগোল, তামাটে, মসৃণ পা দু-খানির ঋজু নগ্নতায় তা আরও অশোভন লাগে। কিন্তু গাড়িতে উঠে ধনবতী তা ভুলেও যায়। তার কালো মণিবন্ধে দস্তার মোটা চুড়ি, আঙুলে ঝুটা পাথরের আংটি, কানে ঝুটা পাথরের দুল, গলায় তিনটে ছোট-বড় পুঁতির মালা। খোঁপায় বনফুলের গুচ্ছ। রাধিয়া তার বাচ্চা দুটোকে রেখে এসেছে সিস্টারের কাছে। ইসকুলে আজ কী যেন সব হবে, বাচ্চা মেয়ে দুটো ভালোই থাকবে। রাধিয়ার হাত খালি, কান খালি, গলা খালি, তার তাম্রাভ চুল উঁচু করে কালো গার্টারে খোঁপা করে বাঁধা। তার বড় বড় চোখের খয়েরি মণিতে তেমনি কৌতুকছটা।

'কাল চাবল খেয়েছিলি নাকি রাতে?' রাধিয়া শুধোয়—

'নাহি তো!' বাইরে চোখ রেখেই ধনবতীর জবাব।

'কী খেলি তবে?'

'ছিল্কা।'

'তব তো ঠিক হ্যায়।'

আটার গোলায় থোড়াসে নিমক ডালকে ছিল্কা বানালে রামভজন খায় চারটে। নানকু খায় সাতখানা। ধনবতী তবু নিজের ভাগের দুটো থেকে একটা দেয় স্বামীকে। আনন্দে তার খিদেই পায়নি। আর আজ গাড়িতে সে বসেছে পেছন দিকে, খুশিতে তার ভেতরটা ডগমগাচ্ছে। এই জঙ্গলে তারা লকড়ি কুড়াতে আসে, তো সেই জঙ্গলকেই পন পন করে পেছনে ফেলে ট্রেকার ছুটছে। সামনে ড্রাইভারের বাঁদিকে দু-জন ছোকরা সাধুবাবা বসে আছে। তাদের মুখ গম্ভীর—দশজনের বদলে তারা চলেছে সাড়ে চারজন। একেবারে শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে এল ছেদিলাল—সে কবে খ্রিস্টান হয়েছিল তামাম গাঁয়ের লোক জানে না। কিছু লোক কাল দুপুরেই চলে গেছে দল বেঁধে-—হেঁটে। তাদের নাকি ঘরবাপসির জরুরত নেই। বোকা নিশ্চয় তারা, রাধিয়া ভাবে। সে আড়ে আড়ে ছেদিলালের ফেট্টি-বাঁধা ঝামর চুল, আর একবারও তার দিকে না-তাকানো মুখখানা দেখে। সে জানে ছেদিলাল তার জন্যই খ্রিস্টান হয়েছে, তার জন্যই ঘরবাপসিতে যাচ্ছে। বোকা। বুদ্ধু কাঁহাকা! রাধিয়ার পাশে রামভজন বকবক করে যাচ্ছে—'চাচি এ কেয়া হ্যায়? ও কেয়া হ্যায়?' এইসব। রাধিয়াও ওর সঙ্গে বালিকার মতো সংলাপমুখর হয়ে ওঠে—'ইস জঙ্গল মে শের হ্যায়, বান্দর হ্যায়, তিতলি হ্যায়, চিড়িয়া হ্যায় .....'

গঙ্গাতীরের কাছেই আশ্রম। যতজন ঘরবাপসি যজ্ঞে থাকবে তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে একটা খাতায় লেখে এক সাধুবাবা। আর তাদের হাতে গুঁজে দেয় একটা করে রঙিন চিরকুট, নম্বর লেখা।

ধনবতী পর্যন্ত কেমন বুদ্ধু বনে গেছে, এমনকি রাধিয়ারও উধাও চপলতা। ফুলে, নিশানে, রঙিন কাগজের শিকলে সাজানো মণ্ডপের মাঝখানে স্তূপীকৃত বেলকাঠ বা যজ্ঞকাষ্ঠ, একটি জলচৌকি, জলপূর্ণ প্লাস্টিকের বালতিটি বড়ই বেখাপ্পা ঢাকনার ওপরে উপুড় করা সোনারবরণ পিতলের ঘটিটির উপস্থিতিতে, যেমন জেল্লাহীন মানুষগুলির হতভম্ব মুখের পাশে সেই নেতা মহোদয়ের, যিনি এই যজ্ঞের পরিকল্পনার উদ্ভাবক, উৎফুল্ল আনন। চারদিকে চারটি টিভি ক্যামেরা। কলম ও নোটবই হাতে সাংবাদিকের ভিড়, টেপরেকর্ডার ও আনুষঙ্গিক আবশ্যকীয় উপকরণসহ দূরদর্শন-প্রতিবেদকগণ—স্ত্রী এবং পুরুষ, তাদের পেছনে মেলার বহমান স্রোতখানি থেকে হঠাৎ হঠাৎ জেগে-ওঠা উৎসুক ও কৌতূহলী মানুষজনের মুখ। ধনবতী নানকুর পিঠে আঙুলের খোঁচা মেরে ফিসফিস করে, 'রামভজনোবাকা বাল? কৈসন কাটোয়াবা?'

নানকু ঠিক সাহস পাচ্ছিল না লাইন ভেঙে যাবার। এমন সময় মাইকে ভেসে এল—'ভাইয়ো অর বহিনো, আপলোগনে কৃপয়া পহলে নাহানেকে লিয়ে পবিত্র গঙ্গামাঈকে পাশ যাইয়ে।' মুহূর্তে

লাইন ভেঙে ছত্রখান, ব্যাগ-পলিপ্যাকে জামা-গামছা নিয়ে সবার সঙ্গে এরাও পৌঁছে গেল ঘাটে। সেখানেও সন্ন্যাসী ভলান্টিয়াররা ভিড় নিয়ন্ত্রণে —'জলদি, জলদি, আভি যজ্ঞ শুরু হো যায়েগা।' চুল ফেলা হল না রামভজনের, তবু দেরি হল রামভজনকেই চুড়া-দহি আর লাড্ডু খাওয়াতে গিয়ে।

জলপাই সবুজ টি-শার্ট আর ওই রঙেরই ট্রাউজারস পরা পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বিশালদেহী মানুষটি বীরাসনে উপবিষ্ট, সামনে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে জলচৌকির ওপরে রাখা ধনবতীর পদ প্রক্ষালন করছে আপনার বাম হস্তে, দক্ষিণ হস্তে পিতলের সেই স্বর্ণবর্ণ ঘটি—ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ও আরও নানা ভাষার দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় বেশ গুরুত্ব সহকারে ছবিটি ছাপা হয়। ধনবতী নানকুরা সে-ছবি দেখেনি, কিন্তু মাইকেল পলাশ মারান্ডি, চার্চের ড্রাইভার, ইংলিশ আখবার পড়ে ডেইলি, কথাটা গাঁয়ের লোকেদের বলে। সে-ছবি ফাদার টোপনো, সিস্টার মণিকা বা বেলারা দেখলেও এ বিষয়ে নীরব থাকেন।

সেরকম কিছু দৃশ্য ও সংলাপ ছবি হয়, খবর হয়, কিছু হয় না।

খবর হয় না এমন এমন ছবি ও সংলাপ

ধনবতী চেঁচাচ্ছে, গোড়ালিতে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে দেখার চেষ্টা করছে —'রামভজনোবারে কঁহা তু? আরে হো রাধিয়া বহেন তু ভি কঁহা? আরে মেরা বচোয়াকা বাপ, কঁহা হ্যায় তু?' নানকুকে দেখা গেল রামভজনকে নিয়ে ভিড় ঠেলে বেরোবার চেষ্টায়—'আরে পিউপৃজনবা কি মাই, কঁহা হ্যায় তু? রো মত বেটা, মা আভি আ যায়েগি।' রামভজন ফোঁপাচ্ছে আর জলভরা চোখে মাকে খুঁজছে।

রাধিয়া ফোটোগ্রাফারদের এড়িয়ে ভিড়ের একধারে তর্জনী তুলে ছেদিলালকে শাসাচ্ছে— -'এইসন মত কহিয়ো, শাদি করোগে তো বোলো।'

ছেদিলালের বাল্যবিবাহ, বৈশাখে গাওনা হবে, বউ না আনলে তার বাপু তো তাকে গালি দেবেই, শ্বশুর আর দুই কুস্তিগীর শ্যালকও তার হাড্ডি চুরচুর করবে। কিন্তু তার মন মজেছে রাধিয়াতে!

চিত্র দুই: সংলাপ সহ খানিকটা খবর হয়

'তাহলে আপনাদের হোল প্রোগ্রামটাই ফ্লপ করেছে বলছেন?' জনৈক সাংবাদিক।

'বিলকুল সাচ। টার্গেট ছিল দেড় হাজার, এসেছে শ-খানেক—তাও এদের অনেকেই কনভার্টেড নয়। গঙ্গায় চান আর পুজো আর মেলা এটাই ওদের আসার কারণ।' বিরস বদনে সাধু মহারাজ ঢুকে যান আশ্রমে।

কিছু সংলাপ সহ খবর

'নহি তো, কিসনে বোলা "ইন্ডিয়ান অপরিশান ঘরবাপসি" ফ্লপ হো গিয়া?' তাণ্ডব নৃত্যরত পিউজি এবং লড়াকু পোজে ধনুতে জ্যা রোপনরত রামচন্দ্রজির লাইফসাইজ পোস্টারের ব্যাকগ্রাউন্ডে

ধীরোদ্ধত নায়কের ভঙ্গি ও স্বরে নেতাটি বলেন, 'সিক্স নাইনটিন নাইন্টি আই হ্যাভ বিন ড্রয়িং দিস—রিকনভার্টিং দ্য কমন পিপল—ইয়ে তো মেরা স্যাক্রেডডিউটি হ্যায়। দেশকে লিয়ে প্রাণদান গ্রেট হ্যায়, লেকিন আই থিঙ্ক ইটস্ গ্রেটার।' ছোটখাট মেয়েটি হাত উঁচু করে নেতার মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরে ছিল পাক্কা সাড়ে ন-মিনিট! তার কাঁধ টনটন করছিল সম্ভবত স্পন্ডিলাইটিসের কারণে— উকফ্ জার্নালিস্টের কাজ তো নয়, সহ্যক্ষমতার অগ্নিপরীক্ষা। ভাবতে ভাবতেই ক্যামেরা তার দিকে ঘুরে যায় আর সুরেলা রিনরিনে স্বরে সে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়—'উড য়্যু কন্‌টিনিউ দিস প্রোগ্রাম ইন ফিউচার সার?'

'জরুর, ইন আদার স্টেট্‌স্ অলসো.....'

'হোয়াই ইন আদার স্টেট্‌স্ সার? য়্যঁহা কা কাম পুরা হো গিয়া কেয়া?'

'নহি, নহি, অভি তো আউর প্রোগ্রাম করনা পড়েগা, কিঁউ কি হিয়ার অ্যামাং দ্য কন্‌ভার্টেড, সেভেন্টি পার্সেন্ট আর ট্রাইবালস, উইথ নো প্রোপার্টি অ্যান্ড ল্যাক অব্ এডুকেশন দে আর ট্রাপড। দে শুড বি রিকনভার্টেড। এহি মেরা মিশন হ্যায়।'

'থ্যাঙ্ক য়্যু সার।'

রাধিয়া ভোরবেলা গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে ঘরে ফেরে। নানকুর তবিয়ত ঠিক ছিল না বলে ওদের রওনা হতে হতে দুপুর গড়িয়ে যায়। রামভজনকে রাধিয়াই জোর করে নিয়ে গেল এই বলে যে, হাঁটতে না-পারলে ওকে ছেদিলালের কাঁধে বসিয়ে দেবে। ফেরার সময় গাড়ি পাওয়া গেল না বলে নানকু এমন গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইল যে ধনবতী ওকে ওঠাতে পারল না। কাল তারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিল, মন্দিরে ভজন হচ্ছিল। পূজা পাঠ ভি। পরসাদিয়াও মিলেছে। খিচুড়ি ভোগ ছিল রাতে। শেষরাতের দিকে বার কয়েক গঙ্গাপাড়ে গেল নানকু। তারপর ধনবতীকে বলল শির দাবিয়ে দিতে—কী নাকি তার শির দুখাচ্ছে। কপালে হাত দিয়ে বেশ গরমই মনে হল ধনবতীর। সে রাধিয়াকে বলে। রাধিয়া জানায়, 'আশ্রমে নাকি দাওয়াইখানা আছে, ফিরি মে অচ্ছা দাওয়াই মিল যায়েগা, তব তক নানকু ভাইয়াকো নিদ যানা ঠিক হ্যায়।'

রাধিয়ার বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনার ওপর ধনবতীর অগাধ বিশ্বাস। সে তাই করে। আশ্রম থেকে দাওয়াই এনে খাওয়ায়। এক মহারাজ দেখেও যান ওকে। দোকানের খাবার খেতে বারণ করেন। দুপুরে ভোগ খেয়ে তারপর ওরা রওনা দেয়।

ধনবতী বলে, 'তেরা পাস রুপৈয়া-উপৈয়া হ্যায়?'

নানকু একটা দু-টাকার কয়েন দেয় কোমরে গোঁজা ছোট কাপড়ের থলে থেকে। ধনবতী কলা আর বাতাসা কিনে চান করে শিবের মাথায় জল ঢেলে আসে। চান করে জনেউটি খুলে সে পোঁটলায় রেখে দেয়। ঘরবাপসির জন্য তাদের কোনও পয়সাকড়ি মেলেনি, ফলে ধনবতীর জমানো টাকা সবটাই খরচা হয়ে যায়। ইস্টিলের টিপিন কা ডিব্বা খরিদ করতে গিয়ে সেও যেমন তাজ্জব, দোকানিও তাজ্জব ততোধিক। পচাশ অউর পাঁচ রুপৈয়া! ইস্টিলের দু-বাটিঅলা চমৎকার

টিফিন ক্যারিয়ারটাই তার পছন্দ হয়েছিল! দোকানি তার ফ্যাকাশে, অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে—'উধার যা, হট যা....।' ততক্ষণে সুপুষ্ট, করসা, কলরশোভিত, মেহেন্দি-রাঙানো একখানি হাতে তুলে নিয়েছে সেই বস্তুটি — ধনবতীর আকাঙ্ক্ষার বস্তু—'ভাইসাব, পচপন নহি, পচাশ দুঙ্গি, ব্যাস!'

মনখারাপ নিয়ে ধনবতী চলে আসে সস্তা প্লাস্টিকের দোকানে। সেখানে যা নেবে তাই তিন টাকা। একটা পাতলা গোলাপি রঙের ঢাকা-দেওয়া কৌটো কেনে ও—খানিকটা ঢাকা-দেওয়া বাটির মতো। কেক, পাউরুটি তো হাতে নিয়েই খেতে পারবে তার বেটা, আর এটা করে দুধ খাবে। মায়ের দুধ ছাড়ার পর থেকে কি রামভজন দুধ খেয়েছে? এমনই অনেকটা দুধ? বাটিতে চুমুক দিয়ে? ধনবতী মনে করতে পারল না। মেলা থেকে রাধিয়া তাকে একটা মালা কিনে দিয়েছে, পাথরের। ঝুটা পাথরের হলেও সেটা ওর খুব পছন্দ হল। রাধিয়া কিন্তু কিছু নিল না, শুধু ওর স্বভাবমতো হেসে, 'কুছু নাহি রে, সিরেফ চা অউর এগো কটোরি। দেখ ধন্নু, বিটিয়াকে লিয়ে .....।' কথাটা শেষ না করেই সে ফিতে, চুড়ি আর প্লাস্টিকের দুটো পুতুল দেখায়। আর রামভজনকে কিনে দেয় একটা বাঁশি, প্লাস্টিকের ঝুমঝুমির সঙ্গে লাগানো। তা সেটা বাজাতে বাজাতে সে চলে গেল রাধিয়ার আঙুল ধরে। ধনবতীর রোগা, এই এতটুকুনি বেটা রামভজন। ফিরে গিয়েই সে গোমো আর পম্মুর সঙ্গে চার্চের ইসকুলে পড়বে জেনে খুশি হয়েই চলে গেল। তার ন্যাড়া মাথায় একটা ছোট্ট টিকি, কী ভেবে নানকু তার পরামানিককে রাখতে বলে দিয়েছিল —তারও গলায় ঝুলছে, জনেউ। ছোট্ট।

'কব লোটোগি মা?'

'আজ হি বেটা।'

'মেরা টিপিন কা ডিব্বা?'

'টিপিন বক্‌স্‌ বোল রে বুদ্ধু!' রাধিয়া শুধরে দেয়।

'হাঁ হাঁ, মেরা টিপিন বক্‌স?'

'লে বেটা, চাচিকে পাস রাখ দে।'

কতদূর গেছে তার বেটা? ধনবতীর কেমন জাড় লাগে। আর একটু এগোলে পথ বনের ভেতরে ঢুঁধে যাবে। দাওয়াই নিয়েও তার স্বামী তেমন জোরে হাঁটতে পারছে না, ফলে উৎরাই-এর মুখে পৌঁছতেই ও বোঝে সাঁঝের আগে জঙ্গল পেরোতে পারবে না। পথ নির্জন হয়ে এসেছে। খানিক আগেই একটা-দুটো মোটর সাইকেল, অ্যাম্বাসাডর একটি শহরের দিকে গেল। ঠাকুরদের একটি শাদা ভ্যান গাঁয়ের দিকে গেলেও তারা হাত তুলে সেটাকে থামায়নি বা তেমন চেষ্টা করেনি, বরং সসম্ভ্রমে একধারে সরে জায়গা করে দিয়েছে যাবার। নানকু একবার মিন মিন করে যেন বলল, হাত দেখালেই হত, গোড় পড়লে কি ঠাকুর তাঁর পায়ের কাছে একটু জায়গা দিতেন না? ধনবতী বলে, 'বুদ্ধু কাঁহাকা। আরে আমরা তো ঠাকুরের পোষা কুত্তারও অধম। ওই গাড়িতে ঠাকুরানির কুত্তা ভি আছে। চল চল, পা চালা, দেখছিস না আঁধার হয়ে এল?'

তাদের পেছনে দিগন্তের কোন ওপারে আজকের সূর্য অস্ত গেল। কী ভেবে ধনবতী পিছু

ফিরে দ্যাখে সেই শোভা! মেঘগুলির গায়ের রং কেমন গুলাবি হয়ে উঠেছে, সেই রং তার মুখেও এসে পড়ে, পেছন পেছন আসা নানকু সেটি দেখে থমকে যায়—যেন ধনবতী নয়, অন্য কেউ, যেন ওর তিন মরা বেটা আর এক জ্যান্ত বেটার মাঈ নয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা কেউ।

'এইসন দেখতা কাহে?' ধনবতী বলে উঠলে নানকুর ঘোর ভাঙে, চারপাশে তাকিয়ে ও একটু ভয়ই পায়। যে-রাস্তা ধরে ওরা এসেছে তা পেছনে পথের বাঁকে অদৃশ্য, যে-রাস্তা সামনে সেটি ঢালু হয়ে নেমে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে বনের ভেতরে হারিয়ে গেছে। তার পরেই একটা মাঠ আর খেতি, সেসব পার হলে ওদের গাঁও। সে খপ করে বউয়ের হাত ধরে, তার শুকনো কড়া-পড়া হাতের মুঠোয়—ঠাকুরের জমিতে, গোয়ালে তার বউও কাজ করে, তেরো বছরের বালিকার নরম হাতের বদলে তার হাতে লাগল ভোঁতা, ক্ষয়ে-যাওয়া নখের মোটা ধ্যাবড়া আঙুল, আর শক্ত হওয়া করতল—তবু সেই হাত যেন তার ভয় শুষে নিল পরম মমতায়। প্রায় দৌড়েই তারা পার হয়ে এল পাহাড়ি ঢালু পথ, নানকুর হাত ছাড়িয়ে ধনবতী বালিকার মতো হাসতে হাসতে ছুটে গেল বনের প্রবেশে, সে হাসি মিশে গেল পাখিদের বাসায় ফেরার কলরবে, তাদের ডানা ঝটপটানো ওড়াউড়িতে। নানকুর কাঁধে ছিল ঝোলা, ধনবতীর কাঁকালে ছিল পোঁটলা। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া পথটাই খানিকটা বাড়িয়ে মিশনারিরা গাড়ি চলাচলের যোগ্য করে নিয়েছে। এমনিতেএ বনে ভয় পাবার মতো জানোয়ার নেই, জ্যোৎস্না রাতে বা আলো নিয়ে দল বেঁধে হাত তালি দিয়ে চললে সাপে কাটারও ভয় নেই। তেমন দরকার খুবই কম হয় যখন রাতে জঙ্গল পেরোতে হয়। তবু হয়তো অপ্রত্যাশিত কোনও আকস্মিকতায় তেমন কিছু ঘটে যেতেই পারে। তেমন আকস্মিকতায় ঘাস মাটি খামচে উপুড় হয়ে মরে পড়েছিল ন-বছরের শিউপূজন। মাঝে মাঝে বুনো শুয়োর মারা পড়ে কারও তিরের ফলায়। মাঝে মধ্যে আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে শোনা যায় হায়েনার ডাক। জঙ্গল যেদিকে অনেকখানি বিস্তৃত, তার খানিকটা বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের সানুদেশে পৌঁছেছে, সেখানে গাছের ওপর পাখির বাসায় হানা দেওয়া সাপ দেখেছে কেউ কেউ।

ধনবতী বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে বুঝে নানকু তাকে চেঁচিয়ে ডাকে— সেই তার হারিয়ে-যাওয়া, ফুরিয়ে-ফেলা যৌবনকালের ডাকেই ডাকে, যখন ধনবতী মা হয়নি, বাতাসে সেই ডাক গতি পায়, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় পায় প্রতিধ্বনি, যেন এক জন্ম থেকে সে ডাক চলে যায় আর এক জন্মের দিকে। নানকু সামনে তাকায়, গাছ আর গাছের ছায়ারা মিশে যাচ্ছে দেখে পাশে তাকায়, দৃষ্টি ব্যাহত হয়, পেছনে তাকায়—আকাশের সেই আলোটুকুও আর লেগে নেই, হালকা মেঘগুলি রক্তিম, নীললোহিত থেকে সাঁঝগহীন রঙে ভরে উঠছে, আর খানিক পরে হয়তো জ্বলজ্বলে তারাটি উঠবে সাথীদের নিয়ে। ওর মনে পড়ল, কেন যে ভুলেছিল সেটাই আশ্চর্য, আজ অমাবস্যা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ও এগোয়, এপাশ-ওপাশ, সামনে তাকাতে তাকাতে এক পা এক পা করে। পাঁজরার খাঁচাটা যেন শূন্যতায় ভরা ওর, আর তা থেকে দুম দুম করে একটা চাপা আওয়াজ

আসছে ওর নিজেরই কানে। তেমনই একটা তীক্ষ্ণ সন্ত্রস্ত ডাক এল ওর কানে—'কাঁহা গইলবারে তু রামভজনোবাকা বাপু, বহুত ডর লগতা, আরে হো ও ও ও ...!'

ধনবতিয়া! ধন্নি, ধন্না, ধন্নু! ধনিয়ারে! হাঁফাতে হাঁফাতে নানকু পৌঁছে যায় সেই ডাকের উৎসে। প্রথমটা ও দ্যাখে খানিকটা হলুদ, যেন ঘনায়মান তমিস্রার মধ্যে পাখির মতো উদগ্রীব হয়ে আছে ধনবতীর ব্লাউজের হলুদ—কোমর থেকে, কাঁধ থেকে খসে গেছে শাড়ি, ভুঁয়ে লুটিয়ে আছে তা, আর ওর ছায়া-ছায়া শরীরটা যেন কিসের ইশারা!...'তানি থক গইল—' বলে নানকু আর দাঁড়াতে পারে না, হাঁটু ভেঙে ধনবতীর গায়ের ওপরই পড়ে যায়। ধনবতী ওকে দু-হাতের বেড়ে বুকের ওপর নেয়—'ডর লেগেছে তোর? পিয়াস লেগেছে?' নানকুর ঝোলা থেকে ও প্লাস্টিকের ক্যানে ভরা গঙ্গাজল ঢেলে দেয় নানকু হাঁ করলে। দু-জনে দু-জনকে জড়িয়ে ঘন হয়ে থাকে। পাতলা মেঘ সরে সরে যায় হাওয়া উঠলে। সে হাওয়ায় শেষ মেঘের ঠাণ্ডা লেগে থাকে অল্পস্বল্প। নানকু কাঁপে বারকয়েক। ধনবতী বোঝে নানকুর আবার জ্বর আসছে। 'ভুখ লেগেছে?' বলে পুঁটলি খুলে আলুর চপ আর লাড্ডু খাওয়ায় ওকে, গঙ্গাপানি দেয় লোটা ভরে। নানকুর কাঁপন ধরে। যেমন গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাস বইলে সর সর শব্দ হয়, তেমনই কাঁপুনিতে ওর দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক শব্দ হয় মৃদু। ধনবতী ওর গায়ে হাত বোলায়, শির দাবায়, পা দাবায় কোলে নিয়ে। নানকুকে ঢাকতে গিয়ে ওর শাড়ির আঁচল ফেঁসে যায়। ঘুরে ঘুরে শুকনো পাতা জড়ো করে ও নানকুকে শোয়ায়, শাড়ি খুলে ওকে ঢাকা দিতে গিয়ে কী ভেবে হাঁটু গেড়ে নানকুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। ওর গরম নিঃশ্বাস ধনবতীর মুখে লাগে। সায়াটা খুলে ও নানকুর ঊর্ধ্বাঙ্গে দেয়। কান-ঢাকা টুপিটা বের করে ওকে সযত্নে পরায়। তবু নানকু থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। হায়, ঘরের এত কাছে এসেও কি ঘরে ফেরা হবে না ওদের? কে দেখবে রামভজনকে? কতরাতে তারা বেটার কথা বলাবলি করেছে কবুতরের মতো অবিশ্রান্ত বকবকানিতে। বর্ষায় ঘরের মেঝেয় হাঁড়ি পাতিল বসিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে দু-জনে জেগে থেকেছে নির্মেঘ আকাশের চাঁদের মতো। জাড়ের দিনে কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুনের ধারে বসে হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে কতদিন ভেবেছে বেটাকে আসছে শীতে একটা সোয়েটার কিনে দেবে (ইসকুলে ভর্তি হলে জামা-প্যান্ট-জুতো-মোজা-সুয়েটার ভি পাবে অবশ্য)। তারা না থাকলে, ঘরে বাপস না হলে কী হবে রামভজনের? রাধিয়া কি ওকে মিশনের অরফানে দিয়ে দেবে? যাদের বাপ-মা নেই, কি ফেলে দিয়ে গেছে, ভিখ মাগা, চোর পাকিটমার কি লড়কি হলে রেন্ডি হওয়া ছাড়া দুসরা কোই রাস্তা নহি, সেই সব বাচ্চারা ওখানে থাকে। ভালো খেয়ে-পরে তাদের সুরতই অলগ কিসিমের। কেউ কেউ সাহেবের দেশে চলে যায়, সাহেবদের আবার এদেশের গোরা রং পসন্দ্ নয়, তারা বনোয়ারির মতো কালা চোঁড়ে। কিন্তু তা বলে রামভজনকে সেখানে দেয়ার কথা মনেও আনতে পারে না ধনবতী। সে নানকুকে জাগাবার চেষ্টা করে। তার শরীর দাবাতে থাকে। নানকুর মদের নেশা তেমন নেই। একটু লাল চা গুড়দিয়ে, আর চুটা, বিড়ি পেলে সে ঘন্টার পর ঘন্টা খেটে যেতে পারে। কাজে যাবার আগে তার চা-রুটি কি ছিল্কা চাই, রাতেও তাই। আর সে ভালোবাসে ঠেকুয়া খেতে। যজ্ঞে যখন ঘি ঢালা হচ্ছিল তখনই ধনবতির মনে হয়েছিল এই ঘি আর নারিকেল পেলে সে মালিকের বাড়ির মতো চমৎকার

ঠেকুয়া বানাতে পারত! পালা-পরব ছাড়া মদ ছোঁয় না নানকু, আর নাচা-গানাও করে দারুণ। খেটে খেটে হয়রান হয়ে লোকটার আর সে আনন্দ নেই। বড় ভালোমানুষ তার স্বামী, তাই গোমস্তা তাকে এমন বেগার খাটায়। নানকুর উরু দাবাতে দাবাতে সে ভাবে, কী তাকত ছিল ওর এই উরু দুটিতে, এখন কত দুবলা-পাতলা লাগছে সে দুটি।

নানকুর একটাই নেশা, রোজ তার পূজা করা চাই—শিউজির মাথায় পানি ঢালা চাই। পূজা করে খেয়ে সে কাজে যায়। খানা তো হররোজ ভরপেট থাকে না, তাই বোধ হয় তার স্বামী এমন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, এমনই ভাবে ও। নানকুর একটাই শখ—তার বউ। কোনও দিন সে অন্য অওরতের দিকে ঝোঁকেনি, তাতে ধনবতীর বত্রিশ বছরেই কেমন অমনোযোগ এসেছে দাম্পত্যের শারীরিক ঘনিষ্ঠতায়। কিন্তু সে নিজের কথা, এই স্পৃহাহীনতা নানকুকে বলেনি। রামভজনের জন্মের পর থেকে তা শুরু, আর গোড্ডুর মৃত্যুর পরে মাসে মাসে তার অনিচ্ছা প্রায় কামহীনতার পর্যায়ে চলে যায়। অথচ নানকুর সঙ্গে তার কত সুখের মুহূর্ত কেটেছে। সে ভাবল এভাবেই যদি জাগানো যায় তার স্বামীকে। সে আকাশে দৃষ্টিপাত করে—দেবতারা দেখছেন। সে বৃক্ষদেবতাকে প্রণাম করে, দেবতা আমাদের বাঁচাও। বনের পশু-পাখি, অহি-নকুল, জল-স্থল-অন্তরীক্ষকে প্রণাম করে সে। ঝোলা থেকে টাবলিট বের করে স্বামীকে খাওয়ায়। কী ভাগ্যি নানকু মোটা ছোট চাদরটি চুপচাপ নিয়েছিল, সেটি সে পেয়ে যায়। শাড়ি-সায়া গাছের ডালে টাঙিয়ে রাখে। তারপর নিদ্রাহীন চোখে অপেক্ষা করে। বারে বারে গায়ে হাত দিয়ে দেখে বুখার নামল কি না।

নানকুর ঘাম মুছিয়ে দিলে সে পানি চায়, ধনবতী লোটা থেকে আন্দাজে অল্প অল্প ঢালে ওর মুখে। নিজেও খায় আকণ্ঠ। নানকুর শরীরের ওপরে নিজেকে স্থাপন করলে নানকু চমকে যায়। 'কা ভইলবারে ধনু? কী হল তোর? এই জঙ্গলে, আঁধারে, আমার এখন তাকত নেই? আছে রে আছে, শুধু নিদ পেছে, দ্যাখ আমি জাগাচ্ছি।'— ধনবতীর চুলে নানকুর কাঁচাপাকা চুল ঢেকে যায়, ধনবতীর শ্বাস নেয়া আর ছাড়ার তালে নানকু একটু একটু করে জেগে উঠতে থাকে। সে জেগে ওঠে, ধনবতীর সক্রিয়তার সমর্থনে সে আঁকড়ে ধরে ওকে, গড়িয়ে, ধনবতী স্ফুরিত নাসা, বলে— 'আরে, থোড়া রহনো না দিয়ো কাহে?'

'চুপ যা, অউর মজা আয়েগা।'—তারা বসন্তের উৎসবে মেতে ওঠে। কয়েক মিনিট ভুলে থাকে তাদের প্রতিদিনের রূঢ়তাকে। আনন্দের ফুৎকারে আর শীৎকারে উড়িয়ে দেয় কয়েক দিন ধরে তৈরি করা কয়েক ঘণ্টার প্রহসন। শরীর ছাড়া আর কোনও প্রতিবাদের ভাবা তাদের জানা নেই বলে তারা মেতে ওঠে এই শরীরী মহোৎসবে।

ধনবতী আর নানকু জড়াজড়ি করে বসে থাকে সারারাত, আর কত যে আওয়াজ শোনে—পাতার খসখস, পোকাদের খড়খড়ে চলার আওয়াজ, পেঁচার উড়ে যাওয়া আর তীব্র ডাক, ঝিঁঝির একটানা আওয়াজ। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর গা-হাত-পা টনটন করে উঠলে, কোমর ব্যথা করলে দু-জনে শুয়ে পড়ে পাতা-লতার ফাঁক দিয়ে তারাদের চলা আর দিগন্তের নেমে যাওয়া দ্যাখে। এ ওর শরীরে পরম মমতায়, আদরে আর কামনায় হাত রাখে। হাত বোলায়। শেষে পুব আকাশে শুকতারাটি জ্বলজ্বল করে উঠে এলে, পাখিদের ঘুম ভাঙার ঠিক আগে, যেন কী মনে পড়ে

গেছে, ভয়ংকর কিছু, এমন আর্তস্বরে নানকু বলে ওঠে —'সর্বনাশ হয়েছে রে রামভজনোবাকি মাই।'

ধনবতী উঠে পড়ে মুহূর্তেই—'কক্ কী হল রে?'

'সরকার বলছিল আমার ঘর আর জমিন নিয়ে নেবে।'

'কাহে?'

'ওর খেতি বাড়াবে।'

'তাহলে আমরা থাকব কোথায়?'

'ওর খামারবাড়িতে ঠিকা-মজুরদের ঘরে।'

'ও লোগ, গেঁহু কাটনেবালে?'

'হাঁ।'

'তা তুই কী বললি?'

'কী বলব, গোড় লাগে সরকার বলা ছাড়া। বলে কী, তবে উধার বাপস্ কর দে। তা ছাড়া তোর কি ওটা ঘর? ও তো ঝোপড়ি। বকরি রাখার ঘর। আর ওই তো আঙিনা। সে দুটো মকাই কি মির্চা লাগলে আমার খেতিতে লাগা। তোরাও খাবি, আমাদেরও দিবি। এখানে পাকা মকান, কেমন সাফসুতরো থাকবি। একটা ঘর আর ঢাকা-বারান্দা পাবি। আর কত বড় আঙিনা, সবাই মিলে বসে গল্প করতে পারবি। আলাদা মিঠা পানির কুঁয়া ভি আছে।'

ধনবতী বোঝে নানকু কিছু একটা লুকোচ্ছে। সে একটু সরে বসে—'তা মালিক হঠাৎ একথা বলল কেন? কী করেছিস তুই, ফের উধার নিয়েছিস?' পানির তোড়ে বেরিয়ে আসা প্রশ্নের ধাক্কায় নানকু কেমন মিইয়ে যায়। আসলে সে ভেবেছিল বা তেমন একটা কথা শুনেওছিল মুফতে আসা-যাওয়া ছাড়া তাদের টাকা-পয়সাও মিলবে, আর তাই সে পচাশ রুপিয়া উধার নেয়। খাতায় টিপছাপ দিয়ে। তখনই গোমস্তা তাকে বলে তার নাকি অনেক টাকা শোধ করা বাকি। ছেলেগুলো বেঁচে থাকলে তবু হত, তিন-তিনটে ছেলের জওয়ানিই ওটাকা তুলে দিত। এখন বেটা আছে সেটা তো দুবলা-পাতলা। নানকু নিশ্চয় ওকে ঠিকমতো খানা দিতে পারছে না। মালিকের নজরে থাকলে ও ঠিক হয়ে যাবে, তখন খেটেখুটে নিজের ঘর উঠাবে, নানকুর নসিবে থাকলে বেটার ঘরে থাকবে। কিন্তু মালিকের সবজি-বাগানটা না বাড়ালেই নয়। নানকুর আঙিনায়, ঘরের পেছনে বেড়া-ঘেরা জায়গায় বেশ সবজি হয়। জমিনটা ভাল। মালিকের সবজি খেতের লাগোয়া ওটা। তবে নানকুর টুটাফুটা ঘরটা বড়ই বেমানান ওখানে। মালকিনই বলছিল, 'ইতনি সুন্দর খেতিবাড়িকে পাস ইয়ে দেখনে কে লিয়ে অচ্ছি নহি লাগতি।' তা ছাড়া মালিকের কালিজে পড়া লেড়কারও নাকি এহি বাত। খেতি, পাহাড়, মালিকের উঁচা মকান এসবের পাশে এই ঘর নাকি বড্ড বেমানান। ফোটো তুলে নাকি বন্ধুদের, শহরের বন্ধুদের, দেখাতে লজ্জা করে ঠাকুরের বেটার। বেড়ার গায়ে মেলা থাকে বস্তা, ময়লা ফাটা কাপড়, তেলচিটে কাঁথা, ঘরের পেছনের দেয়ালে শোভা পায় গইঠা। বর্ষার জ্বালানি। ধনবতী মুখ ঝামটে বলে, 'গইঠা! হায় রাম, গইঠা কোথায় দিই? মাঠ থেকে যা কুড়িয়ে আনি তা এমনিই শুকাই। তবে কখনও কখনও দিয়েছি। তা আমি তো আপনকা ঘরের দেয়ালে দিয়েছি, ঠাকুরের দেয়ালে নয়, অত বড় মকান ছেড়ে এইখানে

গইঠার ছবি তুলতে এল মালিকের বেটা! বেন্দা কাম! এসবই বাহানা। বুটা বাহানা।'

ওই ঘরগুলো ধনবতী দেখেছে। ধুপের দিনে তেতে থাকে, শীতে কাঁপন ধরায়। নিচু নিচু খুপরি সেগুলো, গেঁহু কাটনেবালারা ঘুরে ঘুরে এ-গাঁ সে-গাঁ মজদুরি পশরা করে, তাদের তো এখানে ঘর বসাতে আসা নয়, এক মাহিনা, দো মাহিনাকে লিয়ে মাঠেও থাকা যায়। মিশনারিদের জন্য বেগার খাটার লোক কম পড়েছে সরকারের, তাই তাদের নজরে রাখতে চায়। রামভজনেরও ওপর নজর পড়েছে তাহলে গোমস্তার! তা ছাড়া টুটাফুটা হলেও ওঘর তার শ্বশুরাল। তার শ্বশুরের বাপু, তার বাপু, তার বাপু কবে থেকে যে তারা ওখানে আছে তা কি সরকার জানে? এসব কহানি সে সাঁস্-এর মুখে শুনেছে, বে-ননদ তার বিয়ের পর একবার মোটে এসেছিল, সেও বলেছে এসব। তখন জমিতে বীজ ছড়ালেই ইয়া মোটা গমের শীষঅলা ভরা খেতি, ঝোয়ার পানি ছিল মিঠা, জঙ্গল ছিল আরও গহীন। মালিকের নানা এসেছে আর কয় বরষ! মিশনারিরাও। তখন ফাদার ছিল গোরা সাহেব। সে এরকম শনে-ছাওয়া ঘরেই থাকত। বিমার হলে মিষ্টি দাওয়াই-এর গুলি দিত। বাজনা বাজাত। তারপরে তো চার্চ হল, ইসকুল হল, হস্পিটল হল, অনাথাশ্রম হল। বেশ কিছু খ্রিস্টান হল। রাধিয়া বলে শরণ নেয়া। ধনবতী বলে বিশুর ভগবান তাকে বাঁচাতে পারেনি। এমনি বুঢ়া হয়েও বিশু মরেনি। জোয়ান বয়সেই তাকে হাতে-পায়ে পেরেক ঠুকে মেরে দিল বদমাশরা। তাহলে বিশু কী করে তাদের বাঁচাবে? রামজি, শিউজি, বজরঙ্গবালি এরা তো কত জান বাঁচিয়েছে। নিশ্চয় তারা গত জনমভর পাপ করেছিল, এখন যেমন ঠাকুর করছে, সামনের জনমে ঠাকুরও এমনি বেগার খাটবে। কিন্তু এ জনম যে কী করে কাটবে সেটাই তারা জানে না! রাধিয়া বলে তোর লছমনিয়া শিউপূজন আর গোচ্চু কী করেছিল যে মরে গেল? ধনবতীর ভেতরটা খালি হয়ে যায়। সে কেমন ঘরটাকে সাজিয়েছে — দোকান থেকে পুরনো ক্যালেন্ডারের ছবি সেঁটেছে, তাতে ঘরের শোভাও বাড়ে, বৃষ্টির ছাঁটও সাময়িক বন্ধ হয়। গরমকালে আঙিনায় শোয়, কেমন আকাশের নিচে শোয়া, যেমন কালকে শুল। তার ঘর ভাঙা কিন্তু সাফসুতরো। কাঁথা-চাদর কাচার জন্য অত নিরমা তারা কী করে কিনবে? তেল রোজ জোটে না, তাই যেদিন পায় আপাদমস্তক মাখে। সাবুন যদি জোটে তো সাবুন দিয়ে চান করে, তেল মাখা আরও ভালো। ঠাকুরের বাড়ির মতো কি তাদের ঘর হবে? তবু তো ঘর। নিজের ঘর! আপনকা। বকরি রাখার ঝোপড়ি ওটা নয় সরকার, আদমি অউর অউরত ওঁহা রহনেবালে হ্যায় বাচ্চাকে সাথ। ধনবতীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে তা মোছে না। ভাঙা গলায় স্বামীকে জিগ্যেস করে —'হাঁয়ে যদি সত্যিই মালিক এসব নিয়ে নেয়, আর নেবেই, পন্দ্র-বিশ রুপেয়ার জাদা যে দিতে চায় না সেই গোমস্তা এক কথায় পচাশ রুপেয়া দিয়ে দিল! রাধিয়া ঠিকই বলে তুই একটা বুদ্ধু, সব টাকা খরচা করেছিস?' নানকু চুপ। ধনবতী আবারও বলে, 'কী করব এখন? মালিকের বকরি রাখার পাকা মকানে থাকবি? রামভজনের কী হবে? ঠিক আছে, ওকে আমি মিশনে দিয়ে দেব।'

'খবরদার!' এবার নানকু চেঁচিয়ে ওঠে কিন্তু গলা থেকে আওয়াজটা ততটা জোরে বেরোয় না যতটা জোরে সে বলতে চেয়েছিল। 'তুনে শুনা নহি ও লিডার সরকার ক্যেয়া বোলা থা?'

'আপনি ধরমমে মরনা ভি আচ্ছা।'

'তো কা ভইলবা? ঘরবাপসি তো হো গিয়া!'

ধনবতী হেসেও ফেলে। নানকু বলে, সে চলে যাবে বঙ্গাল, সেখানে ঠিকাদার লোক নিচ্ছে কয়লা তোলার জন্য। ধনবতী অবাক হয়—'কোনও দিন কইলা কেটেছিস? জমিতে লাঙল দিয়েছিস জনমভর? তার চেয়ে শহরে চল। ওঁহা সব আপন আপন কা। তুই খাটবি আমিও খাটব। মকান বানাচ্ছে বড়লোকরা। ইঁট বইব। পাথর বইব। বাচ্চা এখানে থাক। মিশনের ইসকুলে পড়ুক। আমরা পরে নিয়ে যাব।'

'নহি!' নানকু বলে। 'ভালো ভালো খাওয়া পেয়ে, ভালো বিছানায় শুয়ে, ফাদারের মিঠা বুলি শুনে বেটা আমাদের ভুলে যাবে রে ধমু। টোপনো কা মাফিক ও ভি ফাদার বন যায়েগা—কালা ফাদার।'

আবার দু-জনে বসে। কোমর ধরে গেলে আবার শোয়। এখন কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরে না। কেউ কারও গায়ে হাত রাখে না। পাখি ডেকে ওঠে একটা-দুটো করে। গাছগাছালির পাতারা নড়েচড়ে ওঠে প্রভাতী হাওয়ায়। শুকনো পাতা ওড়ে। উড়ে উড়ে ওদের গায়ে পড়ে। নানকু ধনবতীকে ধরে ওঠে। ধনবতী গাছের গায়ে হেলান দেয়। তারও শরীর টলছে। গত রাত্রির উন্মাদনা এখন অবসাদে ঘিরে ফেলেছে ওদের। সকালের আলোয় ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে চেনা দৈনন্দিন আর তার রূঢ়তা। সেইসঙ্গে অনিশ্চয়তার তেতো স্বাদ। নানকু বলে ঘর অব্দি সে হেঁটে যেতে পারবে না। ধনবতী বলে রামভজন নিশ্চয় কাঁদছে। গতকালই তো তাদের ফেরার কথা। দু-জনে টালমাটাল, পায়ে পায়ে পথের ধারে এসে দাঁড়ায়। ধনবতী পানি দেয় নানকুকে। সেও গলায় ঢালে বাকিটুকু। এবারে পথের দিকে তাকায়। দূরে একটা গাড়ি দেখা যায়। ওরা দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে পথের মাঝখানে। চার্চের অ্যাম্বুলেন্স দেখা দেয়। শাদার ওপর মিশনের নাম লেখা।

লাফিয়ে নামেন ফাদার টোপনো, কোলে রামভজন। রাধিয়া দৌড়ে ধনবতীকে জড়িয়ে ধরে। ছেদিলাল আর কয়েক জন এদের ঘিরে ধরে। এরা হাঁফায় তবু বলে তাদের ফেরার বিবরণ। বলে আর হাঁফায়, হাঁফায় আর বলে। ছাতারে পাখিদের মতো কলকল করে সবাই।

নানকু শুয়ে পড়ে। ধনবতী রাধিয়ার গায়ে হেলান দিয়ে কোলে বসা রামভজনের অনর্গল কথা শোনে, অশ্রুচিহ্ন ভরা গাল চেপে ধরে ছেলের গালের ওপর।

সবাই খুশি মনে এটা-ওটা বলছে। ছেদিলাল আড়ে আড়ে দেখছে রাধিয়ার ফুল্ল, প্রসন্ন মুখ।

ফাদার নানকুর হাত ধরেন। নাড়ি দেখেন। বলেন, 'পহলে হাসপাতালে যাবে। ওষুধ, দুধ আর ফল দেব, নিয়ে বাপস ঘর যাবে। আর কোথাও না।'

'ঘর?!'

নানকু চোখ তুলে উলটো দিকের সিটে বসা ধনবতীর দিকে তাকায়। নীরবে।

ধনবতীও তার দিকে তাকায়। নীরবেই।

দিশা সাহিত্য ২০০০